# ক্রোধ




ইন্দু সাহা

নবজাতক প্রকাশন
এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭



প্রথম প্রকাশ :

৫ই আগস্ট, ১৯৪৮

প্রকাশক :

মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০০০৭

মুদ্রক :

শ্রীহিমাদ্রী রায়
৯এ রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

লড়াইয়ের
প্রত্যেক
মুহূর্তে
আপনি
জাগরিত

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ
শ্রদ্ধাস্পদেষু —

## দুই বাংলায় প্রকাশিত
## লেখকের উল্লেখযোগ্য বই

গঙ্গাপারের খেয়া
পলাশ কামিনী
কিষাণ বউ
ধান মাটির কাব্য
রূপসী ক্ষুধা
অন্তঃসলিলা বহে যায়
পদধ্বনি শুনি
বেকার নিকেতন
বাস্তুত্যাগ
ঝড় আসছে
কনভয়
স্ফুলিঙ্গের আলিঙ্গন
পোস্টার কথা কয়
মরিয়ম আমাকে অভিশাপ দাও
মহাকালের পদধ্বনি
দলবদলের পালা
পদ্মকাঁটা
পূর্ববাংলার গণ-আন্দোলন ও শেখ-মুজিব
বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ
আসুন বিদ্রোহ করি
অনন্ত প্রেম
টাইফুন
এবং পঁচিশটিরও বেশি
মঞ্চ সফল নাটক

# একটি বালকের কথা

এক বালক। তার স্বপ্ন ছিলো ইজের ছেড়ে ইংলিশ প্যান্ট পরবে। সেসময় পঞ্চাশ সনের নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে দুই বাংলায়। আসামে। পূর্ব বাংলা থেকে শরণার্থীরা আসছে। যাচ্ছে পশ্চিমবাংলা থেকেও উদ্বাস্তুরা।

বালক তো বালকই। সবে ইংলিশ প্যান্ট পরেছে। থাকে দিদির বাড়ি। পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। বালকটির ভগ্নিপতিরও ভগ্নিপতির বয়স তখন বছর পঞ্চাশেক। ননী সাহা নাম। তার অন্ততঃ পাঁচ বিঘে সীমানা নিয়ে বাড়ি। তার সীমানার বাঁ-দিকে কাঠা ছয়েক জায়গার মালিক কৃষক মনু মিঞার জীর্ণ শণের কুঁড়েঘর। দিন ভিক্ষে তনু রক্ষে তার। তার এক মেয়ে। কিশোরী। বউ। আর বুড়ি মা। বালকটি তাদের সবাইকে চেনে।

কাছেই বিশাল বাজার। বালকটি একদিন বাজারে যাচ্ছিলো তার ভগ্নিপতির সঙ্গে। তিন-চার মিনিটের পথ। সেই পথেই সেদিন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো এক বিপন্ন বিস্ময়? ফুটা।নগঞ্জের দিক থেকে একটা সরু গলি বাজারের মুখে এসে থেমে গিয়েছিলো। ডানদিকে মাটির ঘর। বাইরের উঠোনের এক কোণায় কাঁঠাল গাছের নীচে বিরাট জনতা যেন বৃত্তাকারে বাঁদর নাচ দেখছে। চপলমতি বালকের কৌতূহলের অন্ত নেই। সে দাঁড়িয়ে যায়। ভিড় ঠেলে ঢুকে যায় ভেতরে।

ঢুকেই ' ! মনু মিঞা আকাশের দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছে—' াল্লা! আল্লা-মাবুদ! তুই এর বিচের করিস।" তার ঠোঁট ফেটে ঝপ্‌ঝপ্‌ 'রে রক্ত ঝরছে। আর গান্ধীভক্ত ননী সাহা ধরে আছে বাঁ-হাতে মনু মিঞার চুলের ঝুঁটি এবং ডানহাতে বিদ্যেসাগরীয় চটি দিয়ে পেটাচ্ছে তাকে। নগ্ন শরীরে রক্তের জমাট চাপ। চোখে দেখা যায় না মানুষের সেই অপমানকর লাঞ্ছনার দৃশ্য।

ঐ দৃশ্য দেখে বালকটির তো বুকের ভেতরে হাইপাই করে উন্মত্ত ক্রোধ। তার ভগ্নিপতির ভগ্নিপতিকে পারলে সে যেন চিবিয়ে খায়। কিন্তু সে যে নিতান্তই বালক। কিন্তু ততক্ষণে ভিড়ের সামনে দাঁড়ানো এক মধ্যবয়সী ধুতি-পাঞ্জাবী পরা

ফর্সা মানুষ প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন—"এই যে ননীবাবু! উনাকে মারছেন কেন আপনি ?"

উগ্র ননীবাবুর মস্তান ছেলেরা জনাচারেক ননীবাবুকে ঘিরে। সেই শক্তির তেজে গর্জে উঠলো ননীবাবু—"বড যে দরদ দেখাচ্ছেন! এই শালা নেড়ের বাচ্চাটার গরু আর ছাগল রোজ আমার বাগান নষ্ট করে।"প্রশ্নকর্ত্তাও ঝাঁজিয়ে উঠলেন—"গরু আর ছাগলের দোষে আপনি মানুষ পেটাবেন? কী পেয়েছেন আপনি? পূর্ব পাকিস্তানে নিশ্চয় আপনার কোন আত্মীয় স্বজন নেই। সেজন্যেই এরকম কসাই-এর মত ব্যবহার করছেন। কিন্তু মশাই সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা আগ্ বাডতে দিবো না।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে সোচ্চার হলেন।

কিন্তু সদ্য ইংলিশ প্যাণ্ট পরা বালকটি মনু মিঞার লাঞ্ছনার আসল রহস্য জানতো। রহস্য ননীবাবুর সীমানার বেডা সরিয়ে মনু মিঞার সমগ্র সীমানাটিকে ঘিরে নেবার। বালকটির সামনেই (বালকটিকে নিতান্ত অজ্ঞ ও ফালতু ভেবেই) ননী সাহা তার চোখ যাওয়া মস্তান ছেলেদের সাথে ষড়যন্ত্র করতো।

তো সেদিন জনরোষের সামনে গান্ধীবাদী ননী সাহা এবং তার মস্তান ছেলেরা অনেক জগঝম্প করেও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

সেই ক্রোধ জেগেছিলো বালকটির বুকের ভেতরে।

ক্রোধের কোন পরীসীমা কি আছে? নেই।

আসল কথা, গণ-জাগরণ চাই। প্রতিনিয়ত শ্রেণী-সংগ্রাম চাই। সাম্যবাদী তরবারীটাকে শাণিত রাখা। সেই তরবারীর ধারটাকে যখন বালকটি দেখে "আত্মসুখসর্বস্বপণ্ডিতমন্যবাক্যবাগীশ"-রা ঘসে ঘসে থ্যাবডা করে দিচ্ছে চোখের সামনে, তখন ও ক্রোধে ঝলসে ওঠে।

বালকটিকে একজন বলেছিল—আপনিও যদি সংগ্রাম-টংগ্রামের আওয়াজ তোলেন তো ঐ যে দোতলার বিরাট বিরাট জানালাগুলোর যেকোন একটা দিয়ে ফেলে দেবো কোলকাতার ফুটপাথে"। কথাটা শুনে রেখেছে বালকটি। বালকের বয়স সেই কবে চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বালকটি তার জবাব ইতিহাসের জন্য তুলে রেখেছে।

একদা শেখ মুজিব ও তার ঘাতক বাহিনার হাতে বাংলাদেশে হাজার হাজার কম্যুনিষ্ট খুন হচ্ছিলো। বালকটি "পূর্ব বাংলার গণআন্দোলন ও শেখ মুজিব" লিখে পৃথিবীকে জানিয়েছিলো নব্য হিটলার মুজিবের কার্যকলাপ। সে বই নিষিদ্ধ হয়েছিলো মুজিবের হাতেই। পৃথিবী খ্যাত মুজিব হিটলারের কণ্ঠে গর্জে উঠেছিলেন

"অরে ( অর্থাৎ বালকটিকে ) মাটিতে পুঁইত্যা ডাল কুত্তা দিয়্যা খাওয়াম্ )" হায় ইতিহাস সেই বিশ্বখ্যাতকে আজ কোথায় নিয়ে গেছে? তো বালকটি সংগ্রাম করলে তাকে কোলকাতার ফুটপাথে দোতলার জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে যে লোকটি তার কী হবে? হায় সেলুকাস!! বালকটি ভাবে, এহলে সমাজেরই হৃদয়গত রোগ!

দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বৃহত্তর অংশে যিনি সমাজের এই দুষ্টব্যাধিকে নির্মূল করার জন্যে উড্ডান করেছিলেন রক্তপতাকা; তিনি মহান মুজফ্‌ফর আহমদ। এই ভূমিকার বালকটি এই গ্রন্থের প্রকাশক মজহারুল ইসলাম এবং তাঁর এক আত্মীয় ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলো কলকাতার পার্কভিউ নার্সিং হোমে। তিনি তখন শেষ শয্যায়। বালকটি তাঁকে লাল সেলাম জানিয়ে বলেছিল: কমরেড; আপনি হিমালয়ের মতো উঁচু। কেন ডেকেছেন এই সামান্য বালককে?

তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন বালকটির হাত। বলেছিলেন: "পূর্ববাংলার গণ-আন্দোলন ও শেখ মুজিব" লিখে আপনি প্রগতি শিবিরের ভেতরের বিভ্রম কাটিয়েছেন। এই দায়বদ্ধতা সামান্য নয়। তাই অভিনন্দনের জন্যে বারংবার খবর পাঠিয়েছি।"

বালকটির হাত তখনো সেই হিমাদ্রী শিখরের করতলে ধরা। বিস্ময়াভিভূত বালক বলেছিলো: আপনার উত্থিত রক্তপতাকা নিয়ে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট ফৌজ লড়ছে।" শুনে তিনি আবেগে অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন: পূর্ববাংলা থেকেই বিপ্লব শুরু হবে। তারপর তার আগুন ছড়িয়ে পড়বে দাবানলের মতো। আর আমিও জীবন সায়াহ্নে এসে দেখছি; কই কী করতে পারলাম মেহনতি জনতার জন্যে।" সেসময় তাঁর চোখে জল দেখেছিল বালকটি। পাশে দাঁড়ানো মজহারুল ইসলাম চোখ মুছছিলো। তাঁর আত্মীয় ডাক্তার ভদ্রলোকও। বালকটি হু হু ক'রে কেঁদে উঠেছিলো ডুকরে। তিনি কমরেড তোয়াহার কথা জানতে চেয়েছিলেন। দু'জনেই তাঁরা নোয়াখালীর মানুষ যে! দু'জনেই আন্তর্জাতিক খ্যাত। অথচ জীবনে কারো সঙ্গে কারো দেখা হয়নি।

সে অনেক আবেগ। শিশিরভেজা স্থলপদ্মের মতো সুরভি মাখা। তিনি বলেছিলেন: আবার আসবেন।"

আর যাওয়া হয়নি।

পরে লক্ষ্য জনতার মিছিলে তার শবানুগমনে অংশ নিয়েছিলো বালকটি। জানিয়েছিলো তার অন্তরের শ্রদ্ধা। তাঁর জন্মশতবর্ষিকীতে এই সামান্য উপন্যাস উৎসর্গ ক'রে বালকটি সেই মহীরুহকে জানায় তার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তো সেই বালকটি ক্রোধ নিয়ে চল্লিশ পেরিয়ে দেখে—ফের "গ্লস্‌নস্‌ত্‌" আর" পেরেস্ত্রৈকার" নব্য পুরোহিত এক সর্বনাশা শ্লোগান নিয়ে রাশিয়ায় ম্লান-ধূসর ক'রে দিতে চাইছেন মহামতি লেনিনের ছবি।

সাম্রাজ্যবাদ কি কাউবয় সিনেমার হিরো রেগনের হাত দিয়ে সোভিয়েতে আজ ট্রট্‌স্কির ভূতকে পাচার করছে? সেই ঘৃণ্য ট্রট্স্কি, যে লোকটা পঞ্চমবাহিনী তৈরি ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদের টাকায় হত্যা করেছিলো রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। ধ্বংস করতে চেয়েছিলো প্রথম শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্র মহান সোভিয়েতকে।

বালকটি বলে ওঠে: সাধু! সাবধান!

এবং সবিনয়ে বালকটি মাও সে তুঙের শেষ কথাটিই উচ্চারণ করতে চায় "কখনও শ্রেণী-সংগ্রামকে ভুলে যেও না।"

খবরদার।

মোসলমান হৈচ্ছে নেড়ের জাত। শালাগরে কথা একদম শুনতি পারিনেকো। আর ওই মদনের কথা আমার কাছে কবে না। অরে আমি এতকাল খাতি-পরতি দিছি। ফ্যা ফ্যা কইরে ঘুইরে বেড়াতো হারামজাদা। কাজ কম্মো করতি দিলাম। তো শালার মীরজাফরের জাতির খাজলৎ যাবি কনে? খায় আমার. পরে আমার, আর চুপি চুপি ভোটের ক্যানভাস করে লালঝাণ্ডাঅলাগরে। কথায় আছে, যে করে নেড়ের হিত, সব্বোনাশ তার আচম্বিৎ। এক পয়সার বিশ্বেস নেইকো।

নবীন পেয়াদার মুখে খবর শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ে তিমিরপুরের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা, পঞ্চায়েত প্রধান হারান চন্দ্র মণ্ডল। তার চোখের মণি সাপের মতো। কোঁচকানো কপালের চামড়ায় শুকনো বালুর রেখা। সে গর্জন করে—জাফর কাজীর মুণ্ডু দিয়ে আমি ফুটবল খেলাবো তিমিরপুরের মাঠে।

তিমিরপুর।

কলকাতা থেকে হাসনাবাদ। চল্লিশ ক্রোশের ওপরে। ইছামতী হাসনাবাদকে থমকে দিয়েছে। ওপারে রামেশ্বরপুর। ফেরি নৌকো। টেম্পো, কিংবা টেম্পোরিকসায় রামেশ্বরপুর। চারদিকে যশোহর-খুলনার হাওয়া বইছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নারকোল বীথি। খেজুরের সারি। আম-জাম—কাঁঠালের ঝাড়। বাঁশঝোপ। হিজল জারুল আছে। কেওড়া, গেঁয়ো, শ্যাওড়া, ঝাউ, জগী ডুমুর, বাবলা, তাল, দেবদারুর ছায়ায় সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

*যেমনটি সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে আছে।  নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড সামনে* রেখে উঁচু গলায় তাকাও।

প্রথমে চোখ বিঁধে রক্তক্ষরণ।  কাঁটাতার।

এপার ওপার।

দু' ফাঁক।

তোমার হৃৎপিণ্ডের অর্ধেক।

দুই খণ্ড।  দুই দেশ।  দু'খানা মানচিত্র।

কিন্তু আকাশ এক।

মাটি এক

গাছ-গাছালি এক।

মানুষও।

শোষকও।

শোষিতও।

প্রতিক্রিয়াশীল বলো, তাও এক।

প্রগতিশীল বলো, তাও অভিন্ন।

লেখক, কবি, কবিতা।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিংবা আলাউদ্দীন আল্‌ আজাদ,

সিকান্দার আবু জাফর, কিংবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়…

এক।  এক।  এক।

অথবা জামাত-ই-ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আজম কিংবা জনসংঘের হরিপদ ভারতী…

এক।  এক।  এক।

টাকি, বসিরহাট, হাস্নাবাদ, রামেশ্বরপুর জুড়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে যশোহর খুলনার উদ্বাস্তু মানুষ এসে বসতি গেড়েছে।  যশোহরের মানুষের কথায় যে টান, খুলনার মানুষের কথায় যে গ্রাম্যতা, এ পারের চব্বিশ পরগণার মাটিতেও সেই টান, সেই গ্রাম্যতা। মুখভরা পলিমাটির কমনীয়তা। সুন্দরবনের উদ্দাম প্রকৃতি মানুষের অবয়ব জুড়ে।

হাস্নাবাদের, রামেশ্বরপুরের মানুষের মুখে কলকাতার নাম নেই। ওখানকার মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে কলকাতা আসে প্রতিদিন।  সেভেনটি নাইন বাসরুট। জিজ্ঞেস করলেই বলে, শ্যামবাজার, পাতিপুকুর, বাগুইহাটি।  কলকাতা বলতে ওরা শ্যামবাজার, পাতিপুকুর, বাগুইহাটির নাম বোঝে।

ছোট রেল লাইন হিঙ্গলগঞ্জ—হাসনাবাদ। খেলনা গাড়ির মতো রেল। এক চিলতে। তিন চার পাঁচখানা বগি। তাতে যাত্রীর সংখ্যা কত আর। পাঁচ-দশ-পনেরো মিনিট পর পর বাস। মানুষের ভিড় তাই বাসে।

খাপ খোলা তলোয়ারের মত প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ জাফর কাজী। গ্রামের ওই ভাষা; পুরো নাম কাজী জাফর ইমাম। গাঁয়ের মানুষ ডাকে জাফর কাজী। জাফর মাস্টার। প্রবাদ পুরুষ তিনি তিমিরপুরে। সৎ, শান্ত আর পরোপকারী মানুষ। এখন ষাটের শূন্য ছুঁয়ে ফেলেছেন। তাই তলোয়ারের মতো একটুখানি আনত ভঙ্গিতে হাঁটেন। মেদহীন শরীরে যৌবনের সেই ফেলে আসা জোয়ার এখনো তাকে সৌম্যদর্শনের প্রতীক ক'রে রেখেছে। একটিও দাঁত মীরজাফরী করেনি। কিন্তু ক্লান্তি তো যৌবনেরও থাকে। যেমন থাকে তার উদ্দাম আবেগ।

তো ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সন্ধে পাড় ক'রে দিয়ে তিনি কলকাতা থেকে ঘরে পা দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নবীন পেয়াদার ডাক—এই যে মাস্টার সায়েব।

থমকালেন জাফর কাজী। নবীনের সম্বোধনে অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু তার স্বভাবের ঔদার্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—নবীন যে?

হারিকেন বাঁ হাতে নবীনের। ডান হাতে তেল চিক্‌চিক্ লাঠি। উদ্ধত ভঙ্গিতে নবীন তার হাতের লাঠিটা ঠকাস ক'রে একবার ঠুকে দিলো শুকনো খট্‌খটে শক্ত উঠোনে—হ হ আমি নবীন। প্রোধানবাবুর জরুরী তলব। আপনেরে যাতি হবে অ্যাক্ষণ।

অবাক হলেন জাফর কাজী। একটু শঙ্কিতও। মনে মনে একবার মদনের কথাটা ভাবলেন। কোনো অঘটন ঘটালো নাকি মদনরা? সেরকমই একটা গুমোট পরিস্থিতি সপ্তাহ খানেক ধরে তিমিরপুরের আকাশে-বাতাসে ফিস্ ফিস্ করছো। তিনি তবু হেসে বললেন—ডাকিছেন যখন, যাবো। তুমি কওগে, দুই দিন বাদে ঘরে ফিরতিছি, পয়-পরিষ্কার হয়ে আসতিছি।

: অ্যাক্ষণ যাতি হবে। সাথে কইরে নে যাতি কয়ছে!

: তার মানে হুকুম?

: হুকুমই তো।

: এই অবস্থায়ই যাতি হবে? না-খায়ে না দায়ে?

: খায়ে যাবেন না হুদা প্যাটে যাবেন—তার আমি কি জানি? আমারে ধইরে নে যাবার হুকুম, চলেন।

: আমি চোর? অ নবীন, এসব কি কও?

: কই কথা। ফ্যাচর ফ্যাচর রাহেন তো। চলেন।

চকিতে জাফর মাস্টারের মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেলো। আল্‌টপ্‌কা তিনি ঘরের খুঁটি ধরে নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করলেন। মনে হলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার পায়ের তলায় ভূমিকম্প হয়ে কাঁপতে লাগলো। না। নিজেকে শক্ত করলেন তিনি দৃঢ়ভাবে। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন—নবীন, পঞ্চায়েত প্রধানের মতো এইরম ভাষা প্রধানমন্ত্রীও কয় না। কথায় মাপ-জোক থাকে। তুই যা। ক'গে—আমি সময় হলি যাবো।

: এই কথা?

নবীনের হাতের লাঠিতে জাফর কাজীর উঠোন কাঁপে। গোঙরাতে থাকে ক্ষ্যাপা বাঘের মতো। নসিরণ বাণু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন স্বামীর সঙ্গে নবীনের কথা কাটাকাটি। তিনি শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন—যাও না ওমনিই। কি কয় শুনে আসো গে। কি থুয়ে কি হবেনে বাপু, আমার বুক কাঁপে ডরে। নসিরণ বাণুব চোখে বিহ্বল শূন্যতা। তাকে খুব করুণ দেখায়।

জাফর কাজী কি ভাবলেন। খানিকটা ইতস্তত। স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞেস করতে চাইলেন, তার অবর্তমানে তিমিরপুরে কোনো অঘটন ঘটেছে কিনা। কিন্তু নবীনের সামনে তো এসব বলা যায় না। মাথার ভেতরটা গরম হয়ে, ওঠে। মনটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে যায়। হারু মণ্ডল, হারান চন্দ্র মণ্ডল আর তার পারিষদ তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। শান্তিতে থাকতে দেবে না একদণ্ড। ওদের কোনো কাজ নেই। ষড়যন্ত্র ছাড়া, ফাঁকিবাজি ছাড়া ওরা কিছুই জানে না। আর মানসম্মান বোধের শেকড়ে ওরা বেনোজলের ঢেউ তুলে মানুষকে নির্বিবাদে লাঞ্ছিত ক'রে আনন্দ পায়। পরিতৃপ্তি ওদের মানবতার কণ্ঠরোধে। আসলে ওরা যে কী চায়, তা বোধহয় নিজেরাও জানে না। অবক্ষয়ের এই হলো ভবিতব্য। ক্ষয় যখন শুরু হয়, তিল তিল ক'রে ধস্‌ নামে, উথালপাথাল ঘূর্ণীধারায় টুপ্‌টাপ ক'রে ভেসে যায় মানুষের মূল্যবোধ, মোহন হৃদয়বৃত্তি, কেউ তা বোঝে, কেউ তা বোঝে না। যারা বোঝে, টের পায়, তারা নগণ্য। কিন্তু……না বোঝার পাল্লাটাই তো ভারী। আর ভয়টা তো তখনই বেশি। ক্ষয় হয়ে যাওয়া মূল্যবোধের শূন্যস্থান জুড়ে বাসা বাঁধে পশুত্ব, বিবেকহীন অতি-মাত্রার বিকৃতি। মানুষকে তখন হিন্দু সাজতে হয়, মুসলমান সাজতে হয়। চোখের ভেতরে যে চোখ, যে চোখ দিয়ে দেখা যায় বিশ্ব-জগতের একেবারে ভেতরটাকে, তাতে প্রতিভাস ফুটে ওঠে—প্রেতযোনীর। জন্ম নিতে থাকে

হননের স্থূল রিরংসা। নিজের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে মানুষ তাই অবক্ষয়ের আশ্রয় নিতে চায়। অন্যকে দায়ী করে নিজের ব্যর্থতার জন্যে। তখন তার বিকৃত মানসিকতার হিংস্র স্বরূপ ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। হারান চন্দ্র মণ্ডল আর তার ক্ষমতাবান পরিসরে সবটাই আজ সেই হিংস্রতার রিরংসায় স্বরূপে প্রকাশ। সামনের অবশিষ্ট ভালটাকেও সে—ধ্বংস করতে নির্দ্বিধায় অগ্রসর হয়। হচ্ছেও। তা কতদূর গড়াবে—মহাকাল বলতে পারে সে কথা।

এখন নিজের ভেতরের অস্থিরতার রাশ টেনে ধরলেন জাফর কাজী। কিন্তু নরম হলেন না। সবসময় তো শিষ্টাচারের কড়া অনুশাসনে মনকে বশীভূত করা যায় না। মনের নিজেরই তো উচ্ছ্বৃত প্রবাহ মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে তিনি নবীনের দাপিয়ে লাঠি ঠোকা দেখলেন। দেখতে দেখতে ষাট বছরের পরিসর ছাব্বিশে নেমে এলো। সবেগে সেই দুরন্ত যৌবন বিদ্রোহ করতে চাইলো আপন স্বভাবে—কাজী জাফর ইমাম হারাণ মণ্ডলের গোলাম না হে নবীন। যদি যাতি হয় তো, আমার মতন করে যাবো। যাও।

নবীন চেঁচায়—এই কথা?

হ্যাঁ এই কথা। ছাফ্ ছাফ্।

কপালে দুক্কু আছে কলাম।

নবীন। আমি ক্লান্ত। পেটে ক্ষিদে।

ঠিক আছে। তৈরি থাইকেন কয়ে গেলাম।

আছি। থাকপোও নবীন।

বুইড়া ভাম্……। নবীন চোখ পাকায়। লাঠি নাচায়। হারিকেনের আলোয় উঠোনে তার ছায়া কাঁপে।

চিৎকার করে উঠলেন জাফর কাজী —নবীন!

নবীন একবার এগুতে গেলো। কিন্তু এগুলো না। দুপ্ দাপ্ পা ফেলে—লাঠির ঘায়ে শব্দ তুলে সে চলে গেলো।

নসিরণের কণ্ঠে সেইসময় ভয়ের শিহরণ জাফর কাজীকে নাড়া দিয়ে যায় —ভালো কৈল্যে না কামডা। মণ্ডলরে তো তুমি চেনো। একদিন মদনডারে কাইটে নদীর পানিতে ভাসায়ে দিছে। তুমারেও। আল্লা-গো……।

অসহায় বোধ মানুষকে কাঁদায়। কাঁদতে লাগলেন নসিরণ।

কোথায় একটা পেঁচার পাখা ঝাপ্টা—থ্যাক্ থ্যাক্ ডাক। কর্কশ শব্দে হৃৎপিণ্ডে আতঙ্ক ছড়ায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ষাট বছরের পাঁজর ভেঙে জাফর কাজী। বললেন—মদনের মা, কাঁদলে মানুষ শান্তি পায় খনিকক্ষণের জন্যি। কাঁদো।

: কাঁদতিছি তো জন্মকাল ধৈরে।

: মৃত্যুকাল ধৈরে তা চলবি।

: মরণ হলি তো বাঁচি। আর কত সবো? কত সওয়া যায়?

হাসলেন জাফর কাজী। জ্বলতে জ্বলতে, ক্রোধ হতে হতে, মানুষ যেমন কাঁদে, হাসেও তেমনি সহজে। সে হাসির অদৃশ্যের কথা অজানা থাকলে, মর্ম বোঝা যায় না। কিন্তু নসিরণ তা জানেন। তিরিশ বছরের সংসার জীবনের সাথীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের গোপন ব্যাখ্যাও তার জানা হয়ে গেছে। তাই, তার মুখে হাসি দেখলে নসিরণের বুক কাঁপে। বুঝতে পারেন, এখন কঠিন, নির্দয় কোনো কথা বলে ফেলবেন জাফর কাজী।

: হারান মণ্ডলরা মানুষ কাটে, মদনরা পশু নির্মূল করার কথা কয়। আমি তো এর সঠিক মানেগুলান জানি মদনের মা। জানি-শুনি বলেই মদনরে কই, একটা পশু নির্মূল কইরে ফল হবিনে; য্যাতো পশু আছে—তার ছোপ্ শুধ্যে উপ্ড়ে ফেলতি হবে।

: মদন আমার বাঁচপিনে, সে আমি জানি। বলতে বলতে কান্নার ঝর্নাধারা নেমে আসে নসিরণের দু'চোখ ছাপিয়ে।

মমতায় সিক্ত হলেন জাফর কাজী স্ত্রীর ভেঙে পড়া কষ্ট দেখতে দেখতে। মাথা নাড়লেন। পায়ের চটি খুললেন অতীতের স্মৃতি চারণায়। গায়ের জামা, পা-জামাটা ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে ঘরের অস্পষ্ট আলোয় মদনের ছবির দিকে তাকালেন একবার। বুকের ভেতরে মমতাবোধ শিশুকালের খেলায় টেনে নিয়ে কোন্ সুদূরে ভাসিয়ে দিলো। নসিরণের কথার জবাব দিলেন—কে বাঁচপি চিরকাল? বাঁচেনা কেউ। তুমি, মদন, আমি, কেউ না। তালি অ্যাতো ভয় পাও ক্যা?

হারিকেনের স্বল্পালোকে নসিরণের গাল বেয়ে জল গড়ায়—যে শরীলে মৌৎ আছে, সে শরীলে ভয় থাকপিনে?

: তা থাকে। আমি অন্য কথা কই নসিরণ……

নসিরণ কেঁপে ওঠেন থরথরিয়ে। কতকাল, কতকাল পরে মানুষটা তার নাম ধরে ডাকলেন। সেই প্রথম প্রথম। মুরুব্বিদের চোখের আড়ালে নাম ধরে ডাকলে তার ভেতরের সংকোচ লজ্জার সমস্ত রুদ্ধ দুয়ারগুলি ঝট্‌পট্ ক'রে খুলে যেতো। তিনি শিহরিত হতেন। আবেগে নিজের পরম প্রাপ্তিতে আকণ্ঠ

পরিতৃপ্ত হতেন। বুনতেন স্বপ্নের জাল। তাতে জড়িয়ে যেতেন নিশিভোর। কুসুম কুসুম ভালবাসার ওমে জাফর কাজী অফুরন্ত কল্লোল তুলতেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে এখন তিনি পরিপূর্ণ চোখে তাকালেন বহুদিন পরে সেই আপন মানুষটির দিকে।

সাদা ধব্‌ধবে চুল। ঘন ভুরু। অসম্ভব উজ্জ্বল দুটি চোখ। তাতে মহা শতাব্দীর চালচিত্র। কখনো বিষাদ। কখনো দারুণ দুঃখবোধে গভীর তন্ময়তা। উন্নত নাকের নিচে বয়সের কুঞ্চন এখন। তবু মেদহীন শরীরে শক্তির দাপট যেন সমস্ত পাপবোধকে সদাসর্বদা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত। আর শব্দ উচ্চারণে তার মিষ্টি নির্যাস মানুষকে বিমোহিত করে নিমেষে।

নসিরণ ভাবলেন, এমন মানুষেরও শত্রু থাকে?

ঃ নসিরণ। মদনগরে কাজ খুব শক্ত। ক্ষ্যাপা পশুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই।

ঃ সেই জন্যি ভয় করে আমার।

ঃ মদনরা ভয় পায় না।

ঃ উরা পাষাণ হয়্যা গিছে।

ঃ পাষাণ কও কিসে? পাষাণের জীবন নাই। মদনগরে জীবন আছে। পাপবোধ আছে। ন্যায় অন্যায়ডা আমার চাইতিউ ভাল বোঝে। সেই জন্যি বাধা দিতি পারিনে। নিজি তো ফুরায়ে গেলাম। কয়দিন আছি আর? বার্ধক্য দিয়্যা জগতের কিছু হয় না। যৌবনের কাছে জগত বশীভূত। উরা সেই যৌবন। ভয়-ডর-দুঃখ-যন্ত্রণার সে ধার ধারে না।

হাসলেন জাফর কাজী। কাঁধে গামছা ফেলে পুকুর ঘাটের দিকে যেতে যেতে বললেন—চাড্ডে ভাত বাড়ো, খায়ে হারু মণ্ডলের কাছে যাতি হবে।

স্বামীর কথা শুনলেন নসিরণ। আপন মনে বিড় বিড় করে হয়তো নিজেকেই শোনালেন—আমার বুক কাঁপে। নসিবে কি আছে, জানে মাবুদ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলেন জাফর কাজী আর উৎসারিত হওয়া অমোঘ এক সংলাপ তার ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে বলে উঠলো—মাবুদ অন্যায় জানেন না। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ—হানাহানিও জানেন না। কিন্তু—নসিরণ, হারান মণ্ডল—জাফর কাজীরা সেই সত্যডারে ম্যালাদিন আগে-শ্মশানের চিতায় আর গোরস্থানের কবরে নিঃশেষ কইরে দিছে।

তো নবীনের কথা শুনে আকাশের বাঁকা চাঁদ হয়ে কপালে উঠে গেলো

হারান মণ্ডলের ভূরুযুগল। তীক্ষ্ণ চোখে শ্যেনের মতো তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ নবীনের মুখের দিকে। যেন বাঘ তার শিকার করা পচা লাশের সন্ধান পেয়েছে। —কি, আমি কাফের?

নবীন ঢোক গিলে, মাথা চুলকে, মনে মনে ঈশ্বর জপতে জপতে বললো—হয়। কাফের কয়ছে আপনেরে মাস্টের।

: শুয়ারের বাচ্চা। গর্জে ওঠে হারু মণ্ডল।

নবীনের পায়ে পায়ে ভয় পাওয়া ঠোকাঠুকি কাঁপুনি। জোড়হাতে সে বলে—কয় কি হুজুর: ...

: কি কয়?

: হুজুর! আমার কুনু দুষ নাই হুজুর। বড় পাপের কথা......

: ঝাইড়া কাশ হারামজাদা। আম্‌তা আম্‌তা করোস ক্যা?

: কয়ছে, ইন্দিরা গান্ধী যেমুন খারাপ মেয়ে ছেইলে, তেমুন আপনেও ছোটলোক, ধান্দাবাজ, মোসলমানের দুশমুন।

: জয় মা কালী—এই কথা? ইন্দিরা গান্ধীরে গালিগালাজ?

: সীয়ারাম! সীয়ারাম! এহি কোথা?

রামেশ্বরপুর বাজারের তেজারতি কারবারের কুবের, পূর্ববাংলার রংপুর থেকে আসা—মাড়োয়ারি রঙ্গলাল দাগা রাগে কাঁপতে কাঁপতে একবার হারু মণ্ডল, দীপক সান্যাল, অনাদি খাসকেলের মুখের দিকে তাকালো। ইন্দিরা গান্ধীর অপমানে সে উন্মত্তভাবে বলতে লাগলো—রাম কহো জী! হিন্দুস্থানের জমিন্‌মে বোসিয়ে জাফর কাজীকো এত্‌না হিম্মৎ? ইন্দিরাজী কি ইনসাল্ট? উ শালো পাকিস্তান কি এজেন্ট। হাঁ—হাঁ—জরুর এজেন্ট হো। নেহিতো ইরকম কোথা বলার সাওস হোয়? পরধানজী, আপ আভি আভি নবীনকো ভেজ দিজিয়ে। পাকাড়কে লিয়ে আয়ুন ও শালো বুড্ডাকো। থানাকো বোলাইয়ে। আউর চোরি কেসে ফাসিয়ে দিন......। হামি রুপিয়া দিবে। লক্‌-আপ্‌মে ডাণ্ডা মারকে হাড়-মাস এক করনে পরেগা। শালো, হিন্দুস্থান কি পবিত্‌রো মাটি......যবন আদ্‌মি—শালে লোগ অপবিত্‌রো করছে। সমঝানে পরেগা ......কি ইয়ে হিন্দুস্থান হো।

অনাদি খাসকেল হারু মণ্ডলের 'কৃপাহি কেবলম্‌' প্রার্থী। তার প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টারের চাকরিটাও মণ্ডলের কৃপার ফল। রঙ্গলাল দাগার কথায় তার সর্বাঙ্গে ক্রোধের লেলিহান আগুন জ্বলে ওঠে। মনে মনে পূর্বপাকিস্তানের রায়োটের স্মৃতিটা পূর্বাপর ভেবে সেই লেলিহানকে আরো তীব্র করতে চেষ্টা

করে। সে চিৎকার ক'রে ওঠে—এটা হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থান—হিন্দুগো তীর্থস্থান। এখানে যবনের এতবড় আস্পর্দা সৈহ্য করা যায় না মণ্ডল দা।

: সেহি বাৎ হামারওভি।

: ত্যালে জলে মিশ খায় না কুনোদিন। হিন্দু-মোসলমানেও মিল হয় না। মীরজাফরের জাত। গোখ্‌রা সাপ। বলে আগুনচোখে তাকায় অনাদি খাসকেল।

: ঠিক বাৎ। মাথা নাড়ে জগৎ শেঠের বংশধর রঙ্গলাল দাগা।

: উরা যে পাতে খায়, সেই পাত ফোঁড় করে। আমার ঠাকুরদায় কইছে—যদি করিস্ নাইড়ার হিত, লাঠি রাহিস মাথার দিক। যে কথা মণ্ডলদাও কয়ছে খানিক আগে।

: শালো ঔরঙ্গজিব কি করলো মুঘল পিরিডমে? কি করলো?

: ঠিক কইছেন দাগাজী। হিন্দুস্থানে হিন্দুগো তীর্থ করতে জিজিয়া কর দিতি হয়ছে। এ শালা সৈহ্য হয়?

: কাঁহে? কাঁহে মানতে হোবে? পাকাড়ো শালে কো।

: ইন্দিরা গান্ধী আমাগো দেবী দুগ্যে। তার নাম ধইরে গালিগালাজ? মণ্ডল দা, আমার মাথায় দপ্‌ দপ্‌ আগুন। মনে হতিছে……মনে হতিছে…গরুখেকোগুলারে ধইরে জয় মা কালী……

: হাঁ, পরধানজী, নোবীনকো ভেজ দিজিয়ে। আপনি চুপ করিয়ে আছেন কেনো? লিয়ে আস্থন। হামি রূপেয়া দিবে।

: মণ্ডল দা! শিকারের লোভে ছট্‌ফট্ করে অনাদি খাসকেল।

: হারু!

গম্‌গম্ ক'রে উঠলো হারু মণ্ডলের বৈঠকখানা দীপক সান্যালের কণ্ঠস্বরে। রামেশ্বর পুরের মনোহারি বেনেতি কারবারের মালিক এখন দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হয়ে গেলো সকলের সামনে। যারা হারু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ, তারা সবাই জানে, মণ্ডল আসলে নামে প্রধান। কাজে সর্বময় ক্ষমতা এই দীপক সান্যালের। মণ্ডল—সান্যাল দু'জনেই সমবয়সী। শৈশব থেকে বন্ধুত্ব দু'জনের। তো সান্যালও খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে এখন। সে কঠিন স্বরে ডাক দিলো নবীনকে।

: নোব্‌নে।

: আজ্ঞে বাবু।

: জাফর কাজীরে ধরে নে আয়।

: কয়ছে, সোময় হোলি আস্‌পি। সবিনয়ে জানায় নবীন পেয়াদা।

: ওই হারামি, তর কাছে কি ব্যাখ্যা চাইছি আমি ? মুণ্ডুডা তর কইতরের মতো ছিঁড়া ফ্যালামু। যা, ধরে নে আস্‌পি চুলির মুঠি ধইরে।

নবীন তবু দ্বিধাগ্রস্ত। হারু মণ্ডলের দিকে কাঁচুমাচু মুখে তাকায়। অবশেষে দীর্ঘসময় নীরব থাকার পর হারুমণ্ডল কিন্তু তালভঙ্গ ঘটায় তার অনুত্তেজক কণ্ঠস্বরে। খানিকটা কৈফিয়তের সুরে সে বলে—আসতি যখন চায়ছে,…আসতি দাও আগে। কথাবার্তা কই। মতলবটা বুঝি।

: তার মানে ? কি কতি চাও মণ্ডল ? দীপক সান্যালের চোখের উত্তেজক সন্দেহটা স্থির হয়ে থাকে হারু মণ্ডলেব মুখের ওপর।

মাথা নাড়ে হারু মণ্ডল—ভাইবে চিন্তে কাজ করতি হবে সান্যাল। জেলার সেক্রেটারি কয়ছে, মোসলমানগো এখন চটান যাবে না।

: পুজো কোত্তি হবে ? চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে দীপক সান্যাল।

: সে কথা না। সামনে ইলেকশন।

অনাদি খাসকেল ভ্রুকুটি করে তীব্রভাবে—তাতে কি হয়ছে ?

হারু মণ্ডল তেমনি শান্ত—কি হয়ছে মানে ? গাঁয়ে মোসলমান ভোটই তো বেশি ধরতি গেলে। ঝামেলা বাধালি বেঁকে বসতি পারে।

সাপের মতো ফুঁসে ওঠে দীপক সান্যাল—চাবুক মেরে সোজা করতি হবে। জানি, অগো কিরম কইরে সোজা কোত্তি হয়।

: ইলেকশনে তালি আমাগো হার হবি সান্যাল। এমনিতেই তো লাল-ঝাণ্ডারা কয়ে বেড়াচ্ছে আমরা সাম্প্রদায়িক। হিন্দু-মোসলমানে দাঙ্গা লাগাতি চাই। কাজীরে ধইরে নিয়ে আলি হেগো আরো সুবিধে হবি।

দীপক সান্যালের চোখেমুখে তীব্র ঘৃণার ছোবল। সে প্রতিবাদ জানায় হারু মণ্ডলের যুক্তির—খারে গাণ্ডুরাম গ্যারামারা, ভোট বড় না ধর্ম বড় ? এই জন্যি তরে পঞ্চায়েতের মাথা বানাইছি ?

: খামোকা রাগ তোমার সান্যাল।

: চুপ। নেতাগিরি ফলাবিনে কলাম। নেতা হয়ছে ! ট্যাক মোটা হওয়ার গরম। শালা—ভোটের বেসাতি করতি যায়ে—পাকিস্তানের এজেণ্টগরে পুজো করতিছিস। ছাশডারে শয়তানের স্বগ্যো বানাতে চাস ?

হারু মণ্ডল থম্‌কায়। তার ব্যাখ্যা দেবার সাধ্য নেই। সান্যালের অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। হারু মণ্ডলের পারিষদেরাও জানে, সান্যালের ক্রোধের সামনে মণ্ডল কেঁচোগণ্ডুষ। খোলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। মুখ বের করার সাহসও হয় না তখন। কেন এ রকম হয়, কেউ তার কারণ জানে না।

মনে মনে কৌতূহল আছে সকলেরই। এখনও সে কৌতূহল অনাদির মনে, রঙ্গলালের মনে। কিন্তু কেউ তা প্রকাশ হতে দেয় না।

হারু মণ্ডল হাসে। দীপক সান্যালের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেষ্টা করে সে—চা খাবে তো?

সান্যাল উগ্রমূর্তিতে রুখে ওঠে—মোসলমানগরে পিচ্ছাব খাগে যা। হারামখোরের দল। ত্যাশডা ভাগ হয়ছিলো ক্যা? হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ক্যা? নেড়াগো পা চাটবো বলে?

অনাদি খাসকেলের বক্ষস্ফীত উর্ধ্বশ্বাস সদর্পে সমর্থন জানায় সান্যালকে—উচিত কথা সান্যালদার। ত্যাশ ভাগ হয়ছে—হিন্দুস্থানে হিন্দু, পাকিস্তানে মোসলমান। এসব তত্ত্বকথা কনে গেলো? হগ্‌গোলেই ভোটের জন্যি পা চাটে নেড়ুয়াগরে।

সান্যাল ফুঁসতে ফুঁসতে বলে—চাটে না খালি হিন্দুমহাসভা, আর এস এস, জনসঙ্ঘ আর শিবসেনারা। কৈল্‌কাতার কালোয়ারেরা মাঝেমাঝেই কলাবাগানে জয় মা কালী বলে গৈর্জে ওঠে। বাপের ব্যাটারা দেইখো একদিন কলাবাগানডারে জ্বালায়ে দিবে।

: হাঁ-জী, সেহি বাৎ। সাচ্চা বাৎ। রঙ্গলাল সমর্থন জানায়।

: উরাই ঠিক। বললো অনাদি—অগো সাথেই থাকমু এখন। কি কন সান্যাল দা?

: এতদিন তাই উচিত ছেলো। ভুল করছি অনাদি, খুব ভুল করছি তিন রঙের বাহারে ভুইলা গিয়া।

হারু মণ্ডল যেন ধৈর্যের প্রতীক হয়ে যায়। তার চোখে মুখে ভাবলেশহীন স্বাভাবিকতা। নবীনকে চা আনার ইশারা ক'রে আস্তে আস্তে বললো—উপুরি উপুরি তাই মনে হয় যে, আমরা মোসলমানগরে ভালবাসি। উডা কতি হয় ভোটের জন্যি। আমাগো সব হিন্দু-নেতা-কর্মীরাই জানে, মানেও, মোসলমান আমাগরে দুশমন। সেই জন্যিই হেগোরে লেখাপড়া শেখানের উদ্যোগ নাই, চাকরিতেও জায়গা নাই। আমরাই তা বন্ধ কইরে দিছি। কায়দাডা বোঝো আগে। অরা অশিক্ষিত থাকলি—চাকরি নাই। চাকরি না থাকলি—পয়সা কড়িও নাই। দুর্বলরা ফাইট করতি পারবিনে। বলে নেতার মতোই আত্মপ্রসাদের হাসিতে আকর্ণ উজ্জ্বল হলো হারু মণ্ডল। আর সেই হাসির রেখা মিলিয়ে যেতে না দিয়েই সে বললো আবারও—দাদার সোমম্ন দেখতি পাওনা? ব্যাবাকেই এক মন, এক প্রাণ। যারে কয় হরিহর আত্মা। তো পুজো

করার কথা আসে ক্যা? ত্যাল দেওয়ারই বা কথা কি জন্যি আসে? তাও জাফর কাজীর। আমার জন্ম-জন্মান্তরের দুশমন। অরে বাগে পালি-নিজির হাতে কোপায়্যা মারমু আমি।

বৈঠকখানা ঘর যেন হঠাৎ হারু মণ্ডলের কথায় শীত তাড়ানিয়া গান গাইতে গাইতে গরম হয়ে ওঠে। অনাদির চোখের আগুনে হিংস্রতার ফণা। রঙ্গলাল দাগা দামী সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দেয়। যেন হরিলুটের বাতাসা। অনাদি খাসকেলও ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভের মহিমায় গর্ববোধ করে।

দীপক সান্যাল অল্পতে খুশি হয় না। তার ইতিহাস অন্যরকম। যতক্ষণ তার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ সে হাসির মেলায় নিজেকে মেলে ধরে না। হারু মণ্ডল তা জানে বলেই আরো হিংস্র হয়ে কথা বলে—যে কোনো একটা মওকা চাই, খুব বড় একটা দাঙ্গা লাগাতি হবে।

: ঠিক বাৎ। থানে মে রুপেয়া যা লাগবে, হামি দিবো।

: জমি জিরেত সব হিন্দুগরে বিলি কত্তি হবে। বললো অনাদি সিগারেটের নীল্‌চে ধোঁয়া উড়িয়ে—পুকুর কাটতি হবে। মাছের চাষে ভাল প্রফিট।

হারু মণ্ডল ইন্ধন জোগায়—মন্দিরে একটা গরুর মাথা ঢুকায়ে দিতি হবে।

অনাদি লাফিয়ে ওঠে খুশিতে—গুরু, গুরুগো পায়ের ধুলা ছান—চাইটে চাইটে খাই।

রঙ্গলালের ঠোঁট কাঁপে, ভুরু নাচে আনন্দে—আইডিয়াটো সুপার ফাইন। মন্দিরমে……রাম কহো……হল্লা লাগানেকো আচ্ছা মওকা মিলে যাবে। হা হা শব্দে হেসে বৈঠকখানা কাঁপিয়ে দেয় রঙ্গলাল।

সেইসময় নৈঃশব্দ্যের বজ্রপাত।

দরোজায় জাফর কাজী।

মার্কিনের পাঞ্জাবী। খাটো ধুতি। চটি পায়ে—হাতে টর্চ। গাম্ভীর্যে জমাট মুখ।

যেন—মহাকাল।

রঙ্গলাল চুপ।

অনাদি চুপ।

দীপক সান্যাল না দেখার ভান করল।

নবীন হাও…

শুধু হারু মণ্ডল চোখ তুলে … ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। …তেই হলো শুকনো মুখ…

: নবীন ডাকতি গিছিলো। বললেন জাফর কাজী।

হাসি মুখ হারু মণ্ডল—তেমুন জরুরী কিছু না। অনেকদিন দেখা সাইক্ষ্যাৎ নাই। বসেন আগে।

: নবীন তো গেরেফতারের কথা কয়ছে গিয়া।

: আরে না। নবীন তো কুত্তারও অধম। মুখ্যু। কি থুয়ে কি কয় ব্যাটা। বসলেন জাফর কাজী।

বাইরে ভেতরে নৈঃশব্দ্য।

অনাদি পাশ থেকে মণ্ডলকে আঙ্গুল দিয়ে মৃদু খোঁচা দিলো। খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা। আর যে জাগে, তাকে কে জাগায়। কেবল মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজার অবকাশটুকু। মণ্ডল এখন সেই চেষ্টায় নিজেকে প্রস্তুত করে। মুখে তার হাসি—কাজী সাহেব, ইস্কুল তো ছুটি। আইজকাল ইদিকে একবারো আসেন না দেখি।

: আসা হয় না।

: মদনও আসে না। কি যে অপবাধ করছি আমরা।

: মদনের সাথে আমারই কালে ভদ্রে সাইক্ষ্যাৎ ঘটে।

: কি করে মদন ?

অনাদি উসখুস করতে করতে বলে ওঠে—ছারপোকাব যা কাম, তাই করে। জাফর কাজী কথাটা শুনলেন। কিন্তু এড়িয়ে গেলেন—না শোনার ভান ক'রে। তিনি জানতেন, ভয়ানক এক রহস্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা ক'রে আছে তারই অভ্যর্থনায়। হঠাৎ করেই সেই রহস্য তার কদর্য চেহারা নিয়ে উন্মোচিত হবে তাকে আঘাত করতে। আসার সময় নসিরণ তার হাত ধরে কাকুতি মিনতি করেছে।—মাথা গরম কইরবে না। যা কয় মাথা নিচু কইরে শুইনে আসপে। তুমারই কথা, কয়-জনে বড না, সয়-জনে বড়।

মনে মনে মাথা নাড়লেন তিনি। নসিরণ, তোমার সারল্যের তারে সমাজের তার যদি বাঁধা থাকতো, তাহলে এই উৎকট পীড়নের অপেক্ষায় আমি নির্দোষ মানুষটি এখানে কুরবানীর পশুর মতো বসে থাকবো কেন ? যে কয় সে বড় না ঠিকই। কিন্তু সহ্য যে করে সেও তো বড না। রবীন্দ্রনাথের কথা, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে। ভাবতে ভাবতে বুক ঠেলে-দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে যায়। ক্লান্তিবোধের কথা তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন। এভাবে নতমুখে অপমানের নীরব আক্রমণ তাঁকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে থাকে। নীরবতাও কি কখনো কখনো উৎপীড়ন করে ?

বিবেকের চৈতন্য বলে ওঠে, সে আরও ভয়ঙ্কর। দুঃসহ।

সামনের আক্রমণ রোখা যায়, ভেতরের আক্রমণ চূর্ণবিচূর্ণ করে সাজানো বাসভূমি। রোখা যায় না।

তিনি দেখতেও পেলেন না দীপক সান্যাল হারু মণ্ডলকে ইশারায় মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ইশারা করলো। কিংবা রঙ্গলাল দাগা তার দিকে তাকিয়ে অনাদি খাসকেলের চোখে চোখে ঘৃণামিশ্রিত ইঙ্গিত করলো।

: কাজী সাহেব।

হারু মণ্ডলের কণ্ঠে কন্‌সার্ট বেজে ওঠে—আপনার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য ছিলো।

: কি ?

: টাকা।

: টাকা পাবেন আমার কাছে !

: অনেক দিনির হিসাব। ভুল হতি পারে আপনার।

: হ্যাঁ। হিসাব একটা আছে হারানবাবু। কিন্তু তাতে তো পাওনাদার আমিই।

শুনে হা হা ক'রে হাসে হারানচন্দ্র মণ্ডল।

হাসতে হাসতে নিজের হাঁটুতে চটাস্‌ ক'রে চাটি মেরে শব্দ তোলে।

দুলতে থাকে ফণা তোলা গোখ্‌রো সাপের মতো।

হাসির শব্দ মৃদু হয়ে যায়। তার রেশটা কিন্তু হিস্‌ হিস্‌ করে।

চেঁচিয়ে ওঠে হারু মণ্ডল—নোব্‌নে !

নবীন ছুটে আসে।

ম্যাজিক পুতুলের মতো সে মুখিয়ে থাকে প্রভুর হাতের অদৃশ্য সুতোর টানের অপেক্ষায়। প্রভুর সুতোয় টান পড়লেই সে নাচতে শুরু করবে।

কাজী একবার চোখ তুলে দেখলেন চারদিক। ক্রমে তার ভেতরের সম্মানবোধ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তিনি তার রাশ ধরে রাখতে চেষ্টা করেন প্রাণপণ।

রঙ্গলাল দাগা আচমকা বলে ওঠে—কাজী সাহাব, ইয়াদ আছে কি ইঠো ইণ্ডিয়া আছে ? পাকিস্থান—ফাকিস্থান নেহি ! ঔর ঝাণ্ডাভি একই আছে। তিন রং চরকা। ব্যস্‌। ওহি চরকা, ওহি রং মোসলমান সোসাইটির জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে। তো আপনি—ইন্দিরা গান্ধীকো ইনসাল্ট্‌ কিয়া কাঁহে ?

কাজীর মুখে গভীর রেখাপাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তীব্র যন্ত্রণায়। তবু তিনি

নিজেকে নসিরণের অনুরোধে বেঁধে রাখেন। শাসন করেন, ধমক দেন উত্তেজনাকে।

: নবীন!

হারু মণ্ডল মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে—কাজী সাহেব কি কয়ছে তোরে? সত্যি কথা কবি।

নবীন ফ্যাকাসে মুখে তেত্রিশ কোটি দেবতার কসম খেয়ে বলে—দোহাই তেত্‌তিরিশ কোটি দেব্‌তার, মিছে কথা কবো না। মিছে কথা কলি আমার জিভ্‌ য্যান্‌ খইসে পড়ে। আমার য্যান্‌ কুরুকুষ্ঠ হয়া মরণ হয়।

চকিতে কাজী নবীনকে দেখলেন। হাসলেন আপন মনে।

রঙ্গলাল ধমকে ওঠে—এহ লোবীন, আস্‌লি কোথা বোলো।

: হ, আসল কথাই কমু। কাজী সায়েব কয়ছে, তগো ইন্দিরাগান্ধী বড় চোর, হারু মণ্ডল ছোট চোর। কাজী সায়েবের সে কি মূর্তি, আমারে য্যান্‌ খায়ে ফ্যালাতি চায়। কত কথা, অতো মনে নাই আমার। কয়, আমি তোগো হারু চোরের চাকর না। হুজুর, আপনের বলে খারাপ চরিত্তির···

কান্নায় নবীনের গলা ধরে যায়। সে ফোঁপায়। হুকু-হুকু শব্দ বাজে।

আবার নৈঃশব্দ্য।

ঘরের ভেতরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিল্লি ভেসে আসে।

আকাশে মেঘের ডাক গম্‌গমিয়ে হাঁক ছাড়ে।

নবীনের হুক্‌ হুক্‌ শব্দ, ফোঁপানি।

: কাজী সাহেব!

দীপক সান্যালের ডাক। কাজী ফিরে তাকালেন। তার বুকে নিঃশ্বাসের স্ফীতি। ক্রমশ দ্রুত, তীব্র, বেসামাল হাসফাঁস। পলাতক একটা যন্ত্রণা তার কপালের রগে দাপাদাপি শুরু করে। উনি নখ দিয়ে রগ চেপে ধরেন। সেই সময় শরীরে কাঁপুনি আসে ঝাঁপিয়ে।

দীপক সান্যাল দাঁতে দাঁতে কট্‌কট্‌ করে। ঠোঁট বেঁকে যায়। চিৎকার করে না। কিন্তু বিষাক্ত তীরের ঝাঁক ছুঁড়ে মারে শিকারের দিকে—ইন্দিরাজী চোর? আপনি কি? সাধু? জগৎসাধু মহাপুরুষ? তো অ্যাদ্দিন লুকায়ে ছিলেন যে? আগে জানলে, 'প্রধানমন্ত্রী' হতি পাইরতেন।

অনাদি খাসকেল উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ে।

হাসে রঙ্গলাল দাগা—বহুৎ খুব। মারহাবা। মারহাবা।

দীপক সান্যাল শর নিক্ষেপ করে অবিরাম—আহা, তিমিরপুরের জাফর কাজী

লুঙ্গি ছেড়ে কোট-প্যাণ্ট পরে—গ্যাট্‌-ম্যাট্‌ ইংরেজি কতি পাত্তেন। গরুর গাড়ি থুয়ে-উড়াজাহাজে ছ্যাশ-বিছ্যাশ···কি কপাল আমাগরে···

অনাদি হাসতে হাসতে—বিষম খেয়ে গড়াগড়ি যায়।

: ও কাজী সাহেব, আপনার অমৃতবাণী কিছু ছাড়েন ঝোলা ঝেড়ে। কি হারু, শুনতি চাও?

কাজীর মাথার ভেতরে কিলবিল ক'রে ওঠে সহস্র বাসুকীর ফণা। তিনি নীলকণ্ঠ হতে চান। নীল বিষক্রিয়ায় জারিত হয়েও অমৃতের ভাণ্ড সম্মুখে ধরে রাখতে চেষ্টা করেন।

এইসময় হারু মণ্ডল বলে—আমি আর কি শুনমু? ও আমার শোনা আছে। বলতে বলতে হারু মণ্ডল চাপা ক্রোধের ফিস্‌ফিসানিতে রাত্রির বৈঠকখানাকে ভয়ের ঐন্দ্রজালিক আবেশে ডুবিয়ে দেয়। সোজাসুজি কাজীর দিকে চোখ তার—ও কাজী সাহেব, চামড়ার মুখের তো ট্যাক্স লাগে না। আমি যদি হিন্দু মোসলমানে রায়োট বাধাতি চাই তো চক্ষুর পলোকে নাম-নিশানা ছাফ···। হারু মণ্ডলের ক্ষমতা জানেন না? মিঞা সাহেব, এই যে বাঘের খাচায় মাথা ঢুকাইছেন, যদি আর বাইর করতি না দেই? আছে কিছু করার? মদন? পৈশাচিক উল্লাসে শব্দ না ক'রে হাসে হারু মণ্ডল—মদন, শালার চামচিকে। ভাত-খাস্‌ ভাতাবের, ত্যাল্‌ ছ্যাস্‌ নাঙেরে? থাকোস্‌ হিন্দুস্থানে, ইন্দিরা গান্ধীবে চোর কস্‌?

অনাদি হালুম ক'রে ওঠে—বাইর কইরা দিমু হিন্দুস্থান থিকে।

: আল্‌বৎ। এ অনাদি, এ শালো লোগ বহুৎ বেইমান।

: বেইমান কি কন। বেইমানের পাহাড় এরা।

: তো সোম্‌ঝে দিতে হোবে।

: আমি এই গ্রামের প্রধান। আমি হলাম গিয়া চোর। তো এডা তোমার বাপের জমিদারি নাকি? আমার ছ্যাশে আমি চুরি করি, তুমি শালা কেডা কওয়ার? এই যে, কথা কও না ক্যা?

: মনে মনে ফন্দি করতিছে—লালঝাণ্ডা দিয়ে প্যাদাবি আমাগরে। ফোঁড়ন দেয় অনাদি।

: তোর লালঝাণ্ডার গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কাই। জ্যোতি বসু কি পান্তাভাত খায়রে ব্যাটা সাধুপুরুষ? অ্যাহ্‌? কমুনিস্টগরে তো মাটির ঘরে থাকার কথা, রাজপ্রাসাদে থাকে ক্যা? গেরান্‌ হোটেলে ফস্টি নস্টি করে ক্যা? য্যাতো দোষ এই আমাগবে তিন রঙের? হারু মণ্ডলের মুখে বিস্নিধানের খই ফুটতে

থাকে চচ্চড় শব্দে। বলতে বলতে গদির নিচ থেকে কাজীর সামনে একটা সাদা স্ট্যাম্প বাড়িয়ে ধরে—এই যে, এই যে মিঞাসাহেব, তোমার বাপ-ঠাকুরদার ঋণ, তোমারও। এইখানে সই করো।

অনাদি কলম এগিয়ে দেয়—এই যো, এই ডানদিক ঘেঁষে।

হারিকেনের আলোয় হলদেটে দেখায় সাদা ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পটা। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। সাত টাকা।

না। আর মুখোশ নেই। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি ক'রে সাজানো ষড়যন্ত্র। স্ট্যাম্পটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন কাজী। দেখতে দেখতে তার বুকের ভেতরে যৌবনের দুরন্ত জাফর ইমাম জেগে ওঠে। সাহস চাই হে। সাহসে ভর ক'রে উঠে পড়ো। হেই কাজী, পা চালাও। তুমি তো অনেক কিছু দেখা মানুষ। দেখেওছো, ঠেকেওছো, উদ্ধারও হয়েছো। অভিজ্ঞতার আলোয় তোমার শেখার মাত্রা অপরিসীম। আর এই এদের সাত-পুরুষের নাড়ী-নক্ষত্র তোমার জানা। তুমি ওঠো। উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করো। ওরা থমকে যাবে। কাগুজে বাঘেরা যত গর্জে, বর্ষে না তত। হারু মণ্ডলদের সাতপুরুষের ইতিহাস তোমার জানা।

ভাবতে ভাবতে কাজী উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরে এক পাহাড় বিস্ময়।

তিন জোড়া চোখ প্রথমটা থমকে যায়।

সামনে দাঁড়িয়ে নবীন। তেল চকচক করে হাতের লাঠিটা।

অবরোধ।

জোর। জবরদস্তি। হারু মণ্ডল থেকে দিল্লির 'মহীয়সী মসনদ।' অভিন্ন।

কে যেন সমস্ত অস্তিত্ব কাঁপিয়ে বুকের গভীর থেকে চিৎকার করে, এ অবরোধ আমি মানি না। আমি হিন্দু কি মুসলমান সে প্রশ্ন অবান্তর। আমি মানুষ। আমি বাঙালি। জন্মসূত্রে এই মাটি-জল-হাওয়া-ফুল-ফসল-মানুষের সাথে আমার আত্মীয়তা। আমি এই পথ, এই মাঠ, এই আকাশের নিচে আমার শৈশব, আমার কৈশোর, আমার যৌবনের রুদ্ধশ্বাস আবেগের কাল উত্তীর্ণ হয়ে এই বার্ধক্যের বৃত্তে এসে দাঁড়িয়েছি…এ বন্ধন জন্মগত অধিকারের সাথে সাথে তিল তিল ক'রে আয়ত্ত করা, অর্জন করা।

কে কবে সীমানা ভেঙে দিলো, মাটিকে দু'ফাঁক ক'রে তর্জনি বাড়িয়ে বলে দিলো—তুমি মুসলমান, ওই তোমার ভাগ, তুমি হিন্দু, এই তোমার পরিধি, যে যার সীমায় চলে যাও। কোনো প্রশ্ন চলবে না, কোনো আবেগ প্রকাশের

অবকাশ নেই। ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে কথা চলে না।

সাবধান।

প্রতিবাদ নিষিদ্ধ।

আমরা টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা, আমরা আদমজী ইস্পাহানী বাওয়ানী—

আমাদের স্বার্থটাই তোমাদের স্বার্থ।

আমরা দুধ খাবো, ছানা-মাখন-কোর্মা-পোলাও-বিরিয়ানী-চিলি চিকেন-মাটন রেজালা খাবো—

তোমরা খাবি খাও।

যে যার পরিধিতে দাঁড়িয়ে স্বপ্নভঙ্গের তীব্র কষ্টে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাও।

কোনো প্রতিবাদ চলবে না।

জমিন দু'ফাঁক।

কেউ জমিন দিলো না।

স্বপ্ন দু'খণ্ড হয়ে গেলো।

কেউ নতুন স্বপ্নের সামিয়ানা টাঙাতে সাহায্যের হাত বাড়ালো না।

রুটির সন্ধানও পলাতক হয়ে কোথায় অদৃশ্য। কোথায় তার ঠিকানা ?

মানুষ রিফিউজি হলো।

এই শেয়ালদায় হাজার হিন্দু যুবতীর পেটে রুজির মুদ্রা...হিন্দুদেরই লোলুপ রিরংসায় জারজ সৃষ্টি করেছে। বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত।

হা অন্ন, হা মাথা গোঁজার ঠাঁই...

সভ্যতার ইমারতের নিচে ইজ্জৎ বেচেও জোটেনি একখণ্ড রুটি, একমুঠো ভাত, একফালি জমিন।

কি ? কি মিলেছে ?

রিফিউজি সম্বোধন। বুক ভরা বাবু—কলকাতার ঘৃণা। যাও, হট্ যাও। তিলোত্তমা-কল্লোলিনী কলকাতাকে নোংরা আবর্জনায় পরিণত করা চলবে না। চলো সুন্দরবন। বিধান রায়ের গুলি খাও। দুর্ভিক্ষ খাও। যাও দণ্ড-কারণ্যে। আহা সেতো রামেরই বনবাসভূমি। বড় পবিত্র। স্বর্গতুল্য স্থান। যাও। আমলাদের ধর্ষণের তীক্ষ্ণ রমণে গর্ভবতী হও। ডুবে মরো শিশু বোঝাই নৌকোয় ভরা নদীর অতল গহ্বরে। নোনা জলে মরণ বড় ভালো!

শৈশব।

শৈশবরে।

ধব্‌ধবে সাদা চুলে আর্তনাদে কাঁপা হাতের ছোঁয়ায় কাজী জাফর ইমাম

থরথর ক'রে কাঁপেন। শরীরে, মনে, বুকের পাঁজরে পাঁজরে সে কাঁপন।

এই তিমিরপুরের আকাশ আমার।

এই মাটি, এই মানুষ আমার হে। আমার।

বাপ দাদাদের কথা, পথের পাঁচালি না। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হীরের মতো উজ্জ্বল। নীল আকাশের স্বপ্নে রঙিন।

নতুন ফসলের গন্ধে পৌষালি প্রেমের আহ্বান।

গোয়ালের গরু দুধ দিয়ে চলে বারোমাস। খানা-খন্দে খল্‌বলানো ঝিকি-মিকি রুপোলি মাছের খেলা। বাগানে আম-জাম-কাঁঠালের আমোদ, কত ফল-ফলাদি। অল্প মাত্রার দুঃখের সাথে বহুমাত্রার সুখ, আনন্দ।

হিন্দু মুসলমানে জোর সম্প্রীতি।

বিপদ—

হিন্দুর পাশে মুসলমান। মুসলমানের পাশে হিন্দু। চারণ কবি মুকুন্দ দাস বাংলার নিভৃত কোণে আগুনের মশাল জ্বালিয়ে ফিরছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাজাগরণ। কবি নজরুল সে সময় ভরা সূর্য। কী তার আলো, কী তার ভালবাসা।

চৈত্রের গাজনে, মনসামঙ্গলে, মেলা বসতো এই তিমিরপুরে। উৎসব মুখর ধান-মাটির মনোভূমি। যাত্রা, গম্ভীরা, কবির লড়াই, রামমঙ্গল, বাউল, মুর্শেদী গানে গানে আকাশ-বাতাস-মাটি-মানুষ-বেসামাল। এত আনন্দ কোথায় রাখবে মানুষ।

কামার বলো, কুমোর বলো, তাঁতি—চাষী একাকার হে।

বাছ বিচার কে করে?

সে সময় তখন কার ছিলো?

জাফর ইমাম তার সেই কৈশোরকাল থেকে উৎসবের সক্রিয় কর্মী। হাতে হাতে ম্যারাপ বেঁধেছেন। ঝাড় থেকে কেটে এনেছেন বাঁশ। পাটের দড়ি পাকিয়েছেন চাষী পাড়ায়। চাঁদা তুলেছেন হিন্দু পাড়ায়, মুসলমান পাড়ায়। বারোয়ারীতলায় চলতো তাদের আড্ডা।

চলোহে সকলে। মরসুম শুরু।

কোথায় হে?

বারোয়ারীতলায়। এবার গণেশ অপেরা আসছে।

গ্রীষ্মের ছুটি। ইসকুল নেই। কলেজ বন্ধ। তিমিরপুরে তখন কলেজ ছিলো না। বাইরে যারা পড়াশোনা করতো, এ সময় তারা ফিরে আসতো গ্রামে।

আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের মহাসমারোহে কল্লোলিত। তারপর ঈদ।

ঈদের দিনেও সেই আনন্দ।

যাত্রা হতো না। অনেকটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও, হিন্দু-বন্ধুদের নিয়ে কাজী নিজেই নাটক করতেন। কত প্রশংসার স্মৃতি তিমিরপুরের বারোয়ারীতলায়।

দুঃখ তার একটা না, অনেক। আনন্দ তার একটা না, হাজার।

চারটে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেও কলেজে যাওয়া হলো না। কত স্বপ্ন মনে মনে। কত আকাঙ্ক্ষা সেই যৌবনের প্রথম সোপানমুখী পদবিক্ষেপের। সেই বয়সেই বলতেন, আমি বি. এ টা পাস করেই তিমিরপুরে শিক্ষকতা শুরু করবো। কলেজ করার চেষ্টা করবো। যেন কাউকে ভবিষ্যতে কষ্ট করে অন্যত্র ছুটতে না হয়। কিন্তু সেই শুরুটাতেই এলো নির্মম আঘাত।

সেই আঘাতের পেছনে একটা বাস্তব গল্প আছে। আছে ষড়যন্ত্রের ছড়ানো জাল বিস্তারের নিপাট কৌশল। মনটা সেই শুরুতেই ভেঙেচুরে খান খান। অনেকগুলো দিন মনের ভেতরে উড়াল পাখির তাড়না নিয়ে ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছেন। কাজে মন বসেনি। গল্পে মন বসেনি। লেখাপড়ার প্রতি কোনো আকর্ষণও ছিলো না।

হারু মণ্ডল, তার বাবা ভৈরব মণ্ডল যে ইতরবিশেষ আচরণ করবে, সেতো তার জানা কথা। অথচ ওদেরই পাতা ফাঁদে পা দিলেন তার স্বপ্নপুরুষ পার্বতী ডাক্তার। ফার্স্ট ডিভিশনে চারটে লেটার নিয়ে পাস করার খবর পেয়ে পার্বতী ডাক্তার জড়িয়ে ধরেছিলেন জাফর ইমামকে। সারা মুখে তার খুশির উল্লাস। ঝকঝকে দাঁতে হাসি ছড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—নেইরে জাফু, আর একজনও নেই তোর মতো এই তিমিরপুরে। তুই লেগে থাক লেখাপড়ার পেছনে, তোর হবে, অনেক উপরে উঠতে হবে তোকে। টাকা? আমি দেবো। অনেক আছে আমার। খানিকটা তোর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলের পেছনে লাগালে পুণ্য হবে আমার। ভাববো একটা জ্ঞান বৃক্ষের চারা পুঁতে রেখে গেলাম।

শুনে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসেছিলো জাফর কাজীর। নত হয়ে পা ছুঁয়েছিলেন তিনি পার্বতী ডাক্তারের।

: না, না। পায়ে হাত দিবি কেন? মানুষ কখনো মানুষের পায়ে হাত দেবে কেন? মাথাটা উঁচু করে তুলে রাখবি সবসময়। আর মনটা রাখবি পলিমাটির মতো কোমল। সত্যের পথে থাকলে দেখবি—হিমালয় নামক পর্বতটাই যদি বিপদের প্রতীক হয়ে তোর সামনে এসে দাঁড়ায় তো—তুই অবহেলায় তা অতিক্রম করতে পারবি।

জাফর কাজী বলেছিলেন সবিনয়ে—আশীর্বাদ করবেন।

স্নিগ্ধ হাসি ডাক্তারের চোখে মুখে—আশীর্বাদ দিয়ে কী হয় রে!

: ছোটদের কল্যাণ হয় কাকাবাবু।

: অশ্বডিম্ব হয়। যা না, আমি তোকে পাঁচ হাজারবার আশীর্বাদ দিচ্ছি, কোনো বইয়ের দোকান বিনিপয়সায় তোকে কলেজের বইপত্র দেয় কিনা। ভর্তি হতে পারিস কিনা। পারবিনে। কিন্তু দু'শো টাকা যদি দিই? বলে শব্দ করে নিজের রসিকতায় নিজেই একচোট হেসেছিলেন পার্বতী ডাক্তার।

তখন আঠারো বছরের তরুণ। টগ্‌বগানো রক্তের সেই দুরন্ত সময়কে পরদিন সন্ধেবেলায় ডেকে উঠেছিলো টিয়া নামের এক স্বপ্নের পাখি। পার্বতী ডাক্তারের আম-জাম-লিচুর বাগানে ও সময়ে টিয়ার ডেকে ওঠা অভাবনীয় অথচ রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিলো জাফর-কাজীর কাছে। কিন্তু সেদিন টিয়া যদি ওইভাবে ডেকে না উঠতো তো কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়া তার কেউ আটকাতে পারতো না। কেউ না। কিন্তু আনন্দ যে বিষাদে পরিণত হয়। আনন্দ আর বিষাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হৃৎযন্ত্রের সচল ক্রিয়ার মতোই সত্য।

সেদিন কি অঁাধারের কালো চাদরটা বেশি কালো ছিলো? ডাক্তার কাকার বাগানে অসংখ্য গাছ-গাছালির ছায়াগুলি ছিলো প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো দীর্ঘতর আর জমাট। অথচ সব গাছের পাতাই ছিলো সবুজ। সবুজ যখন ঘন আর জমাট হয়, তখন তার কৃষ্ণরূপ। গা-ছম্ ছম্ স্বভাবে সে হাতছানি দেয় মৃত্যুর।

তো সেই মৃত্যু টিয়ার কণ্ঠে জাফর কাজীর নাম ধরে বেজে উঠেছিলো।

অভাবনীয় সেই আহ্বান।

সেই হাতছানি।

দুরন্ত খুশি উপ্‌চে পড়া মনে সে ছিলো রঙিন স্বপ্নের অবগাহন।

অঁাধারে চাঁদের মুখ বেশি ক'রে উজ্জ্বলতা ছড়ায়।

প্রকৃতি-মৃত্তিকা ভেসে যায় কোমল স্নিগ্ধ আলোর খেলায়। চাঁদ নষ্ট, নাকি নষ্ট চোখে চাঁদকে দেখা?

টিয়ার মুখে চাঁদের বিম্বিত ছায়া। আলোর তো ছায়া পড়ে না, বস্তুর ছায়া হয়। আলো সেই ছায়াকে যেমন ধরে রাখে, তেমনি ভাসিয়েও নিয়ে যায়।

টিয়া ডেকে উঠলো সেই সময়—জাফরদা।

ফুটফুটে মুখ। অঁাধারেও চেনা যায় অবলীলায়। অতল দুটি চোখে প্রজা-

পতির চাঞ্চল্য। পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পা দিয়েছে টিয়া। ডুরে শাড়িটা তার মায়ার শরীর জড়িয়ে কৃষ্ণসন্ধ্যায় খানিকটা আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। নিঃশ্বাসে তার স্বপ্ন স্বপ্ন বুকে নদীর ঢেউ।

লিচু গাছের গুঁড়িতে পিঠ এলিয়ে দাঁড়িয়ে টিয়া আবার ডাকলো—এসো না।

জাফর এগিয়ে গেলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো। মুখোমুখি—সাপ-পোকা-মাকড়ের ভয় নাই?

: না।

: আসলে তাই হয়।

: কি তাই হয়?

: জ্ঞান-কাণ্ড থাকা দরকার টিয়া।

টিয়ার খুব রাগ হয়। অভিমানে ফুলে ওঠে তার ঠোঁট। হাত নেড়ে বলে—তোমার তো এখন অহংকারে মাটিত পা পইড়বে না।

জাফর ধাক্কাটা সামলে জবাব দিলেন—আমার কোনো অহংকার নাই। আর অহংকার করার আছেইডা কি আমার?

: চারটে লেটার পেয়েছো, অহংকার না?

: লেটার পাওয়া দোষের? হাসলেন জাফর—যাও, ঘরে যাও। কাকা বাবু ডিস্‌পেনসারিতে আছেন।

: খালি খালি জ্ঞান ছ্যাও ক্যান্?

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জাফর ইমাম। বললেন: টিয়া, তিমিরপুরের অনেক গুণ, অনেক মহিমা, কিন্তু তার ভিতরেই কদর্য একটা মানুষখেকো চেহারাও লুকায়ে আছে। যে কোনো সময়, যার তার উপরে ঝাঁপায়ে পড়তি পারে।

টিয়া গ্রীবা বাঁকিয়ে জবাব দেয়: আমি কোনো কিছুতি ভয় পাই না। তুমি ভীতু। দুর্বল।

: না। আমি ভীতু, দুর্বল কোনোডাই না।

: তালি?

: তুমার কলঙ্ক হলি, আমার কষ্ট হবে। ডাক্তারকাকু আঘাত পাবেন, সে আমি সৈহ্য করতি পারবো না। দেব্‌তার মতোন মানুষ তিনি।

একটা মৃদু হাওয়া সে সময় গাছ গাছালিতে শিস্ বাজিয়ে যায়। অসংখ্য পাখির নানা ঢঙের ডাকে পার্বতী ডাক্তারের বাগানের নির্জনতাকে বাড়িয়ে দেয়।

আর তখুনি শোনা যায় টিয়ার ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

রাগ তো রাগ। ষোড়শী টিয়ার বুকে তখন কঠিন রাগ। চোখ ফেটে প্রায় উপ্‌ছে আসে কান্না। আঁচলে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকে সে। কিন্তু নিজেকে লুকোতে পারে না কিছুতেই।

দেখে জাফর খুবই বিব্রত বোধ করেন। টিয়াকে কি বলবেন বুঝতে পারেন না। তারই বা কত বয়স। জ্ঞান-বুদ্ধির পরিসরই বা কতখানি। শুধু বুকের ভেতরে এ সময় টিয়ার জন্যে কষ্ট অনুভব করেন। সেই কষ্ট নামক অনুভূতিটাই তাকে মনে করিয়ে দেয়, টিয়া কেন মাঝে মাঝেই এমন ক'রে ডাকে। অভিমান করে। তার চোখে পড়ে টিয়ার হাতে একটা ধব্‌ধবে সাদা রুমাল। আঁধারেও চেনা যায় ওটা উপহার। চিনতে পেরেই তিনি শিহরিত হন। টিয়ার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজের ভেতরে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন।

: টিয়া।

টিয়া সাড়া দেয় না।

পাখিরা ডানা ঝাপ্‌টা দেয়।

একটা হুতোম ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে চুপ ক'রে যায়।

শুকনো পাতায় হঠাৎ পায়ের শব্দ।

চমকে ওঠেন জাফর। চকিতে ফিরে তাকান শব্দ লক্ষ্য ক'রে। কাউকে দেখা যায় না। হয়তো কোনো বেজি-শজারু-বা শুঁই সাপ বাগান দিয়ে খালের দিকে হেঁটে গেলো।

: উপহার দিতি চাও তো? দাও।

না। না।

টিয়া কাঁদে। জাফর হাত পাতেন। প্রসারিত হাতে শকুন্তলার সামনে যেন রাজা দুষ্মন্ত। সেইরকম। ছবিতে যেমন দেখায় কণ্ব মুনির আশ্রমে।

অবিশ্রান্তভাবে মাথার ওপরে, চারপাশে পাখির ডাক। কতো যে পাখি প্রকৃতির। কতো যে তার শিস্‌, ধ্বনি। গুঞ্জন। ছট্‌ফট্‌ পাখার শব্দ। যারা শোনে নি, তারা জানে না। শুনলেও কি জানা যায়? জানার জন্যে মন চাই। সেই মনটাই বা ক'জনের আছে? পার্বতী ডাক্তারের বাগানে পাখিদের এই অভয়ারণ্যের কথা তো ওদের কেউ বলে দেয়নি। ওরা জেনেছে নিজেদের সত্তা দিয়ে। পাখিদের সত্তা নেই?

: টিয়া। আমি মুসলমান। হারু মণ্ডলগরে কাছে নরকের কীট। সেই নরকের কীটকে তুমি উপহার দিতি চাও ক্যা?

: তুমি নরকের কীটও না। মানুষও না। তুমি পাষাণ।

*এতক্ষণে কথা বলে টিয়া। তার কান্নার বেগ শান্ত হলেও অভিমানের আবেগ যে বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয়নি, তা বোঝা যায়।*

জাফর হাসেন তার তারুণ্যে অমোঘ ভালবাসা ছড়িয়ে—আমি কি—কও তো!

টিয়া ফুঁসে ওঠে—ভীতু কোথাকার।

বাড়িয়ে রাখা হাতটা মেলে রেখেই জাফর বলেন—উপহারডা দাও।

: কিসের উপহার?

: ভালবাসার!

: তুমি না···। লজ্জায় ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে টিয়ার কালো হরিণচোখ।

: কি?

: নির্বোধ তুমি। অন্ধ তুমি জাফরদা।

: হয়তো তাই।

: হারু মণ্ডলরা কি ভগবান? তুমি ভয় পাও ক্যান্?

: সমাজপতিগরে ভয় না পায়ে টিকে থাকতি পারে ক'জন?

: ধুস্। খালি বড় বড় কথা। ও সব আমি বুঝিনে।

: টিয়া, আমিও তো মানুষ। মানুষের মধ্যি যে সকল দোষ-গুণ অনুভূতি থাকে, আমার মধ্যিও তাই আছে। কিন্তু, জাফর না হলি—জাফরের জ্বালা বোঝা যায় না টিয়া। কেউ বাইরে থেকে তা বুঝতি পারে না। বোঝানো ও যায় না। জানি, তুমি কি বলতি চাও। জাইনে-শুইনেও অন্ধ-বোবা হয়া থাকি। তা ছাড়া তো কিছু করার নাই। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আঠারো বছরের জাফর ইমাম।—টিয়া, আমারই বা বয়স কত। তবু তো ভাবতি হয়, মানুষ আগে, না হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নডা আগে?

ঝিঁঝিঁর ঝিল্লি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

জাফর ব্যস্তভাবে বলেন, রুমালডা দাও। রাত হতিছে।

টিয়া স্বপ্নের মতো হাত বাড়ায়।

রাতজাগা হৃদয়ের কথায় সাদা কাপড়ে নকশা-'আমায় ভুলো না!' নিচে একটা সরু ডালে দুটি পাতা। মাঝে ফুল। গোলাপ।

দু'জনের হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে।

বিশ্বপ্রকৃতি সে সময় তুমুল আলোড়নে কেঁপে ওঠে।

আর্তনাদ ক'রে ওঠেন জাফর—আহ্। আহ্।

তীব্র যন্ত্রণা মাথার পেছনে।

কে যেন শক্ত হাতের থাবায় তার ঘাড়ের চুল উপ্‌ড়ে নিচ্ছে। ঝটিতি ফিরে দাঁড়ান জাফর। মট্ মট্ ক'রে চুল ছিঁড়ে যায় কারো হাতের মুঠোয়।

: কে? কে?

সামনে দাঁড়িয়ে তিমিরপুরের দানব ভরু মণ্ডল তার থাবা মেলে চেপে ধরেছে ঘাড়ের পাশে জামার কলার।

: নাগর কানাই রাধিকের খোঁজে কদম্ব বনে—অ্যাঁ?

টিয়া ছুটে পালিয়ে যায় ত্রাসে। আর জাফরের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম।

'আমায় ভুলো না' রুমালটা পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নেয় ভৈরব মণ্ডল। তিমিরপুরের অলিখিত ভাগ্যবিধাতা। হাজারো গুম খুনের নায়ক। বিশাল জোতদারীর অধীশ্বর ভৈরব মণ্ডলের একমাত্র ছেলে হারু মণ্ডলের বয়স তখন সতেরো আঠারো। জামার কলার ধরে জাফরকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন পার্বতী ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারির দিকে। তার গায়ের জোর—গণ্ডারের মতো। টেনে নিয়ে যেতে যেতে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয়—শালা, তোরে আইজ কইতোরের মতো ছেঁড়বো চল্। হারামজাদা, হিন্দুর মেয়ের সাথে কেষ্টলীলে নির্জন এই আমবাগানে। চল্—, পার্বতী ডাক্তার কিছু না কলি না কবে। আমি ছেইড়ে দিচ্ছিনে। ডাকপো তোর বাপ-চাচাগরেও। আসুক তারা। হয় তোবা থাকপি তিমিরপুরে, না হয় আমরা থাকপো।

বলির পশুর মতো কাঁপছিলেন জাফর। লজ্জায়-ঘৃণায় তিনি কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন। আর হৃদয়ের ভেতরে বলে চলেছিলেন, হে পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও। হে আকাশ তুমি খান খান হয়ে ভেঙে পড়ো। অগণন বজ্রপাতে ধ্বংস ক'রে দাও উন্মত্ত হয়ে ওঠা পশুত্বকে।

তখন ঘরভর্তি রোগী। চৌকাঠে দাঁড়ানো ভরু মণ্ডল। পেছনে জাফর। ভরু মণ্ডল গলাখাকারি দিতেই পার্বতী ডাক্তার চোখ তোলেন।—মণ্ডলবাবু যে।

: একবার বাইরে আসতি হয়।

: কেন? বাইরে কেন?

: দরকার আছে।

পার্বতী ডাক্তার অবাক হলেন। একবার ভরু মণ্ডলকে, আরেকবার পাশে দাঁড়ানো নতমুখ জাফরকে দেখে তাড়াতাড়ি রোগী ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

'আমায় ভুলো না' রুমালটা ডাক্তারের চোখের সামনে তুলে ধরলো ভরু মণ্ডল। তারপর ফিসফিস্ করে বললো—এডা আপনের মেয়ের রুমাল।

: তাতে কি হয়েছে।

: আমবাগানে—অন্ধকারের মদ্যি জাফর আর টিয়া .. আমি না দেখলি কি হৈতো ভগবান জানে।

শুনে গম্ভীর হলেন পার্বতী ডাক্তার : মাথার ঠিক নাই আপনার মণ্ডল।

: আমার মাথার ঠিক নাই ? বলতে বলতে বিষধর সাপ হয়ে যায় ভরু মণ্ডল—ডাক্তারবাবু, ওই আমবাগানের অন্ধকারে নিজির হাতে পাকড়াও করিছি জাফর আর আপনের টিয়ারে। এই রুমাল তার বড় প্রমাণ। মাথা খারাপ আমার ?

: আস্তে কথা কন।

: আস্তেই কতিছি। হাজার হলিউ আমাগরেই তো ঘরের মেয়ে। আমি নিজির কানে শুনছি, টিয়ারে পালানির জন্যি ফুঁসলাতিছিলো হারামজাদা।

হঠাৎ ক'রে কি যেন হয়ে গেলো। পালটে গেলেন পার্বতী ডাক্তার।

: এই কথা ?

: ভগবানের কিড়ে। মাকালীর দিব্যি খাতিছি ডাক্তারবাবু। আর হ্যাঁ, এ যদি আমার নিজির বাড়ির ঘটনা হৈতো তো অ্যাতোক্ষণে আমি এই হারামজাদারে খতম কইরে দিতাম। কি ভাইবছে এরা ?

পার্বতী ডাক্তার গর্জে ওঠেন চাপা স্বরে—জাফর !

জাফর নীরব। নত মুখ তার মাটির সাথে মিশে যেতে চায়। কাঁপতে থাকেন থর থর ক'রে। আর আত্মদহনের তীব্র জ্বালায় মনে হয়, এত বড় ভুল তিনি কেন করলেন। পার্বতী ডাক্তার তো এখন কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না তার কথা। কোনো অজুহাতও শুনবেন না। ভরু মণ্ডলকে যিনি সর্বাঙ্গে চেনেন, সেই তার কথায় তিনি একবার যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, তখন সত্যি কথা তার কানে ঢুকবে না।

ভরু মণ্ডল ফোঁসফোঁসানি তুলে আবার ফোস্কা ছড়ানো কথা বলে। রুমালটা তার হাতে ফাঁসির রজ্জুর মতোই দুলতে থাকে—আপনে তো তিমিরপুরের দেবতা সাইজ্জা খালাস। জাতি-ধর্মের ধার ধারেন না। কিন্তু আমরা তো সমাজ সংসার নিয়া চলি। জাতি-ধর্ম মানতি হয়। সমাজ-সংসার মানতি হয়। যদি এই কথা পাঁচকানে যায়তো দিতি পাইরবেন মেয়ের বিয়ে ? লোকে ছিঃ ছিঃ কইরবে শুইনলে।

: জাফর ! তুই আমার বিশ্বাসের ঘরে আগুন দিলি শেষ পর্যন্ত ?

না। না কাকাবাবু না। আমি কোনো অন্যায় করি নাই। ভরু মণ্ডল মিথ্যেবাদী। এই বলে চিৎকার করতে চেয়েছিলেন জাফর। কিন্তু পারেন নি। সেই জোর তার ছিলো না। চোখ ফেটে জল এসেছিলো। সেই জলে ভেসে গিয়েছিলো প্রতিবাদের জোর। রুদ্ধ অভিমানে তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন।

: তুই আমার কাছে আর কোনোদিন আসিসনে। তারপর খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে বলেছিলেন পার্বতী ডাক্তার—যা। আমার আর কিছু বলার নাই।

বলে তিনি ডিসপেনসারিতে ঢুকে গিয়েছিলেন। ভরু মণ্ডল কিন্তু খুশি হতে পারেনি এই বিচারে। সে চেয়েছিলো জাফরের চূড়ান্ত নিগ্রহ।

ভালবাসার ঘরে আগুন লাগলে তার যে কী মর্মন্তুদ জ্বালা, কি মর্মবেদনা, কি কষ্টবোধ, সে প্রকাশের অযোগ্য। সেই কঠিন যাতনায় বিবেকদংশিত জাফর ইমাম হৃদয়ের ভেতরে তোলপাড় হতে হতে বারোয়ারীতলার নির্জন ঘাসে এসে শুয়ে পড়েছিলেন। আর ততক্ষণে শব্দ ক'রে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি।

না। না। টিয়ার ওপরে আমার কোনো দুর্বলতা নেই। আমি টিয়াকে মুসলমান বানাবো কেন? তাকে তিমিরপুর থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা কেন বলবো? টিয়াকে তো আমি ডাকি নি? আমার মন আমার, টিয়ার মন টিয়ার। কারো মনের কথা আমি কেমন ক'রে বুঝবো? কাকাবাবু। আপনি আমাকে মেরে ফেলতেন। আমি মরে গিয়ে বেঁচে যেতাম। কিন্তু এ-আপনি কি করলেন? আপনার ভালবাসার, স্নেহের ছায়াতলে আমাকে বেড়ে ওঠার, গড়ে ওঠার, সৎ হওয়ার যে জগৎ তৈরি করেছিলেন, আজ এক নিমেষে, একটা মিথ্যেবাদী-লম্পটের কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তা বেনোজলে ভাসিয়ে দিলেন কেন? আমি তো সেই ন্যাংটোকাল থেকে আপনার কাছে আসি।

তখন তো কেবল চোদ্দ বছর বয়স আমার।

সেই অসাধ্য কাজটা আমি কেন করেছিলাম? তিমিরপুরের হাজার মানুষ তো চারদিকে দাঁড়িয়ে হল্লা করছিলো। টিপ্ টিপ্ বিষ্টির সন্ধ্যা। আপনার মেয়ে টিয়া কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলো কুয়োয়। বাড়ির মেয়েদের প্রথম চিৎকার-চেঁচামেচি। আমি তখন ডিস্পেনসারিতে বসে খবরকাগজ পড়ছিলাম। হল্লা শুনে সকলের সাথে অন্দরমহলে গিয়ে শুনলাম—হায়-হায়-টিয়া কুয়ার মধ্যি পা হড়্কে পড়ে গিছে…।

আমার মাথাটা ঠিক ছিলো তখন।

টর্চের আলো কুয়োর নিচে পৌঁছুলো না। আপনি পাগলের মতো দিশেহারা

হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কেউ বললো মই আনো। কেউ বললো—মোটা দড়ি আনো। কেউ বললো—লম্বা বাঁশ হলে ভাল হবে। কিন্তু কেউ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছিলো না।

আমি কিছুই বলিনি।

কুয়োর দুই পাশে হাত দিয়ে ঝপ্ ক'রে লাফিয়ে গহ্বরে পিঠ দিয়ে চোখের পলকে তরতরিয়ে নেমে গেলাম। নামতে নামতে শুনতে পাচ্ছিলাম, মইরবে জাফরডা মইরে যাবে। অর পাখা গজাইছে।

ঘুটঘুটে অাঁধার। শ্যাওলাপড়া কুয়োর পাতগুলো খুবই পিচ্ছিল। পা ফস্কে যায়। হাত বসানো যায় না। বিষ্টিতে ভিজে আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মের দাপটে কুয়োর জল অনেক নিচে নেমে গেছে। আমি নামতে নামতে আমার অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, টিয়াকে যেন জীবিত অবস্থায় পাই।

পেলাম। নাগালের মধ্যে টিয়াকে পেলাম। থর থর ক'রে কাঁপছিলো। দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ ক'রে শব্দ হচ্ছিলো। আমার বুকের ভেতরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। ডাক দিলাম—টিয়া, ভয় নাই, আমি তোমারে বাঁচাবো।

টিয়ার পাখির মতো হাল্কা দুটি ডানা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলো সবেগে।

আমি বললাম, এই—আমার হাঁটুতে বইসো। কোনো ভয় নাই।

টিয়া কাঁদতে লাগলো—জাফরদা, আমি বাঁচপো না গো আর। বাঁচপো না।

: বাঁচপে, বাঁচপে। শক্ত কইরে আমার গলা ধইরে থাকো, সোজা উপরে উইঠে যাবো তুমারে নিয়ে।

: পাইরবে না।

: পারবো। খুব পারবো। তুমি তো পাখির মতো হাল্কা।

ওপরে হল্লা। একটা দড়িও নামলো না। একটা বাঁশও না। মইও না। শুধু চিৎকার। শুধুই অহেতুক চেঁচামেচি। কারো কথা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিলো না। আমার শরীরে কিশোর বয়সের তাজা জোর। জেদ। টিয়া যত হাল্কা-পাতলাই হোক, শ্যাওলা-পড়া ভেজা কুয়োর পাত বেয়ে উঠতে আমার মেরুদণ্ডের হাড় কট্‌কট্ ক'রে উঠছিলো। কপালে ঘাম। শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছিলো। মনে হচ্ছিলো যে কোনো মুহূর্তে টিয়াকে নিয়ে অন্ধকার গহ্বরে পড়ে যাবো আমি। এত জোরে টিয়া আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলো যে, আমার নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলাম আমি। একসময় মনে হলো, আমি পড়ে যাচ্ছি।

পা-টা হড়কে গিয়েছিলো হঠাৎ। টিয়া আর্তনাদ করে উঠলো ভয়ে—জাফরদা!

আমি বহু কষ্টে বলতে পারলাম—ভয় নাই টিয়া।

টিয়া আরো জোরে আকড়ে ধরলো আমাকে।

অবশেষে প্রায় ওপরে পৌছে যাওয়ার সময় একটা বালতি নেমে এলো। সেই বালতিতে টিয়াকে উঠিয়ে আমি টেনে তুলতে লাগলাম, ওপর থেকেও টান ছিলো দড়িতে—।

আর ওপরে উঠেই টিয়া অজ্ঞান হয়ে গেলো।

আমার মনে আছে ডাক্তারকাকু, আপনি মেয়ের কাছে না গিয়ে আমাকে দুই হাতে নিজের বিশাল বুকের ভেতরে জাপটে ধরেছিলেন এসে। কেঁদে ফেলেছিলেন আপনি।

এত ভালবাসা আমি আর কখনো পাইনি। আমিও বীরত্বের স্বীকৃতি পেয়ে দু'চোখের জলধারাকে সামলাতে পারিনি। অদৃষ্টপূর্ব সেই দৃশ্য। সেই অনুভূতি।

সেই থেকে আমি আপনার পুত্রের মতো আপনার স্নেহ ভালবাসায় আরো বেশি ক'রে জড়িয়ে গেলাম।

একটু একটু ক'রে টিয়ার মনেও আবেগের ছোঁয়া লাগে। অতল-গহ্বরের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার বোধ তাকে আমার দিকে স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট করেছিলো। আমি তা বুঝতেও পারতাম। কিন্তু, সমাজের কঠিন অনু-শাসনের কথা আমি আমার শৈশবেই জেনে নিয়েছিলাম। তাই নিজেকে কখনো এগিয়ে নিয়ে যাইনি। দূরে দূরে থেকেছি টিয়ার হাতছানি থেকে। জানতাম, টিয়া দুঃখ পাচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছে। অভিমান করছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি?

ভৈরব মণ্ডল আমার বাবার, আমার দাদার সাথে চিরদিনের শত্রুতা তৈরি করেছিলো। আমাদের জমি-জমা এক এক পর এক দখল ক'রে নিয়েছে। মিথ্যে মোকদ্দমা ফেঁদে জেল খাটিয়েছে। বৃটিশ আমল থেকেই এই প্রক্রিয়ায় ভৈরব মণ্ডলরা তিমিরপুরের সিংহভাগ জমি তাদের দখলে নিয়ে গেছে।

খুন হয়েছে সেইসব হতভাগ্য। যারা নিজেদের অধিকারের ওপরে বলদর্পি ভৈরব মণ্ডলের থাবাকে ফিরিয়ে দিতে লাঠি হাতে নিয়েছিলো।

লাশ পড়ে থাকতো খানা-খন্দে।

মুণ্ডহীন কবন্ধ।

বিভৎস। অমানুষিক।

আইন-প্রশাসন? সেতো ভৈরব মণ্ডলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তুড়ি।

আমার বাবার মুখে শোনা, বাবার বুক ভরা হাহাকার, জ্বালা যন্ত্রণার সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আমাকে শিশুকাল থেকেই জ্ঞানবৃদ্ধে পরিণত করেছিলো। শুনতে শুনতে আমার মনে হতো, কেন? কেন?

কেন হিন্দু? কেন মুসলমান?

কেন হানাহানি? ঘৃণা? হিংসা?

মাথার ওপরে একটাই আকাশ, পায়ের নিচে একটাই মাটি।

হিন্দু যেখানে দাঁড়িয়ে, মুসলমানও সেখানে দাঁড়িয়ে। একই নদীর জলধারায় হিন্দু-মুসলমান।

তবে?

তবে'র উত্তর আজও মেলেনি তার। তবে'র পরে তবে জমতে জমতে—'তবে'র পাহাড় হয়েছে। তবুও তবে'র জট খোলেনি।

তো সেদিনও তবে'র বোঝা মাথায় নিয়ে বাবাকে বলেছিলেন জাফর—কলেজে আর যাওয়া হবে না।

বাবা বলেছিলেন—ডাক্তারবাবু টাকা দিতি চায়ছিলো যে?

: থাকগে। কি হবে। আমারই পড়তি ভাল লাগে না। সংসারের তো এই হাল।

একটা চাকরি-বাকরি জুটায়ে নেই।

বাবার ভুরু কুচ্‌কে যায়। চোখে সন্দেহ—না-না। এ মতলব ভাল না। তুই কলেজে ভর্ত্তি হগে জাফু। আমি ষ্যাম্‌নে পারি—ট্যাকার যোগাড় করবানে।

: চাষার ছেলের ব্যারিস্টার হয়া কি হবি? এই ভাল।

: চাষার ছেলে মানুষ না? মুকুন্দ দাসের গান শুইনেছিস না? ধৈন্য ভ্যাশের চাষা, যাদের চরণধূলি পড়লে মাথায়, প্রাণ হয়ে যায় খাসা?

: জানি। যে কথা গানের ভাষায় কওয়া যায়, বাস্তবে তার উল্টা হয় বাজান। ওসব আমাগরে মানায় না। তাছাড়া মুকুন্দ দাস কয়জনই বা আছে ভ্যাশে? কয়জন চাষার চরণধূলা নিয়া গান বাঁধে?

: তোর অতো ভাল মাথা। জেবনডা বৃথা হয়া গেলো।

: ভাল মাথার দাম নাই। ভাল কথার মূল্য নাই। ভাল ঘর আর ঘরের সিন্দুক ভরা ট্যাকা থাকলি—খারাপ মাথারও লাখ ট্যাকা দাম বাজান।

: বুঝি। সবই বুঝি। তো মন মানে না। বুকটা ফাইটে যায় দুঃখে।

: দুঃখ পায়ো না। বাস্তবডা স্বীকার করলি দৈহে হয় দুঃখ-কষ্ট।

: সবই তো ছিলোরে। ভরুবাবুর রাক্ষুসে থাবায় ব্যাবাককিছু লোপাট হয়া গ্যালো। মানুষের ক্ষিদের তো শ্যাষ নাই। মিছেমিছি মোকদ্দমা, নালিশ, আমরা চাষাভূষো, আইন বুঝিনে, আদালত বুঝিনে। ফাঁকি দিয়ে নেগ্যালো যথাসর্বস্ব।

: গেছে-যাইক।

: হক্কের জিনিস। মেহনত করা জমি জিরেত। আশা আছিলো-তুই ল্যাহা-পড়া শিখে আবার সব উদ্ধার করবি।

বাবার দীর্ঘশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি জাফর। পালিয়ে গিয়েছিলেন বুকের ভেতরে হাহাকার করা যন্ত্রণা নিয়ে। কি করবেন তিনি। কি করার আছে তাব। এ সমাজে অনেকবাবাই বুকের ভেতরে দুঃখ,যন্ত্রণা নিয়ে ধুকে ধুকে নিঃশেষ হয়ে যায়। হোক। ঐশ্বর্যহীন মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা ছাড়া আর কি থাকবে? অধিকারের প্রশ্ন?

মাথা নেড়েছিলেন নিজেই।

মাথা নাড়তে নাড়তেই দেশভাগ।

দাঙ্গা।

ঝড়ের পরে ঝড়।

গঙ্গা-যমুনায়-পদ্মা মেঘনায় বয়ে গেলো লক্ষ মানুষের বাস্তুহারা জীবনের সুতীব্র কান্না।

কেউ ফিরে তাকায় না কারো দিকে।

পরের বছর বাবা মারা গেলেন। মরার সময় ছেলের হাত ধরে বলে গেলেন—আমরা এই মাটিতে পয়দা, তারে ফেলে রেখে কোনো অচিন ঠাঁশে যাস্‌নি কখনো? সুখ-দুঃখ নে এইখানে থাকিস বাপ।

কাঁদছিলেন জাফর। বাবা বললেন—একদিন ভরু মণ্ডলগরে বিচের হবি।

আজ এখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেই কথা মনে পড়ে। সামনে নন্ জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প। ভরু মণ্ডলের জায়গায়-হারু মণ্ডল।

শেষ সম্বল লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্রের গোলটেবিল বৈঠক বসেছে।

হারানচন্দ্র মণ্ডল, দীপক সান্যাল, রঙ্গলাল দাগা, অনাদি খাসকেলরা আজকের দণ্ডমুণ্ডের পারিষদবর্গ...

দরোজায় লাঠিধারী নবীনের পাহারা।

তিনি আসামী।

খুনীরা, লম্পটরা, মানবতার ঘৃণ্য দুশমনরা বিচারক।

আসামী একজন সংখ্যালঘু।

অপরাধ? মুসলমান।

ভৈরব মণ্ডলের ধমক আজ হারান মণ্ডলের গলায়।—কি, সই কইরবেন না?

মণ্ডলের চোখে চোখে তাকালেন জাফর—কেন?

: হুকুম।

: কিসের হুকুম?

: পাওনাদারের।

: মণ্ডল! রক্ত চান, দিতি পারি, সই দেব না।

চিৎকার করে ওঠে হারু মণ্ডল—সই করো।

: না।

: সই করো।

: পুবের সূর্য-পশ্চিমে উঠলিউ না।

: বেজন্মা! হারু মণ্ডলের অশ্লীল চেহারা বেরিয়ে আসে তার কদর্য কণ্ঠস্বরে।

জাফর কাজীর আপাদমস্তকে তখন দাউ দাউ আগুন। তিনি তবুও শান্ত কণ্ঠে বলেন—মণ্ডল, জন্ম—তুলে কথা বলা পাপ, অন্যায়।

: যা-যা—তোগো আবার জাত কিরে? শুইনা মুসলমান।

: আমি জাত-পাত মানি না। আমি মানুষ। মানুষ আপনেরাও। অন্তত চেহারায় সেই চিহ্ন। অথচ আচরণে পশুত্বের প্রকাশ কেন?

: কি? হারু মণ্ডল পশু? দীপক সান্যাল গর্জে ওঠে।

: তার মানে জানোয়ার? অনাদি খাসকেল করাঘাত করে কপালে।

: হারুবাবু কুত্তা হয়? রঙ্গলাল দাগার চোখে আগুনের গোল্লা।

যেন প্রলয়কাণ্ড, মহামারী ঘটে যাবে তিমিরপুরে।

বজ্রপাতের পরে নৈঃশব্দ্য যেন। হারু মণ্ডল চুপ। যেন এ ঘরে; কিংবা চারপাশে কোনো জনপ্রাণী নেই। নিস্তব্ধ নিঝুম জীবনের স্পন্দন।

অথবা বজ্র নির্ঘোষের কাল আসন্ন। সেই নির্ঘোষে জাফর কাজীর দেহটা মুণ্ডহীন কবন্ধে পরিণত হবে। এখুনি হয়তো নবীনের হাতের লাঠিটা বিপুল বিক্রমে আছড়ে পড়বে তার মাথায়। বড় সাহস হে তোমার বুড়ো। বড় বাড় বেড়েছে তোমার।

চোখে চোখে উদ্গত হিংস্রতার লকলকে আগুন। সেই আগুনে হিংস্রতাকে সদর্পে উপেক্ষা করলেন জাফর কাজী—শুভ রাত্রি।

একটা ঝড় যেভাবে উথাল-পাথাল বেগে ছুটে চলে যায়, ঠিক তার বিপরীত, শান্ত-সংযত ভঙ্গিমায় হেঁটে চলে গেলেন জাফর কাজী।

নবীন একবার হুকুমের প্রত্যাশায় হুজুরদের দিকে তাকিয়েছিলো। ততক্ষণে তার লাঠিটা আল্‌গোছে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন কাজী জাফর ইমাম।

সারা ঘরে সম্মোহন। এক সময় সেই সম্মোহনের কুয়াশা কাটিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে হারু মণ্ডল—নবীন।

সঙ্গে সঙ্গে দীপক সান্যালের গর্জন—ধর ওকে।

অনাদি খাসকেল জামার আস্তিন গুটায়। রঙ্গলাল দাগা বলে—যেৎনা ঝাঁপয়া লাগে হামি দিবে। পাকড়ো……।

কে কাকে পাকড়ায়?

খাঁচার পাখি হাওয়া। নবীন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হারু মণ্ডলের লাথি খেয়ে। মুখ থুবড়ে পড়ায় তার নাক দিয়ে রক্ত গড়ায়। সেও চেঁচায়—। চেঁচিয়ে বলে—আমি কি করমু? ওরে বাবাগো। আমি কি করমু? আপনেরা জজ—ব্যারিস্টর, হুকুম দিলেন না ক্যা?

: চোপ শুয়ার কি বাচ্চা,

: আমার কুনো দুষ নাই বাবাগো। হুকুম নাই, আমি কি করমু।

ঠিক। নবীনের কি দোষ। সে হুকুমের দাস। হুকুম না পেলে কি করার আছে তার। তবে কার দোষ?

দোষ হারু মণ্ডলের। তিমিরপুরের আইনগত প্রধান পুরোহিত সে। হুকুম দেবার অধিকার একমাত্র তারই। জজ, ব্যারিস্টার, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট—সবকিছুই হারু মণ্ডল। রাখা না রাখা, থাকা না থাকার মালিক। ঈশ্বর।

এ সময় ছন্দ পতন ঘটিয়ে উঠে দাঁড়ায় দীপক সান্যাল। আর তর্জনি তুলে হারু মণ্ডলকেই অপরাধী বানিয়ে বলে, তোমার চালাকি এডা। ইচ্ছে কইরে জাফর কাজীরে ছাইড়ে দিলে।

: না আমার কোনো অপরাধ নাই। হারু মণ্ডল অসহায়ের মতো বলে—তুমরাওতো ছিলে, ধরতি পাল্লে না?

ভয় পেয়ে অনাদি খাসকেল পালায়। পালায় শামুকের খোলে। পালিয়ে তার বীরত্ব বাঁচায়। সে জানে এখানে এখন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হবে। দীপক সান্যাল খিস্তি শুরু করবে। হারু মণ্ডল মাথার চুল ছিঁড়বে অসহায়ের

মতো। হয়তো তারই ওপরে অপমানের ঝাল তুলবে। অতএব পলায়ন সব দিক থেকে শ্রেয় তার পক্ষে। সে পাশ কাটিয়ে সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে যায়।

রঙ্গলাল দাগাও তাকে অনুসরণ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে উন্মত্ত দীপক সান্যাল ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পটা একটানে ছিঁড়ে ফেলে।—তুই, তুই আমার ইজ্জৎ ডুবালি হারু। তুই পশু হ'লি, আমিও হলেম। এ অপমানের শোধ যদি না নিতি পারি তো আমার নামে আমিই কুত্তা পুষমু কয়ে গেলাম। বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় সান্যাল।

আর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে হারু মণ্ডল।

তার বুকের ভেতরে এক হাজার শঙ্খচূড়ের দংশনের জ্বালা।

পরদিনই সেই দংশনের জ্বালা তিমিরপুরের হাওয়ায় গরম গরল ছড়ায়।

পশু।

জানোয়ার।

সে কুকুরও হতে পারে। শুয়োরের বাচ্চাও হতে পারে।

হারু মণ্ডল আমাগরে দেব্‌তা। সে কুকুর হতি পারে?

কেডা, কেডা কয়ছে একথা?

কার এতবড় বুকির পাটা? কোন্ ঘাটের জল খায় সে?

হারু মণ্ডলের সমর্থকেরা বাজার গরম করে। চায়ের দোকানে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। অনাদি খাসকেল চেঁচায়। চেঁচিয়ে লোক জমায়—একজন সংখ্যালঘুর সাহস ভাখো। পঞ্চায়েত প্রধান হারু মণ্ডল হৈছে বেজন্মা। এই যে ছাত্র শোনো, হারু মণ্ডল কিডা? হারু মণ্ডল আমাগরে মাথা। সেই মাথা যদি বেজন্মা হয়, তালি আমরা যারা তার হাত-পা, তারা কি? কও দেখি, আমরা কি হই?

বেজন্মা!

বেজন্মা মানে কি?

জারজ।

জারজ মানে কি?

বাপের ঠিক নাই।

এই যে—মহাজন, খালি বাপ্‌ সাডাই বুইঝলে জীবনভর। হিন্দুরা হৈলো বেজন্মা।

শুয়্যারের বাচ্চা।

কার ঘাড়ে কয়ডা মাথা আছে হে ?

ভিড় জমে। জটলা বাড়ে। সূর্য যত মাথার ওপরে ওঠে, ভিড়ও বেড়ে ওঠে। ছড়িয়ে যায় হু হু ক'রে।

মণ্ডল কনে ?

আমাগরে দেব্‌তা ?

তিমিরপুরের মা-বাপ আমাগরে।

বাঁচপিনে। বাঁচপিনে মণ্ডল। জানো তো, সে এখন চৌপহর মা কালা করালিনীর নাম জপ করে। মণ্ডল বেজন্মা হলি—আমাগরে মা কালীও বেজন্মা। এই অপমান কিছুতেই সৈহ্য করতি পারবি না মণ্ডল। কয়ছে, তুমরা তিমির-পুরের মানুষরা যদি বিচার না করো তো সে মা কালীর সামনে বইসে বইসে অনশন করতি করতি দেহত্যাগ করবি।

আহারে। আগে যাই করুক। মণ্ডল এখন কালীভক্ত মহাসাধক। কালী ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই। অন্য ভাবনা নেই। সারাদিন রাত্রি যখনই যাও শুনবে—কালী বলো, কালী কহো, কালী করো সার, কালী বিনে ভোলা ও মন, ক্যাম্‌নে হবি ভবনদী পার ? একমনে গাইছে হারু মণ্ডল।

মহামান্যি হারু মণ্ডল। মানির মানহানি শিরোচ্ছেদতুল্য।

অন্য পক্ষ অন্য কথা বলে—মিছে কথা। জাফর কাজীরে আমরা চিনি : তার মতো ভদ্র, শান্ত, নম্র আর সৎ মানুষ তিমিরপুরে না শুধু, পৃথিবীতেই কম আছে। তার মুখে খিস্তি, কেডা শুনিছে কবে ? হারু মণ্ডল হতিছে হাড়ে-হারামজাদা। ভণ্ড। হাজার গরিবের রক্ত চুষে জমির পাহাড় বানাইছে। মুখে কালী কালী, আড়ালে তার সুদখোরী, ঘুষখোরী, রিলিফ আত্মসাতের তেজারতি। আমরা সব জানি গো। যা পাতিছে লুঠে নিতিছে।

আর কালীভক্তের দুই দুইডে বউ থাকে ক্যা ?

ছোট বউ তো রূপের বিবি, পটের দেবী। ঝম্‌ঝম্ করে গা-গতরে সোনার গয়না। দুই চোখে তার বোম্বাই ফিলিমের নায়িকার মতো কাজল। ঠোঁটে রং। কেডা কবে তিমিরপুরের বউ-বিটির ঠোঁটে রং দেখিছে ? কি দেমাক গো। পায়ে ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে হেলে-দুলে চলে। মাটিতে তার পা পড়ে না।

দীপক সান্যালের আড্ডা কিসির মণ্ডলের অন্দরমহলে ? রাত-বিরোত নাই। সান্যাল আছে তো আছেই। পটের বিবির সাথে তার ঢলাঢলির খবর আমরা বুঝি জানিনে ?

এই, এই, আস্তে।

চুপ। চুপ করো হে।

সমিরুদ্দি আয়ছে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। মতলব কি আছ—কে জানে।

সমিরুদ্দিকে ভয় পায় না কে? গতরখানা সোঁদরবনের বুনোহাতি যে! মণ্ডল তারে দুই হাতে দেয়। খাস মানুষ সে হারু মণ্ডলের। মণ্ডল যদি কয়, পুকুরের জল শক্ত, সমিরুদ্দিও তাই কয়। মণ্ডল যদি কয় মানুষ মাথার উপর পা তুলে হাঁটে, সমিরুদ্দিও তাই কবুল করে।

মুসলমান সমাজে সমিরুদ্দির নাম মীরজাফর। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে কেউ সে কথা উচ্চারণ করতে সাহস পায় না। আড়ালে ঘৃণা করে। কারো অনুষ্ঠানেও ডাক পড়ে না সমিরুদ্দির। এমনকি জানাজাতেও সে অনুপস্থিত।

এখন তিমিরপুর বাজারের গরম হাওয়ায় দুটি পক্ষ।

জাফর কাজীর সমর্থকরা ক্রমশ দলে ভারী হয়ে ওঠে। সেখানে ছাত্রর সংখ্যা বেশি। চাষীর সংখ্যাও। কেবল দোকানীরা, যাদের স্থায়ী কারবার তিমিরপুর বাজারে, তারা সবাই হারু মণ্ডলের পক্ষে। হারু মণ্ডল তাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য। দীপক সান্যাল বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি। তার গদিতে বেসুমার আলোচনা।

অনাদি খাসকেলও চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সান্যালের গদিতে গুটি গুটি এসে হাজির হয়। আগে থেকেই সেখানে আলোচনা চলছিলো। দীপক সান্যাল উত্তেজিত হয়ে থানার মেজো দারোগার সঙ্গে কথা বলছিলো। অনাদিকে দেখামাত্র সে মেজো দারোগার উদ্দেশ্যে বললো—এই তো, অনাদিও হাজির ছিলো। কি হে অনাদি, হিন্দুরা বেজন্মা—এই কথা কয় নাই জাফর কাজী?

অনাদি সবেগে মাথা দুলিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঘুষি মেরে বলে—আলবৎ কয়ছে। পারলি মণ্ডলদারে জুতোপেটা কইরতো। এইটুকু বলতেই সে হাঁপিয়ে গেলো—মেজোবাবু, যদি কাজীর সে উগ্র মূর্তি দেইখতেন—নবীনের তল প্যাটে যে লাথি মারিছিলো, সারা রাইত বেচারা ঘুমাতি পারে নি।

মেজোবাবু বললেন—নবীনের পেটে লাথি মেরেছিলো মিঃ সান্যাল?

দীপক সান্যাল থতমত খেয়ে বলে—ও হ্যাঁ, বইলতে ভুলে গেছি, ভাবেন দেখি, কি ডেঞ্জারাস লোক।

মেজোবাবুকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দেয় সান্যাল। তারপর অনাদিকে চোখের ইশারা করে কিছু একটা বলতে। অনাদি ইশারা পেয়ে নিজেকে খুব দামী মনে করে। এবং বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে সেও একটা সিগারেট জালায়। ভুরু

দুটো হারু মণ্ডলের মতো নাচিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—কি করা যায় কন মেজোবাবু। আপনি আমাগরে আপন মানুষ।

মেজোবাবুর মুখে লাজুক লাজুক হাসি—ডায়েরি করুন। তারপর আমি দেখবো কি করা যায়। গলা নামিয়ে একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদুস্বরে বলেন—জাফর কাজীর জনপ্রিয়তা আছে। হঠাৎ তার বিরুদ্ধে বড় কিছু স্টেপ নিতে গেলে প্রব্লেম হতে পারে। একটু একটু ক'রে গ্রাউণ্ড তৈরি করতে হবে। তারপর সময়মতো টান মেরে ফেলে দিতে হবে। এ ছাড়া—কাজীর ছেলে লালঝাণ্ডা করে। ওদের দলেরও কাজীর পেছনে সমর্থন আছে।

দীপক সান্যাল একটু দমে যায়। তার মুখে নিরাশার ছায়া—তাহলে?

হাসেন মেজোবাবু—ঘাবড়াবার কি আছে।

দীপক সান্যালও তার মনের ভাব চেপে রাখে না—ও একটা দুষ্টগ্রহ। তিমিরপুরে আমাগরে কাজ-কর্মের খুবই অসুবিধা মেজোবাবু।

: জানি। তবুও গ্রাউণ্ড ছাড়া কিছু করা যাবে না। একটু ধৈর্য ধরুন।

ঃ ঠিক আছে।

তো ক্রমশ গরম হাওয়াটা প্যাচাতে প্যাচাতে জিলিপি হয়ে যায়। এক পর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকরা হাতাহাতিতে মেতে ওঠে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। হুড়মার।

খবর পৌছয় সুদীপ-সৈকত-মদন কাজীদের ডেরায়। ওরা ছুটে আসে তিমিরপুর বাজারে। চারদিকে সেসময় তীব্র হট্টগোল, চিৎকার—চেঁচামেচি।

দুদ্দাড় দোকান-পাট বন্ধ হতে শুরু হয়ে যায়।

ধুলো ওড়ে পায়ের আঘাতে।

সেই সময় কানাই চা অলার দোকান থেকে সুদীপ একটা উঁচু টুল নিয়ে আসে। সৈকত তাতে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করে। তার চারপাশে পনেরো কুড়িজন ছাত্র। সমবেত কণ্ঠে ওরা শ্লোগান দেয় লোক জমায়েতের জন্যে। এতক্ষণ এদিক-ওদিকে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো তারাও এগিয়ে এলো। দেখতে দেখতে মুহূর্তে একটি বৃত্ত হয়ে গেলো সৈকতকে ঘিরে। বৃত্তের চোখে উত্তেজনা আর কৌতূহল।

সৈকতের কণ্ঠস্বর আগুনের গোল্লা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—বন্ধুগণ, তেরঙার লোকেরা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। চাইছে কেন? ওদের পায়ের তলা থেকে ক্রমাগত মাটি সরে যাচ্ছে। মাটি যত সরে যাচ্ছে, তত ওরা মরিয়া হয়ে উঠছে গোলমাল পাকাতে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়,

যেদিন জনগণের হাতে গণধিকৃকৃত এই সমাজবিরোধীরা সমূলে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। ইতিহাসের রায়—অনাচারকে ইতিহাস ক্ষমা করে না। কেন, দেশ ভাগের পরে আবার নতুন ক'রে প্রশ্ন ওঠে কেন এই হিন্দু—মুসলমানের? কে হিন্দু? মুসলমানই বা কে? বন্ধুগণ, এ আবেগের কথা না, ভোটে জেতার কৌশলও না। এ হলো শোষিত পৃথিবীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের প্রশ্ন। কিভাবে—পৃথিবীব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র-তাদের অত্যাচারের ছবিকে ধোঁয়ায় ঢেকে দেয়ার জন্যে বারবার সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্ম দেয়।

হিন্দুর রক্ত লাল বলে কি মুসলমানের রক্ত কখনো কালো হয়?

এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে? করবেন জনগণ। শোষিত-নিপীড়িত, যুগ যুগান্ত লাঞ্ছিত মজুর-মুটে-কৃষক-তাঁতি-কামার-কুমোর। যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন। যারা ইতিহাসের চালিকাশক্তি।

জেনে রাখুন, হিন্দু-মুসলমানে কোনো বিরোধকে আমরা এদেশে আর মাথা তুলতে দেবো না। সঠিক বিপ্লবী সমাজার্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা এই মানবেতর কৌশলকে সমাজের গভীর থেকে উৎপাটিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনারা দিল্লীর বর্তমান-রাজা-রানী-উজির-নাজিরদের কীর্তিকলাপ জানেন। কিভাবে তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে ভাবুন তো, হিন্দু বলে কি কোনো হিন্দু ব্যবসায়ী আপনাকে সস্তায় তার জিনিস বিক্রি করে? করে না।

আপনি অনাহারে থাকলে বা বেকার হলে-টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা-ডালমিয়ারা কি আপনাকে খাবার দেয় বা ডেকে নিয়ে চাকরিতে ঢোকায়?

না।

কখনোই না।

আর ওদের অত্যাচার-জুলুমের বিরুদ্ধে আপনি হিন্দু হয়েও যদি প্রতিবাদের মিছিলে সামিল হন, বা আইন অমান্য করেন—তো আপনাকে হিন্দু পুলিসরা ক্ষমা করেন কি?

বলুন, করেন কি ক্ষমা?

করেন না।

তাহলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ কোথায়?

বিরোধ নেই। বিরোধ তৈরি করা হয়;

কারা তা করে?

ওই দিল্লী যেমন, এই তিমিরপুরের হারু মণ্ডলরাও তেমনি।

কাল রাতে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কাজী জাফর ইমামকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। হারু মণ্ডলরা একটা ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে জোর ক'রে কাজী সাহেবের স্বাক্ষর আদায় করার চেষ্টা চালায়। কি উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর আদায়ের চেষ্টা? কাজী সাহেবের শেষ সম্বল ওই বাস্তুভিটেটাও কেড়ে নেওয়া। তাঁকে ভিটে ছাড়া করা। কিন্তু খুবই আশার কথা—নেপথ্যে পুলিস প্রশাসনের মদত থাকলেও হারু মণ্ডলের ফাঁদ ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন কাজী সাহেব। আর তার পরেই হারু মণ্ডলরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে উঠেছে। অপপ্রচার চালাচ্ছে—'হিন্দুরা বেজন্মা' কাজী সাহেব এই কথা বলেছেন। নবীনের তলপেটে লাথি মেরেছেন।

বন্ধুগণ, আপনারা কাজী সাহেবকে প্রত্যেকেই চেনেন। কোনোদিন কেউ তার মুখে কোনো ইতর ভাষা শুনেছেন?

অসম্ভব।

কাজী সাহেব আমাদের আদর্শ। তিনি কখনো এমন ইতর প্রাণীর ভাষায় কথা বলতে পারেন না। আমরা বিশ্বাস করি না। আপনারা বিশ্বাস করেন কি?

না।

না।

মিছে কথা।

ডাহা মিছে।

হারু মণ্ডলরে আমরা চিনি।

বদমাইস।

ভণ্ড।

প্রতারক।

চিৎকার ক'রে ওঠে সৈকত—আমি সতর্ক ক'রে দিতে চাই—পঞ্চায়েতের সেই দুষ্ট গ্রহদের, যারা এখানে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণা ছড়িয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে চায়। এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার যে কোনো প্রয়াসকে আমরা আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে ভেঙে চুরমার ক'রে দেবো।

ভাইসব,

আমরা অশান্তি চাই না। কিন্তু অশান্তি যদি সৃষ্টি করা হয়, আমরাও কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো না। এই কথা যেন ভণ্ডতপস্বীরা ভুলে না যায়

স্তব্ধ হয়ে যায় তিমিরপুর বাজার।

সেই স্তব্ধতার পরেই দোকান-পাট খুলতে শুরু করে।

কিন্তু চাপা উত্তেজনা গুমরে গুমরে এগিয়ে যায় সংঘাতের পথে।

সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় সেইদিনই অনাদি খাসকেলের ভাতের থালায়।

ভাতের থালায় দাঙ্গা বেধে যায়।

সৈকতের এটো হাত। সামনে ভাতের থালা।

সেই সময় অনাদি খাসকেলের ক্রুদ্ধ আস্ফালন শুরু হয়। মাঝখানে দিশেহারা হয়ে বৃদ্ধা মা এসে দাঁড়িয়ে পড়েন।

: জিজ্ঞাস করো ওই কমুনিস্টটাকে, আমার ঘাড়ে রোজ রোজ চেপে নিল্লজ্যের মতো যে ভাত ধ্বংস করে, হেইডা কার দয়ার দান? উত্তর দিতি কও, হারু মণ্ডল চাকরি না দিলি কমুনিস্টগিরি ফলাতি পাইরতো ওই হারামজাদা অকাল কুষ্মাণ্ড? যারে দিয়া চক্ষুদান, তারে করিস অপমান?

সৈকত প্রথমে চুপ ক'রে ছিলো। ভেবেছিলো চুপচাপ খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ধসে যায় তার। সেও জবাব দেয়—ইসকুলডা কার? তোমার হারু মণ্ডলের তালুক?

: একশোবার।

: বাজে কথা। ইসকুল সরকারের। জনগণের।

: জনগণ ফলাসনে। কেডারে জনগণ? চোর-বাটপারের দল।

: গালাগালি কৈরবে না।

: তুই আমার ভাত খাবিনে।

: খাবো না। এই রেখে দিচ্ছি।

: রাখ। তোর ভাত আমি কুকুর দে খাওয়াবো। তৌ তোর মতোন নিমকহারাম উগ্রপন্থীরে খাতি দেবো না।

: তুমি সীমা ছাড়ায়ে যাত্তিছো।

: চোপ! চোখ রাঙাবি না কলাম।

: চোখ রাঙালি গাঁয়ে থাকতি পারবা না।

: কি? কি কলি তুই?

চিৎকার করতে থাকে অনাদি খাসকেল। তার সর্বশরীরে উন্মত্ত ক্রোধ কাঁপতে থাকে। জামার আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে আসে সে সৈকতের দিকে। বৃদ্ধা মা ঝাঁপিয়ে পড়েন অনাদির ওপর—ওরে ও অনু, অনাদি, ভাই ভাই এসব

কি হতিছে তোগোরে? দোহাই তোর, ভগবানের দোহাই, শান্ত হ, থাম।

: হট্ যাও। হট্ যাও।

মাকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে ফেটে পড়ে অনাদি—তুই আমারে মারতি চালি? আয়, মার দেহি, মার।……

: এই তো জানো। নাটক করোগে বারোয়ারীতলায়।

: শুয়ারের বাচ্চা।

: বাহ্। চমৎকার। বিদ্রূপে ঝল্‌সে ওঠে সৈকত—তোমার নাম অনাদি খাসকেল, তোমার বাবার নাম শুয়োর খাসকেল। বাহ্। বদমাইস হারু মণ্ডলের উপযুক্ত শিষ্য তুমি। যাও—যাও পা চাটোগে মণ্ডলের। প্রমোশন হবেনে।

মা কাঁদতে শুরু করেন।—ওরে, এ কি সর্বনাশের কথারে। ওরে ও সৈকত, চুপ কর বাবা। লোকে শুনলি কি কবেনে? ওরে ও অনু, মাটির দিক তাকা। মাটির দিক তাকায়ে থাক।

: তুমি ঘ্যানর ঘ্যানর কইরবে না কতিছি। আস্ফালন করে অনাদি—আমি আইজই একটা হেস্ত-নেস্ত করতি চাই।

মা বলেন—ও বাবা, তুই বড়। তুই-ই থাম বাবা। ও-বাবা, জল কাটলি কহনো দুই ভাগ হয় না। ভাই ভাই বিবাদ হলি মিটে যায়। ঝগড়া থামা বাবারা।

: তুই এ বাড়িতে ঢুকবিনে আর।

: ভাল কথা।

: ভাল কথাতো বারায়া যা।

: হারু মণ্ডলরা তাই জানে। এ আর নতুন কি।

: হারু মণ্ডলের মুত্ খাগে যা হারামজাদা কমুনিস্টরা।

সৈকত লাফ দিয়ে খামচে ধরে অনাদির জামার কলার। আর বাঁ হাতেই প্যাকাটির মতো হাল্‌কা শরীরটাকে উঁচু ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে—কও আর একবার কমুনিস্টের নাম। কও কত ক্ষমতা তোমার।

শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে শুরু করে অনাদি—খুন, খুন কৈরে ফেললো গো—। বাঁচাও, বাঁচাও।

প্রবল ঘৃণায় ঝুপ্ ক'রে প্যাকাটি শরীরটাকে নামিয়ে দেয় সৈকত। আর তখুনি হঠাৎ দুই হাতে সৈকতের গলা টিপে ধরে অনাদি—শুয়ারের বাচ্চা।

মা চেঁচান—ওরে কিডা কনে আছো গো, খুন হয়া গ্যালো গো…।

অনাদি সেই মুহূর্তে সৈকতকে ছেড়ে মাঁকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়—শালী মাগি, তোরেই খুন করমু আজ।

মা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। অনাদির বউ ছুটে এসে স্বামীকে জাপটে ধরে—ওগো, খুনেডা তোমারে মাইরে ফেলাবে গো·· উরা আক্কারে খায়-আর গজারে খাটায় ত্যাল। হারামজাদাগবে মরণ হয় না ক্যা ··। কলেরা বসন্ত অগো চোখি দেহে না ক্যা ?

একসময় আপনা আপনিই মা'র জ্ঞান ফিরে আসে। সৈকতের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে। রাগে ঘৃণায় সে একটা হাতেই বেরিয়ে আসে রাস্তায়। সরকারী কলে হাত মুখ ধুয়ে, একপেট জল খেয়ে···সোজা চলে যায় বারোয়ারীতলায়। সেখানে বুড়ো বটগাছের নিচে গিয়ে বসে। একটু পরেই খবর পেয়ে ছুটে আসে সুদীপরা পনেরো ষোলজন। সৈকতের গলার কাছে অনাদির নখে অনেকটা জায়গা ছড়ে গিয়েছিলো। ছিল্ ছিল্ ক'রে রক্ত বেরুচ্ছিলো।

অন্যপক্ষে হারু মণ্ডল স্বয়ং। সঙ্গে সমিরুদ্দি, নবীন। মুহূর্তে তিমিরপুরের গুমোট হাওয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অনাদি হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে। চেঁচায় অনাদির বউ বুড়ো শাশুড়িকে দেখিয়ে—ওই ভাতারখাগি বুড়ির আস্কারা পায়া সৈকতের অ্যাতো ত্যাল। গ্যাহেন আপনেরা, নিজির দাদারে গলাটিপে আছাড় মাইরে মারতি নিছিলো খুনেডা। হাতে-চাকু, ছোরা। কিডা জানে পকেটে বন্দুক ছেলো কি না। আপনেরা অ্যার বিচার করেন গো। না হোলি উরা আমাগরে কবে খুন কইরে ফেলাবে।

হারু মণ্ডল অনাদির কাঁচা বউ'র শরীর দেখে, ঠোঁট, বুক, কোমর, নিতম্ব দেখতে দেখতে খুব রাগ দেখায়—কে খুন করবে বউ? হারু মণ্ডল কি তিমিরপুরে নাই ?

: আছেন যদি তো—উরা অ্যাতো অত্যিচার করতি সাহস পায় ক্যা ?

হারু মণ্ডল অনাদির বউ সাবিত্রীর বুকের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। বুক তো না, যেন উইয়ের ঢিবি। যৌবনের হাওয়া পুঁইলতার কচি ডগার মতো ঢল ঢল করে। সে চোখ না ফিরিয়েই অনাদিকে বলে—মেয়ে-ছেলের মতো কাঁদো ক্যা ?

সাবিত্রীও জ্বলে ওঠে—মেয়েছেলেরও হদ্দ। কাঁদতিছে। যাও না ক্যা, মণ্ডলবাবুর সাথে, খুনেডারে হজ্জিমৎ দিয়া আইসো।

অনাদি কথা বলে না। কথা বলে হারু মণ্ডল—ঠিক কথা। সাবিত্রী ঠিক কথা কয়ছে। ওঠো খাসকেল, চলো আইজ-ই এর ব্যবস্থা করতি হবে।

ীরা সকালে তিমিরপুর বাজারে আমার বিরুদ্ধি মিটিঙ করিছে। তারপর সাবিত্রীর চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ে মণ্ডল—সৈকতের হাতে চাকু ছেলো ?

: হু।

মা সবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালেন—কিডা কয়, কিডা কয়গো অ্যামন সব্বনাশে কথা ? কিডা দে'খিছে চাকু-ছোরা ?

সাবিত্রী বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখ ঝামটা মেরে চতুরঙ্গ কণ্ঠে বলে—আমি, আমি দেখ্‌ছিলো, আমি নিজির চোখি দেখিছি। তুই বুড়ি—সতিপনা দেখাইস না আর।

: মিছা কথাগো। ভগোবান সবে না।

: সবেলো মাগি, সবে। ভগবান তোর কেনা ?

হারু মণ্ডল তাকিয়ে তাকিয়ে মজা দেখে সাবিত্রীর কাঁচা শরীরের। ঝগড়াটাও যেন রমণীয়। মাথার ভেতরে, বুকের ভেতরে কি রকম একটা আন্দোলন টের পায় হারু মণ্ডল। অনাদি এই বউ নিয়ে কি করে কে জানে। ওইতো প্যাকাটির মতো দেহখানা। আহা, মেয়েটার না জানি কত কষ্ট। এ দিকটা তার এতদিন খেয়ালই ছিলো না। নিজের ঘরে তো শান্তি নেই। ছোট বউটার সাথে সান্যালের অত মেলামেশা···। অথচ কোনো উপায় নেই তার। সান্যালের কাছে তার হাত পা বাঁধা। ছুটতে পারবে না এ জন্মে।

সাবিত্রীর চোখে যেন আগুনের ঝিলিক্। কিসের একটা প্রশ্রয়ের আভাস। নাকি হাতছানির ইশারা ? সেই ইশারায় সাড়া দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সাবিত্রীকে দেখতে দেখতে হারু মণ্ডল বলে—

: সাবিত্রী মিছে কথা কবে না জানি। ভাল বংশের মেয়ে ও। চলো খাসকেল ওঠো।

: ও বাবা মণ্ডল, ভগোবানের দোহাই তোমারে। বউ মিছে কথা কয়ছে।

এতক্ষণে অনাদি গর্জে ওঠে—অ্যাই বুড়ি, পাছায় লাথি মাইরে বাইর কইরে দেবো কতিছি। ওহ্, আমারে জালায়ে পুড়ায়ে খাক্ কইরে দিলো হারামজাদি।

সাবিত্রী মণ্ডলের চোখে চোখে তাকিয়ে হাসে—চা করি ?

: না—না। পরে একদিন খাবো।

মা বিড় বিড় ক'রে বলেন—বাইর-ই কইরে দে। লাথি-ঝাঁটার বাকি থাইকলো কি আর। বলতে বলতে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠেন তিনি।—আমারও হাড়ে কালি। ইচ্ছে করে গাড়ির নিচি মাথা দেইগে, না হোলি জলে ডুবে মরিগে।

ঠোঁট বোঁকয়ে অদ্ভুৎ ভাঙ্গ ক'রে মণ্ডলের দিকে তাকায় সাবিত্রী—মরণ!

হারু মণ্ডল উপভোগ করে। অনাদির বউকে দেখে। দেখে দেখে তার আশ মেটে না। তিন বছরের বিয়ে। ছেলে-পুলে হয়নি। হবে কি। অনাদির তো ওই প্যাকাটি দেহ। বউভাতে এসে হারু মণ্ডল চম্‌কে উঠেছিলো। কি মুখ। কি গড়ন। কেষ্টনগরের মূর্তি। বুকখানা যেন পাহাড়। চোখ টিপে সাবিত্রীকে প্রশ্রয় দেয় হারু মণ্ডল—মরণই তো:

অনাদি তখন ঘরে। ছেঁড়া জামাটা পালটাতে গিয়েছিলো। বুড়ি মা কপালে করাঘাত করছিলো দাওয়ার অদূরে ধুলায় বসে।

সাবিত্রী হাসে ঠোঁট ফুলিয়ে—ঘরে চলেন।

: থানায় যাবো যে?

: পান খায়ে যান।

: পান দিবা? চলো। যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হয় মণ্ডল।

ওরা ঘরে যায়। বুড়ি মা দাপায়। কাটা কইমাছের মতো ছট্‌ফট্‌ করে।—ভগোবান, ও ভগোবান, তুমি কনে গো···। তুমার বিচার নাই গো···।

মণ্ডল হাসে।

সাবিত্রীও চোখের তারা নাচিয়ে হাসে। হারু মণ্ডলকে পান দিতে গিয়ে হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে। আর মণ্ডল হাতের স্পর্শটাকে দীর্ঘ করার জন্যে পান নিতে গিয়ে চেয়ে থাকে সাবিত্রীর মুখের দিকে। সেই হাসির ঢেউ সাবিত্রীর বুকে, ঠোঁটে। হঠাৎ নাক কুঁচ্‌কে মিষ্টি একটা মুদ্রায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে সে বলে—আপনি কিন্তু ভরসা। মণ্ডল আচম্‌কা বাঁ হাতে সাবিত্রীর নাকটা টিপে দিয়ে বলে—কোনো ভয় নাই।

: পান নেন।

: হ্যাঁ।

: সৈকত যেন এ বাড়ির সীমানায় ঢুকতি না পারে।

: সে ব্যবস্থা হবেনে। অতো ভাবো ক্যা?

: মাঝে মাঝে তো আসতি হয়। আসেন না যে?

: এবার আসপো।

মণ্ডলের এই সময় মনে হলো, অনাদির খুব দেরি হচ্ছে। দেরির তো কোনো কারণ নেই। ইচ্ছে ক'রে করছে না তো? তখনো সে পান নেয়নি। সাবিত্রী হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিঃশ্বাসের ঢেউয়ে দুলছে তার বুক। শব্দ। শব্দ শুনতে পায় সে। শুনতে শুনতে তার ইচ্ছে করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নদীর

জলে। জলের ভেতরে সাঁতার। সবুজ শ্যাওলার বনে—অতল জলে ঝিকিমিকি মাছ। মাছেদের খেলা। খেলতে খেলতে মরণ হলেও আনন্দ।

হারু মণ্ডল স্বপ্ন দেখতে থাকে।

সাবিত্রী কি হেসে ওঠে? অস্পষ্ট উচ্ছ্বাস।—পান নেন।

এবার চমক ভেঙে মণ্ডল বলে—পান? নিলি তো তুমি পালায়ে যাবে।

: এ কথা কন্ কি জন্যি?

সাবিত্রীর মুখ লাল। রক্ত ফেটে পড়ে। মণ্ডলের কথায় তার বুক কাঁপে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে ওঠে। সে স্পষ্ট দেখতে পায়…একটু একটু ক'রে সুখের রুপোলী মাছ ঝাঁক বেঁধে সাঁতরে আসছে কূলের দিকে। আসছে…।

: সাবিত্রী, জগজ্জননী কালী করালিনী শ্যামা মায়ের নাম কইরবে।

: মরণ আমার।

: সে মরণে কয়জন মরতি পারে গো? মা—মাগো। কপালে করস্পর্শে আবেগে দুলে ওঠে হারু মণ্ডল।

: পানডা খাবেন তো?

: পান? দ্যাও। হুস থাকে না গো মেয়ে? শ্যামা মায়ের চরণ যখন মনে পড়ে গো—।

: খান।

: হু। পান খেতে থাকে হারুমণ্ডল।

: কার জন্যি অ্যাতো করেন? কিডা খাবি এত সম্পত্তি!

মণ্ডলের সেই সময় ইচ্ছে হলো একটা হ্যাচ্‌কা টানে সাবিত্রীর উথাল পাথাল বুকটাকে নিজের বুকে নিয়ে চেপে ধরে—আদরে সোহাগে বলে—তুমার জন্যি করি গো…।

কুয়োতলা থেকে অনাদির গলা শোনা গেলো।—মণ্ডলদা, আর দুইমিনিট।

হারু মণ্ডল পান খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়ে একটু বেপরোয়াভাবেই সাবিত্রীর মাথায় হাত রাখে। যেন মহাপুরুষের আশীর্বাদ নিবেদন। তারপর হাতটা মাথা থেকে নামাতে গিয়ে বুক ছুঁয়ে নিজের কাছে ফিরে আসে।—কম্যুনিস্টরা আমার জগজ্জননী শ্যামা মার শত্রু গো। আমারও শত্রু। তিমিরপুরের মাটি থিকে ওদের আমি নিশ্চিহ্ন কইরে তবে শান্তির নিঃশ্বাস ফ্যালাবো।

সাবিত্রী মাথা নেড়ে, ঠোঁটের ফাঁকে নথ কামড়ে নিঃশব্দ হাসি ছড়ায়। বুক ছোঁয়ার কাঁপনেও তার ভাবান্তর নেই। হারু মণ্ডল বুঝে যায় যা বোঝার।

অনাদি বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ডাকে—মণ্ডলদা।

: চলো, চলো। মা-শ্যামা-তুমি সব জানো গো মা।

এইভাবে ওরা চলে যায় ষড়যন্ত্রের নগ্না সড়কে পা ফেলে।

বুড়ি মা এবার সুর ক'রে কেঁদে ওঠেন। কাঁদতে কাঁদতে ইনিয়ে বিনিয়ে কি বলেন—বোঝা যায় না। জীবনের ফেলে আসা হাজারো স্মৃতির ছবি তার কান্নার সুরে সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে। দুপুরের খরতাপও তাতে হয়ে ওঠে বিষণ্ণ। ছাতিম গাছে একটা ঘুঘু পাখি। তার ডাক শোনা যায়। ওক্‌কুরো—কোকো—ওক্‌কুরো—কোকো।

সাবিত্রী তার বুকের ভেতরে একঝাঁক উল্লাসের তরঙ্গভঙ্গ নিয়ে চৌকাঠে এসে দাঁড়ায়। বুড়ির কান্নাধ্বনি তার সেই উল্লাসকে এক ধরনের বিকৃত আনন্দে ঠেলে নিয়ে যায়।

খুব ইচ্ছে করে—বুড়িকে দুঃখ দিতে। আঘাত করতে। আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী ক'রে দিতে। বুড়ি তখন কাঁদতে কাঁদতে, বিলাপ করতে করতে মাটিতে আঁক কেটে চলেছেন। সাবিত্রী খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে যেন—ও বুড়ি, বুড়িলো তোর বিপ্লবী পুতের ইবার মাথাটা থাকপিনে। কাটা মুণ্ডুটা কোলে নে কাঁদিসলো বুড়ি।

বুড়ি স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যান হঠাৎ ঘোলাটে ধূসর দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন তার পুত্রবধূর দিকে। হয়তো ভাবতে চেষ্টা করেন, মেয়ে-মানুষের মুখে এমন সর্বনাশা কথা কখনো বেরোয়? ভাবতে ভাবতে অঝোরে কাঁদতে থাকেন নিঃশব্দে। তা দেখে সাবিত্রী ঠোট উল্টে কদর্য ভঙ্গি ক'রে বলে—সাধের দেওর আমার, তিন কাল গে এককালে ঠেকা বুড়ি মা-ডার বুক ফাটি যাতিছে গো। উরা তুমার কাটা মুণ্ডু দে ফুটবল খেলাবেনে। আহা রে, কি দুঃখের কথা।

বুড়ি চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান। তার সারা শরীরে ভয়ের শিহর। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। চোখের সামনে রাশি রাশি সরষের ফুল ভেসে বেড়ায়। তাদের তাণ্ডব নাচন ধেই ধেই নেচে নেচে খেলে। বুকের ভেতরে এক দুর্দমনীয় অভিমানে তিনি আবারও ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

সাবিত্রী নির্লজ্জের মুখোশ পরে মুখে—পুলিসগরেও কই, তুমরা আমার গরীব দরদী দেওরডারে গিরেফতার কৈরবে ক্যা? ধইরে নে বেত দে পিটায়ে পিঠের ছাল তুইলবে ক্যা? দেওর আমার দয়ার অবতার গো। তারে তুমরা পেরধানমন্ত্রী বানাওগে।

বুড়ি জ্ঞান হারিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েন।

হু হু ক'রে গরম হাওয়া ছুটে যায় গাছপালা কাঁপিয়ে।

সাবিত্রীর কদর্য মুখোশটা এবার দানব হয়ে ছুটে যায় কুয়োতলায়। সেখান থেকে বালতি ভরা জল এনে উন্মত্ত হিংস্রতায় বুড়ির সারা শরীরে ঢেলে দেয় বালতির জল। আর হা হা ক'রে হাসতে হাসতে বলে—মর, মর, রাক্ষসী-ডাইনী।

শ্মশান কালীর নৃত্য যেন তিমিরপুরের সমস্ত সুষমাকে দলিত মথিত ক'রে মহাগ্রাসের পতাকা তুলে ধরে আকাশে।

সেই মহাগ্রাস রাত দুপুরে কাজীপাড়ায় কড়া নাড়ে জাফর কাজীর দরোজায়।

ঠক্ ঠক্।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ঠক্ ঠক্।

নিশুতি রাত্রির নৈঃশব্দ্য ছাপিয়ে বহুদূর থেকে ভেসে আসে এক ঝাঁক শেয়ালের কোরাশ। রাত-জাগা পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে যায় গাছপালা কাঁপিয়ে।

: কেডা?

: থানা।

: কে?

: পুলিস।

: কি দরকার?

: দরোজা খুলুন।

দরোজা খুলে বেরিয়ে আসেন জাফর কাজী। থানার মেজো দারোগার হাতে রিভলবার। তিনি ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেন। সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেন জাফর কাজী—ঘরে ঢোকেন যে?

: আমাদের সঙ্গে সার্চওয়ারেণ্ট আছে।

: থাকলেই বা। আমার স্ত্রী ঘুমায়ে আছে। এখন যাতি পারবেন না।

মেজো দারোগা গর্জে ওঠেন—এই ঘরে নকশাল নেতা সৈকত খাসকেল পালিয়ে আছে। ওকে বের ক'রে দিন।

জাফর কাজী কিরকম দুর্বল হয়ে যান। মুহূর্তের জন্যে থমকেও গিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেকে তিনি সামলে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত পেছনের দরোজা দিয়ে ওরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মেজোদারোগাকে আটকে রাখতে হবে। যেভাবেই হোক।

উঠোনে একঝাঁক বন্দুকধারী পুলিস।

ওরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মেজোবাবু হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন—গির্জ্জা সিং। অন্দর ঘুচো।

: না। সবেগে দরোজা আগলে দাঁড়ালেন জাফর কাজী।

: কাজী সাহেব, সাবধান। আপনি পুলিসের কর্তব্যকাজে বাধা দিচ্ছেন।

: ভোর না হওয়া পৈর্যন্ত আপনারা ঢুকতি পারবেন না ঘরে।

: কাজী সাহেব।

কাজীও চিৎকার করেন সঙ্গে সঙ্গে—তার মানে কী? গর্জন কিসির জন্যি। ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত দুপুরে যদি তাণ্ডব করেন তো কিছু উল্টা-পাল্টা হলি আপনারা দায়ী থাকবেন। জীবনে সহ্য করতি করতি আমারও আর ধৈর্য নাই।

: লেকচার শুনতে আসিনি। দরকার হলে আপনাকে অ্যারেষ্ট করা হবে।

: করুন।

: আপনি পাকিস্তানের এজেন্ট

: ছাগলরা বলে এসব কথা।

: ছাগল বলছেন কাকে?

: যারা মানুষের নামে অমানুষের মতো অপবাদ দেয়।

মেজোবাবু হঠাৎ মেজোবাবু থেকে পুলিস হয়ে গেলেন এবং আচম্কা জাফর কাজীর বুক সোজা একটা ধাক্কা মেরে চিৎকার ক'রে উঠলেন—আগে বাড়ো।

এর নাম পুলিসী আওয়াজ। বৃটিশদের শেখানো আক্রমণের ভাষা। এখন এই উপমহাদেশে সব পুলিসই এরকম আওয়াজের মানে জানে। প্রয়োজনে-প্রয়োগও করে।

পুলিস মানে পুলিস, যারা বৃটিশের ফর্মায় মার্কা মারা। পুলিস মানে মানুষ না। পুলিসের কাছে যারা মানবতার দাবি করে, তারা মূর্খাতিমূর্খ। সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে পুলিসের পার্থক্য চরিত্রগত না। পার্থক্য শুধু পোশাকের। খাকি পোশাকের আড়ালে-পুলিস এই সমাজ, এই সমাজের যা কিছু ভাল, যতটুকুও সততা ও নিষ্ঠার অবশেষ আছে, তাকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত।

কিন্তু সেই যে ইতিহাসের কথা? ধ্বংসের মহাকাল হয়ে তুমি যদি অবতীর্ণ হও তো তোমাকে রুখে দেবে সৃষ্টির কোরাশ। ধ্বংস যদি উন্মত্ত হয়, সৃষ্টির রূপ হয় অমল-কোমল বিভায় চাঁদের আলো। কিন্তু তার শক্তি অপ্রতিরোধ্য। সেই অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে ফ্যাসিস্টরা পিছু হটে। হটতে বাধ্য হয়। সমস্ত কাজীপাড়ায় নিশুতি রাতের আচ্ছন্নতা ভেঙে শত শত জাগরী মানুষের নিঃশব্দ ফিস্‌ফাস্ শুরু হয়ে গিয়েছে। মেজো দারোগার 'আগে বাড়ো' হুঙ্কারের রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই, প্রায় সাথেসাথেই তার প্রতিরোধের প্রতিধ্বনি।

তিনশোরও বেশি নওজোয়ানের বলোদ্দীপ্ত কোরাশ—হুঁশিয়ার······।

জাফর কাজী হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন সেই কোরাশের সুরে সুর মিলিয়ে—আটকাও, দানবগরে যেমন করি পারো আটকাও।

আটকাবো। আমরাই আটকাবো। একটারেও পালাতি দেবো না।

উঠোনে কোরাশ।

কোরাশ চতুর্দিকে। কাজীর বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে ত্রাস জাগানো কোরাশ।

পুলিস তুমি পালাও, যদি জানের তোমার মায়া থাকে।

পুলিসের তো একটা জায়গাতেই মায়া। সে হলো তার নিজের জীবনের। মেজো দারোগা ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। পেছনে পেছনে তার সশস্ত্র বাহিনী।

কাজীর ছেলে মহিউদ্দিন—যে তিমিরপুরের মানুষের কাছে মদন, সৈকত খাসকেল যার প্রাণের দোসর, তারা খাঁচা ভেঙে উড়াল দিয়েছিলো জিপের শব্দ শুনে অনেক আগেই। তারাও এখন তিনশো কোরাশের ভিড়ে আত্মগোপনে গর্জন করছিলো। চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি ক'রে এগিয়ে আসছিলো সাড়াশীর মতো জনতার বেরিকেড। আর জাফর কাজীকে মাঝখানে রেখে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও ক্রমাগত গুটিয়ে এসে শেষে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়।

মেজো দারোগা কাঁপে। কাঁপতে কাঁপতেই হুমকি দেয়—সাবধান। গুলি চালাতে বাধ্য করবে না। হট্ যাও।

হা-হা ক'রে হাসে ক্রুদ্ধ কোরাশ।

হাসতে হাসতে চাপ বাড়ায়। ছোট হয়ে আসে।

মেজোবাবু খিতিয়ে যান। বলেন—কাজী সাহেব। কাজী সাহেব, প্লিজ ওদের চলে যেতে বলুন। আমি রক্তপাত চাই না।

বাতাসে বিদ্রুপের শিস্ বাজে আবার। নিষ্ঠুর রসিকতায় কোরাশের কণ্ঠে কে যেন গর্জে ওঠে—ওরে গোলামের ব্যাটা গোলাম—একটা গুলি চালাবি—আমরা তিনশোডা বর্শা হাঁকাবো…।

: 'না।

: গুলি চালা।

: আমি গুলি চালাতে আসিনি। নবশাল ধরতে এসেছি।

: কেডা নকশাল বান্চোতের ব্যাটা বান্চোত্ ?

: সৈকত খাসকেল।

: আমরা তিনশো সৈকত খানকেল।

: না-না। সৈকত খাসকেল একজন।

: এখানে তিনশোডা সৈকত হাজির আছে। একরকম মুখ, একরকম খিদে, একরকম ভালবাসা, একরকম রক্ত।

: নকশালরা ধর্ম মানে না। কাফের।

: ওরে গাণ্ডু, ওরে গোলামের ব্যাটা, কাফের তুই।

: খবরদার, আর এগুবে না।

: যারা আগায়, তারা পিছায় না। তুই ঠ্যাকা.. বন্দুক ওঠা।

অন্ধকারে বর্শার ফলকগুলো ঝকমক করতে থাকে। এতক্ষণ বর্শার ফলকগুলো খাড়া ক'রে ধরা ছিলো। এখন তা সাপের ফণার মতো তেজী হয়ে আনত হলো।

যে কোনো সময় ঝাঁক ধরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

কোনো শব্দ নেই। পাতা ঝরারও না। রাত জাগা কোনো পাখিও বুঝি এ তল্লাটে নেই এখন। অন্ধকারকে গভীর-গভীরতর প্রকট ক'রে তুলেছে চারদিকের ঘন ঝোপ-ঝাড় আর বিশাল গাছ-গাছালির ঝাঁকড়া শরীর।

জোনাকিরা জ্বলছে। জ্বলছে। এদিকে-ওদিকে-সর্বত্র।

আছে ঝিল্লির কোরাশ। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ ঝড়ের মতো ফুঁসতে থাকে।

নৈঃশব্দ্য ভেদ ক'রে কোরাশের প্রতিনিধিত্ব করে একটি অমোঘ কণ্ঠস্বর—কাজীর কাছে ক্ষমা চাও।

: না। ক্ষমা চাইবো কেন ? মেজো দারোগার ভেঙে পড়া কণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ।

: ক্ষমা চাও। তিনশো কণ্ঠ একসাথে গর্জনের সেতু নির্মাণ করে মুহূর্তে।

একজন কনস্টেবল ফিস্‌ফিস্ ক'রে অনুনয় করে—স্যার, ক্ষমা চেয়ে নিন স্যার।

আরও একজন—স্যার, মেরে ফেলবে আমাদের।

আরও একজন—স্যার—তাড়াতাড়ি করুন।

সকলে—স্যার, দেরী করবেন না স্যার।

মেজো দারোগার কণ্ঠস্বর আটকে যায়। ক্র্যাক করে গলা। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

কোরাশ থেকে খণ্ড একটি নির্দেশ ভেসে আসে—এবার ভাগো।

শোনামাত্র বেরিকেডের ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে দুদ্দাড় গতিতে বীর সশস্ত্র বাহিনী পালাতে শুরু করে। পালায়। পালিয়ে যায়। দৌড়ুতে দৌড়ুতে বড় রাস্তায়। সেখানে জিপ। ওদের আত্মরক্ষার বাহন। সেই জিপের শব্দও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়।

ক্ষুব্ধ কোরাশ তখন কাজীকে ঘিরে দাঁড়ায় বৃত্তাকারে। নসিরণ ছুটে চলে যান তার দানবপীড়িত তছনছ-লণ্ডভণ্ড ঘরে।

হাহাকার। হাহাকার ছুটে যায় তার সাথে সাথে।

কাজীর লাঞ্ছনা, অপমান যেন নিমেষে জুড়িয়ে যায় কোরাশের দিকে তাকিয়ে।

সৈকত উচ্চকণ্ঠে কোরাশকে সতর্ক ক'রে বলে—পুলিস আর সাপে কোনো ফাডাক নাই। পুলিস ছুঁলে আঠারো ঘা। উরা ফের আসবে। কাল না আসুক, পরশু, পরশু না হলি তরশু, আসপেই। হারু মণ্ডলের, দীপক সান্যালের অনাদি খাসকেলের, রঙ্গলাল দাগার নক্শা আঁকা পথ ধইরে পুলিস ফের আসপে। এই কাজী পাড়ায় তারা আবাদী জমিন বানাবে। কাউরে শান্তিতে বাস করতি দিবিনে এই জন্যি তারা সুযোগ খুঁইজবে। যে কোনো অছিলায় হামলা কইরবে।

করুক আমরা ঠ্যাকাবো।বাধা দেবো।

জান কোরবান

সৈকত বলে—আমরা তো ভালই ছিলেম। ওই রঙ্গলাল দাগা; হ্যাঁ-হ্যাঁ-ওই-রঙ্গলাল দাগারা সারা দেশ জুড়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিছায়ে রাইখছে। দিল্লীর প্রধানমন্ত্রী হৈক্ আর প্রেসিডেন্ট হৈক, রঙ্গলাল দাগাগরে জ্ঞাতিভাই-টাটা-বিড়লা গোয়েঙ্কার আদেশে ওঠ-বোস করে। দরকার হলি দাগাগরে তিমিরপুর ত্যাগ করতি হবে। আমরা যদি এককাট্টা, সাঁকোর মতোন এক সাথে থাকি…

থাকপো।

থাকপো।

রাম রহিমের বাছা আমরা।

একসাথে আছি, একসাথে থাকপো।

মুকুন্দদাস ধিক্কার দিয়ে কইছে—ধিক্ বাঙালি নীরব রইলি-থাকতে মোদের ক্ষেতে ধান। কইছে—মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মহাজনরা 'মটর হাঁকে চৌতলায় থাকে. মোদের নাইকো পেটে ভাত।'

কিজন্যি এই হাহাকার?

বাঙলাডারে খণ্ড কইরলো কারা? গান্ধীজী, নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবরা। হৈলো পাকিস্তান।

কি লাভ হইছে তাতে?

ফের ভাগ। হৈলো বাঙলাদেশ।

শান্তি হইছে কিছু? গরীব-গরীবই রইছে। ধনী আরো ধনী হইছে। সেখানে অশান্তির আগুন জলতিছে। জলে কেন আগুন? ভাতের জন্যি, ঘরের জন্যি, শিক্ষার জন্যি। এ আগুন সবখানে। আর মানুষ যে মানুষের পায়ের নিচে থাকতি চায় না। এখানে হারু মণ্ডলের পা'র নিচে থাকতি চান কেউ?

হারকিস্ না।

কেডা হে হারু মণ্ডল? তার পা'র নিচে থাকপো আমরা!

তিমিরপুরের চাষের জমি জলা জঙ্গল সব নিজির মুঠার মধ্যে নিছে। তার খায়েস মেটে না। মা-বোনের দিক তার খারাপ নজর। গত মাসে কৈবর্ত্যরা রেলের জলায় মাছ ধরতি গেলি মণ্ডল সমিরুদ্দিরে লেলায়ে দিছিলো। কৈবর্ত্যগরে মাথা ফাটায়ে রক্ত ঝারাইছিলো। মাছের বদলে মানুষের রক্ত ঝরে…এই বর্বরতার নজির নাই। রেলের জলায় তো চিরকালই হিন্দু-মুসলমান ক্ষেত খামারের মানুষ মাছ মাইরছে, গরু মৈষ চান করাইছে। এখন সেখানে নামা নিষেধ। পুলিস আছে, সমিরুদ্দির বাহিনী আছে।

হু হু। সমিরুদ্দি। শালা বেইমান। বেল্লিক। মণ্ডলের পা চাটা কুত্তা।

পুলিসও যা সমিরুদ্দি-নবীনও তাই। না হিন্দু, না মুসলমান, না মানুষ। পুলিসের হাতে বন্দুক। লেঠেলের হাতে লাঠি। রঙ্গলাল দাগা-হারু মণ্ডলগরে হাতের পুতুল ওরা।

জানেন তো, পুলিস থাকলি বন্দুক থাকে। লেঠেল থাকলি লাঠি থাকে। পিছনে থাকে থানা। জেলখানা। জেলখানা থাকলি নাট্যশালার মতো বিচারশালা থাকে। মন্ত্রী থাকে। মন্ত্রী থাকলি—জুলুমও থাকে। ফাঁসী কাষ্ঠ থাকে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা তো জানেন। ল্যাজের মতোন এসবের পিছনে প্রধানমন্ত্রী—প্রেসিডেন্টও।

আষ্টপতি!

উহু, আষ্টপতি না—রাষ্ট্রপতি।

ওই হৈলো। এক কথাই।

পতি তো জেনানার। আষ্টের পাবার পতি কী?

ক্রোধের ভেতরে বিদ্রুপ। বিদ্রুপের ভেতরে রসিকতা।

কোরাশের কণ্ঠে হাসির ঝড় বয়ে যায়। মদন বলে ওঠে কোরাশের ভেতরে দাঁড়িয়ে—না হে হাসির কথা না। এবার গাঁয়ে রাতভোর পাহারা বসাতি হবে। না হলি পুলিস আসপি, ডাকাত আসপি; ঠ্যাঙারেরা আসপি। আসপেই হরকিসিমের বিপদ। তার নানা ছদ্মবেশ। রকমারি কায়দাকানুন। পাহারা থাকলি তারা ভয় পাবে। দানবগরে মানুষ দেইখে ভয়। মানুষের জোটকে তারা বেশি ডরায় হে।

নসিরণবানু ঘরের ভাঙাচোরা জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে কেঁদে ফেলেন। এখন তার অভাব অনটনের সংসার। যেটা ভাঙে তা আর পূরণ হয় না। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তিনি বলেন—জোট বাঁধাবেনে হারু মণ্ডলরা। তরে কাইটে নদীর পানিত ভাসায়ে দেবে উরা।

ধীরে ধীরে উঠোন থেকে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরের বারান্দায় উঠে আসেন কাজী। শরী.রর নানা স্থানে ছড়ে রক্তাক্ত। শেয়াল-কুকুরের লাশের মতো পুলিশ তাকে টেনে হিঁচড়ে প্রায় বিকল ক'রে দিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না তিনি। বারান্দায় বসে তিনি নাসিরণবানুকে বললেন—পানি আনো, খাবো।

: গিলাস-বাটির হদিস নাই। কিসে পানি দেবো। আন্ধারে কিছু চোখিও দেখিনে। মদনভারে ডাকো।

উঠোনে দাঁড়ানো মদন তখন উত্তেজিত ' 'স বলতে থাকে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি দিতিছে উরা। আমি জানি, আইজ না হোক-কাইল, যে কোনো উছিলায় উরা দাঙ্গা লাগানোর চিষ্টা কৈরবে। কিন্তু, আমরা যদি এককাট্টা থাকি তো মণ্ডলগরে ক্ষমতা নাই তা করে।

হ হ জোট। এককাট্টা হওয়াডাই আসল শক্তি। রাত দুপুরে হারু মণ্ডল পুলিস পাঠায় কি কেবল সৈকতকে ধরতি? না। তারা চায়—একটা ভয় ঢুকায়ে—আমাগরে দুর্বল করতি। যেন কেউ একজোট না হতি পারি। কিন্তু আমাগরে কসম খাতি হবে, আমরা জোট ভাঙবো না।

কসম। হাজারবার কসম।

জোট ভাঙবো না।

সৈকত বলে ওঠে—কাজী সাহেব আমাদের চোখের মণির মতো। তার উপর কোনো হামলা হলে আমরা কেউ তা বরদাশ্‌ত করবো না।

না। না।

কাল থেকে আমরা রাতজাগা পাখি হবো।

রাতজাগা পাখি কী?

আঁধারেও যাগোরে চোখ আলোকিত।

ঠিক। ঠিক কথা।

আমরা রাতজাগা পাখি হবো।

চলো হে।

তখন জনস্রোতে সৈকত-মদনও বেরিয়ে যায়।

নসিরণ উদ্বেগে বলে ওঠেন—কনে যায়? ভোর বেলা কনে যায় গো?

আকণ্ঠ জল পান করে কাজী বললেন—ঠিকানার খোঁজে যাওয়ার সোময় পিছু ডাকতি নাই।

তো কথাটা ঠিক। পুলিস ছুঁলে আঠারো ঘা।

দুই নম্বর ঘা-টা পড়ে পরের দিনই। সেই একই সময়ে মেজো দারোগার নেতৃত্বে। জিপ নিয়ে ঢোকে না আজ। পায়ে হেঁটে—দলে ভারী হয়ে ঢোকে। উদ্দেশ্য কি তাদের, কেউ জানে না।

অন্ধকারে শরীর ঢেকে নিঃশব্দে পুলিস বাহিনী ঢুকে পড়লো কাজী পাড়ায়। হাতে রাইফেল-বন্দুক তাক্ করা। চোখে শিকারের অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণতা।

হঠাৎ তিন-চারটে কুকুর তারস্বরে রাত্রির নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ ক'রে ঘেউ ঘেউ ডাকতে ডাকতে পিছু হটতে থাকে। পুলিস যতো এগোয়, ওরাও ততই চিৎকার করে। মেজোবাবু প্রথমে থম্‌কে যান। ফিস্‌ফিস্ ক'রে কনস্টেবলদেরও দাঁড়াতে বলেন। এবং কুকুরের মতোবাতাসে ঘ্রাণনিতে নিতে বলেন—এগুবে?

: ভয় পাচ্ছেন স্যার? একজন কনস্টেবলের স্বরে ভয় ধরানো প্রশ্ন।

: কি? ভয় পাবো কেন?

: না স্যার। মনে হচ্ছে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে কিছু ওৎ পেতে আছে।

: কিরকম? কিছু দেখেছো?

: না।

: তাহলে ওরকম ভৌতিক কথা বলছো কেন ?

: দু'একটা ঝোপ-ঝাড় কিরকম দুলে উঠেছিলো। হঠাৎ সে চাপা স্বরে সামনে দেখিয়ে বলে—ওই যে স্যার। অন্ধকারে ওখানে কারা জটলা করছে।

: গুলির অর্ডার দিতে বলছো ?

: না স্যার। ভুলেও গুলি ফুলি করা যাবে না।

: কেন ?

: স্যার আপনি নিশ্চয়ই জানেন রাতের বেলা…

রেগে ওঠেন মেজোবাবু—বাজে বকছো কেন ? দরকার হলে গুলির অর্ডার দেবো না ?

: তা দেবেন স্যার।

: নিশ্চয়ই দেবো। তুমি কি মনে করো নকশালদের আমি ভয় করি নাকি ?

: সে কথা না স্যার। এখানে নকশাল নেই।

: তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক হে। প্রশাসন বলছে নকশাল, তুমি বলছো নকশাল নেই ? এতো রীতিমতো বিদ্রোহের কথা !

: দুর স্যার। বিদ্রোহ ফিদ্রোহ কি। নকশাল কোথায় ?

: নকশাল মানে জানো ?

: উগ্রপন্থী।

: ঘোড়ার ডিম। বরিশালের নাম শুনেছো ? যারা সেখানকার বাসিন্দা তাদের বলা হয় বরিশালী।

: যারা স্যার নকশাল বাড়িতে বাস করে—তারা নকশালী ?

: কতকটা তাই।

: ওই যে স্যার দেখুন দেখুন।

অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তিরা সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সময় প্রায় ডজনখানেক কুকুর ঘেও ঘেউ করতে করতে ছুটে আসে। ধক্ ধক্ ক'রে চোখের মণি জ্বলতে থাকে ওদের। ওরা এমনভাবে লাফ ঝাঁপ করছিলো যে, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে এসে কামড়ে দিতে পারে।

অন্য একজন কনস্টেবল বলে ওঠে—স্যার, কুকুরের দাঁতে বিষ আছে স্যার। কামড়ালে চোদ্দটা ইনজেকশন নিতে হয়।

: আহ্ থামো। ধমকে ওঠেন মেজো'দারোগা।

কুকুরগুলো উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সবগুলো একসঙ্গে চিৎকার করতে করতে একবার এগোয়, আরেকবার পিছিয়ে যায়।

: স্যার। কি করবেন স্যার ?

: ওদিকটায় ওরা কারা স্যার ?

: স্যার, অনেক মানুষ স্যার। হাতে মনে হচ্ছে ধারালো অস্ত্র শস্ত্র।

: স্যার চ্যালেঞ্জ করবো স্যার ?

: বন্দুক লোড করা আছে ?

: আছে স্যার।

: একটু আগে যাদের দেখেছি—এরা কি তারাই ?

: নতুন দল এটা।

: কি ক'রে বুঝলে ?

: অনুমান ক'রে। আগের দলটা ছোট ছিলো। এ দলটা তার দ্বিগুণ।

: ভারতবর্ষটা নকশাল হয়ে গেলো। ইন্দিরা গান্ধী যে কী করে। মেয়েমানুষ দিয়ে দেশ চলে ? চলে না। যেদিকে তাকাও—শালা নকশাল।

: এরা তো স্যার সি পি এম পার্টি।

: তুমি তো নন ম্যাট্রিক সেপাই। সি পি এম নকশাল মানে বোঝো ?

: কেন স্যার, সি পি এম হচ্ছে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন পার্টি।

কুকুরের মত্ত চিৎকার ছাপিয়ে মেজো দারোগা হা হা ক'রে হেসে ওঠেন। স্যারের হাসির প্রতি সহমর্মিতা জানাতে গোটা বাহিনীই তখন পরিবেশ পরিস্থিতিরকথা ভুলে গিয়ে হেসে ওঠে আর অদূরে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিরাসচকিত হয়ে একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে—কে ? কে ? কারা ?

সঙ্গে সঙ্গে কাজী পাড়ার সমস্ত এলাকাটাই যেন একসঙ্গে ফেটে পড়ে—কে ? কে ? ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি। কুকুরগুলোও যেন পাগলের মতো চেঁচাতে শুরু ক'রে দেয়। বেগতিক দেখে মেজো দারোগাও কিরকম দুর্বল কণ্ঠে চেঁচায়—আমরা থানা থেকে এসেছি।

ততক্ষণে অন্ধকার ভেদ ক'রে ছায়ামূর্তিরা চারদিক থেকে সামনে এগিয়ে আসে।—কি চান ?

: চোর ধরতে এসেছি।

: চোর কোন্‌খানে ? এ গাঁয়ে কোনো চোর নাই।

: আছে।

: নাই। থাকলি পুলিসের দরকার হবি নে। আমরাই শায়েস্তা করতি পারবো।

: আপনারা যান।

: এত পুলিস ক্যা ?

: তোমাদের কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ? তোমরা এত রাত্রে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কি করছো ?

: আমরা গ্রাম রক্ষা কমিটি।

: সেটা আবার কী ?

: আপদ বালাই খেদাই আমরা।

: খুব বেআইনি কাজ হচ্ছে এসব। তোমাদের বিরুদ্ধে···

: কথা বলতি হলে দিনের বেলা বলবো।

: সবগুলোকে ধরে নিয়ে যাবো।

: ধরেন। ধরেন।

চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে—ধরেন, ধরেন, ধরেন।

কুকুরের পাল এইসময় মেজো দারোগার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ভয়ে পিছু হটতে হটতে তিনি হুমকি দিয়ে যান--কাজী পাড়ার ভিটে বাড়িতে আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বো। পাকিস্তানের এজেন্টদের···

কুকুরেরা তাড়া করে। মেজো দারোগা চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যান। তার পেছনে তার সশস্ত্রবাহিনীও ঘোড় দৌড় শুরু করে। দৌড়ুতে দৌড়ুতে তারা শুনতে পায় পেছনে উদ্দাম হাসির কোরাশ। আর সেই কোরাশের শব্দে সচকিত তিমিরপুর যেন ঘোষণা ক'রে দেয়, আমরা এখন জাগরিত হে।

কিন্তু জাগরিত হও আর ঘুমিয়ে থাকো, ঘটনার পরে ঘটনা তার নকশা আঁকা থেকে বিরত থাকে না। নকশা আঁকায় নেশা আছে যে। ওই যে, গ্রামীণ প্রবাদ, নেই কাজ তো খই ভাজ।

সেই পেটেন্ট নবীন পেয়াদা! কোর্তা গায়ে, কদমছাট্‌ চুল আর খাটো ধুতি-হাঁটু অব্‌দি। মূর্তিমান ফরমান হয়ে নোটিশ দেয় এসে। তখনো ভোরের কুয়াশা সোঁদাগন্ধ ঘাসে আর মাটিতে। সবুজ গাছ গাছালিতে রাতের ক্লান্তি। নরম রোদ্দুরের হামাগুড়ি দিয়ে তেজি হয়ে ওঠার প্রস্তুতি। অদূরে মসজিদের পুকুর ঘাটে নারী-পুরুষের স্নানের দৃশ্য। শিশুদের কোলাহল পাখির ডাকে মিলেমিশে অন্তরঙ্গ।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে এসেছিলেন কাজী। প্রথমে কৈবর্ত্য পাড়ায়। মোংলার বউটা কদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। গাঁয়ে হাসপাতাল নেই। ওষুধ নেই। ভাল ডাক্তার নেই। আগে পার্বতী ডাক্তার ছিলেন। গণদেবতার

সেবায় নিজেকে সারাজীবন ওই একটা মানুষ অনলস পরিশ্রমে পরিতৃপ্ত থাকতেন। আজ তিমিরপুরের মানুষ তার অভাব তার স্মৃতি গভীরভাবে স্মরণ করে। কাজীও তার অভাব প্রতিমুহূর্তেই টের পান। কি যে হলো দেশটার। শহরে যারা ডাক্তারী পড়তে গেলো, তারা কেউ আর ডাক্তার হয়ে ফিরে এলো না এই হতভাগা গাঁয়ে। শহরের হাতছানি তাদের টেনে নিয়ে গেলো চিরতরে। এখন কালে-ভদ্রে কেউ কেউ হাওয়া বদলাতে আসে।

ওই হাওয়া বদলানো পর্যন্তই। কাজীর নিজের ছাত্রদের মধ্যেই জনা তিনেক এখন নামী-দামী ডাক্তার। মাঝে মাঝে গল্প শোনেন তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তাদের গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, হাই সোসাইটির তারা এখন মধ্যমণি। বাইরের 'কল্' এটেণ্ড করলে দু'শো টাকার নিচে কোথাও যায় না। তাও আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে তবে। পনেরো দিন আগেই তাদের চেম্বারে লাইন দিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে হয়। রোগী দেখানোর সময়ও সেই একই রেশনের লাইন।

নূরমহম্মদ একসময় খুব বড় বড় কথা বলতো। সাজানো গোছানো কথা। স্যার, দেখবেন স্যার, আমি গাঁয়ে আসতে পারছিনে ঠিকই, কিন্তু আমি স্যার—গরিবের ডাক্তার। পেট ভাতের জন্যে যেটুকু দরকার—শুধু সেইটুকু পয়সা হলেই চলে যাবে আমার।

তার কথা বিশ্বাস করতেন কাজী। নূরমহম্মদ বোধহয় বদলাবে না। ওর একটা আদর্শ আছে। একসময় নকশালবাড়ির রাজনৈতিক উত্থান ও অস্থিরতার সময়ে—নূরমহম্মদের সঙ্গে কাজীর দেখা হয়েছিলো কলকাতায়। খুব ব্যস্ত তখন নূরমহম্মদ। ভোর হওয়ার আগেই সে বেরিয়ে যায় একবালপুরের চেম্বারে। ফেরে রাত একটা দেড়টায়। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। তার ফাঁকেও ও দেশের কথা ভাবতো। ঘরে বিপ্লবীদের আনাগোনা। নূরমহম্মদ সেসময় ওদের টাকা দিয়েছে। ওষুধ-পত্র দিয়েছে। খাইয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক চালিয়েছে। ওদের লিটারেচার পড়েছে রাত জেগে। আর বলেছে—

: আছি আমি। সমাজ পরিবর্তনের কাজের সঙ্গে আমি আছি। মেকি লালঝাণ্ডাঅলাদের মুখোশগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এরা নয়াসংশোধনবাদী। লালঝাণ্ডা দিয়ে এরা লালঝাণ্ডার বিরোধিতা করছে। জনগণকে ব্লাফ দিচ্ছে। ওরা সংসদীয় পথে গদি আকড়ে থাকতে চায়। কলকাতা থেকে দিল্লি—একই পথ ওদের। বিপ্লবের প্রধান বিপদ এরা। কারণ জনগণ বিভ্রান্ত।

কাজী অবাক হয়ে, গর্বে বুকের ভেতরে অবিরল ধারায় খুশি ও আনন্দে

স্নাত হতে হতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন তার কৃতী ছাত্র নূরমহম্মদকে। ওর মুখের প্রতিটি রেখাকেও যেন তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পরখ করতে চেষ্টা করেছেন। ঠিক বলছে তো নূরমহম্মদ! কোথাও কোনো ঝুটা আবেগ নেই তো ওর এই স্বতঃস্ফূর্ত চেতনায়? সেসময় সন্দেহ করতে পারেননি তিনি।

বিতর্কের ঝোড়োপাখি তখন ডাক্তার নূরমহম্মদ—ইয়েস। খুবই সঠিক যে, গ্রাম দিয়েই শহর ঘেরাও করতে হবে। গ্রাম আমাদের পঁচানব্বই ভাগ। শহর আমাদের পাচ। অর্থনীতি আমাদের গ্রামীণ। কৃষি আমাদের মূল প্রবলেম। জাতীয় সমস্যা বলতেও কৃষি। এবং প্রধানতম স্তম্ভ। নিও ডিমোক্রেটিক রিভোলিউশনের লাইন ধরে এগুতে হবে।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, মেকি'রাও এই শ্লোগানই দিচ্ছে। সেটাই সমস্যা। তো এই সমস্যাকে আমাদেরকে আমাদের বিভিন্ন নরম্ ও ফরমে তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন লিটারেচারেও। ভাল কাগজ বার করুন। সাপ্তাহিক হলেও চলবে। তবে ছাপা লে-আউট-রাইটিংস্ স্বচ্ছন্দ, ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বুর্জোয়াদের কমপিট করতে হলে—ওদের শিল্প নৈপুণ্যের মাপকাঠির ওপরে উঠতে হবে আমাদের।

নূরমহম্মদ কথা বলতে বলতে যেন ঝড় হয়ে উঠতো—আমি দশহাজার টাকা অ্যারেঞ্জ ক'রে দেবো। কাগজের দায়িত্ব নিন। ফাইট চাই। দ্বিমুখী অ্যাটাক চাই—একটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ফার্স্ট—সোভিয়েত সোশ্যাল ইম্পিরিয়লিজ্‌ম্, অ্যানাদার মেকি বৃহৎ লালঝাণ্ডা…। অ্যাটাক…আফটার অ্যাটাক…।

ইয়েস, আমাদের সাজানো বাগান—সমৃদ্ধ বাড়ির স্বপ্ন নেই। হাই সোসাইটির হাতছানির মোহ নেই। নেতা হওয়ার ফেরেববাজি চরিত্র নেই। উই ওয়াণ্ট পরিবর্তন। আ টোটাল অ্যামেণ্ডমেণ্টস অব রিঅ্যাকশনারী সিসটেম।

: ত্ব ব্লাডি....ইয়েস ডার্টি…

উত্তেজনায় নূরমহম্মদ কি বলতে গিয়ে তোৎলাতে শুরু করেছিলো। কথা আটকে গিয়েছিলো। দু'চোখে তার মেকি লালঝাণ্ডাঅলাদের প্রতি বিচ্ছুরিত ঘৃণা—ওরা দেয়ালে বিপ্লবের শ্লোগান লিখছে। কেন? বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত ক্যাডার ও পিপলকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। নিজেদের চারপাশে জমায়েত করছে, বাট…কি করছে নিজেরা? সেই অমিততেজ বিপ্লবী শক্তির সমর্থনে সংসদীয় পথকে ধরে রাখছে নিজেদের সুবিধের জন্যে। এই কাউণ্টার রিভোলিউশনারী-দেরকে আউট অব ফোকাসে রাখলে আমাদের ভুল হবে। বরং বর্শাফলক ওদের দিকে তাক্ ক'রে রাখতে হবে…।

সেই নূরমহম্মদ একদিন স্বাভাবিকভাবেই বদ্‌লে গেলো। একটু একটু ক'রে নিজেই টোটাল অ্যামেণ্ডমেণ্ট হয়ে গেলো। একদিন যারা তার চোখে 'মেকি' লাল-ঝাণ্ডা ছিলো, ঘৃণায় যাদের প্রতি নিক্ষেপ করতো থুতু ; সেই কাউণ্টার রিভোলিউশ-নারীদের সাথে তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেলো যথাসময়ে। দুখানা বাড়ির মালিক এখন নূরমহম্মদ। কিছুদিন আগে শুনেছেন, সল্টলেকের বাড়িটা, যেটা তার কথায় কাউণ্টার রিভোলিউশনারী, তাদেরই ধরে হস্তগত করেছিলো সামান্য পয়সায়। সল্টলেকের সেই ডাবল ফ্ল্যাটটা বিক্রি ক'রে দিতে চেয়েছিলো 'ডাবল, পয়সার' বিনিময়ে। সেই মত বদলে এখন নাকি একমাত্র মেয়ে যে তে-রঙাদের সঙ্গে কাজ করে, তার বিয়েতে দান ক রে দেবে ঠিক করেছে।

নূরমহম্মদের তো কোনো অভাব নেই। কলকাতার আট-দশটা নার্সিং হোমে সে সার্জেন হিসেবে নিয়মিত অ্যাটেণ্ড করে অপারেশন টেবিলে। আর কাঁচি ছুরি রেখে হাত-মুখ ধুয়ে একপকেট নোট নিয়ে গাড়িতে ওঠে। ছোটে আরেকটায়। ডিম্যাণ্ডের পরে ডিম্যাণ্ড। সময় নেই তার পেছু ডাকের আহ্বানে সাড়া দেবার। মেডিক্যাল কলেজের পাকা চাকরি, নিজের নার্সিং হোম....পাকা হাতের কাঁচি-ছুরি...ঝক্‌ঝকে নোট। রাশি রাশি·তাড়া তাড়া...। মন্ত্রীর ছেলের অপারেশনটা আগে করতে হবে। ডার্টি-হ্যাপ্টি-সর্বহারারা লাইনে থাকো। সময় হলে কাঁচি-ছুরি ধরা হবে।

কে হরিদাস পাল সাচ্চা বিপ্লবী। ভিখেরির দল। রুজি রোজগার নেই। সারাদিন রাত ফ্যা-ফ্যা ক'রে, টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ায়...। সময় অসময় বোধ নেই। একটা হ্যাণ্ডবিল ধরিয়ে হাত পাতে। ভিক্ষে চায়।

একেকটা জীবন্ত অশান্তি। বিপজ্জনক উপস্থিতি। হটাও। তফাৎ যাও। এখন তার মেয়ে বড় হয়েছে। —য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে। তার নিজস্ব পরিমণ্ডল হয়েছে। হাই সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মেয়েটা গান্ধী ভক্ত। গান্ধীবাদী ইউনিয়নের ফাংশনের ব্যাপারে তার কাছে নানা আবদার নিয়ে আসে। সেসব মেটাতে হয়। আর 'একদা মেকি বিপ্লবী'রা এখন তার বড় খুঁটি। তাদেরও নানা চাহিদা···। খরচের বহর তার দশগুণ বেড়ে গেছে।

সময় নেই ঘামের গন্ধযুক্ত রাতজাগা বিপ্লবীদের সাথে মেলা মেশার। ভিখেরিদের হাতে পয়সা দেবার। থুঃ।

কৈবর্ত্ত পাড়ায় মোংলার বউ-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাজী তার বুকের উথ্‌লে ওঠা যন্ত্রণাটাকে দূর করতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মোংলাকে সামনে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—আমি চেয়ে চিন্তে কিছু

টাকার জোগাড় ক'রে দিতিছি। মদনরে সাথে ক'রে একবার কলকাতায় নে যা বউমারে। নূরমহম্মদ আমার কথা হয়তো ফ্যালাবে না। হাজার হৈক্ আমার ছাত্র আছিলো তো

মোংলার দুই স্যাংটো ছেলে পিঠোপিঠি। ওরা কাঁদছিলো। জগৎ সংসারময় যে নিষ্ঠুর ক্ষুধার হাহাকার, তারই ছোবলে দুই শিশুর কান্নাধ্বনি ···।

ঃ সহ্য করা যায় না। আপন মনে বিড় বিড় ক'রে হয়তো নিজেকেই কথাটা শোনালেন জাফর কাজী।

দেড়-দুশো ঘর কৈবর্ত্য-দাস-বারুই কাজীপাড়ার লাগোয়া। ওরা একডাকে কাজীর পাশে এসে দাঁড়ায় দু'দশ ঘর বাদে। কাজীপাড়ার মসজিদে ওরা শিরনি দেয়। পীর সাহেবের থানে মানত করে। আভূমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আবাল বৃদ্ধ-বণিতা। ওরা বলে—আপনে পীর বংশের ছেলে। আপনার সাধুর মতো জেবন, আপনে আমাগরে আশীর্বাদ করলি মঙ্গল হবি।

কাজী তো এসব মানেন না। পীর মুরিদী প্রথা তিনপুরুষ আগে লোপ হয়ে গেছে তাদের বংস থেকে। বাপ-দাদা-চাষী হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে বাজান। চিন্তা-চেতনায় আধুনিক। সংস্কারহীন। কাজী বাজানের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়েছেন। লেখা-পড়া তো দূরের কথা, নামটাও সই করতে পারতেন না বাজান। সেই নিরক্ষর মানুষটা কি ক'রে সংস্কারহীন হলেন. ছেড়ে দিলেন পীর মুরিদী···। বরং প্রাচীন সেই প্রথা আকড়ে থাকলে ভরা যৌবনে টগ্‌বগ্‌ করতো কাজী পরিবারের জীবনধারা। বাজান বলতেন—চাষী যেজন, সেজন মানুষ / মানুষ ক্যানে প্রণাম নিবে? আল্লা-রসুল-করেন কবুল / মানুষ যেজন হয়রে ভবে।

তবে মানুষ কজন?

মানুষের কী সংজ্ঞা, আজও কি তার হদিস করতে পেরেছেন নিজেও? কথনো কথনো নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন, আমিই কি মানুষ হতে পেরেছি?

মদন কিন্তু রাজি না নূরমহম্মদ ডাক্তারের কাছে যেতে। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। বলে—সেবার গেলাম দেখা করতি, তিনি কয়ে পাঠালেন, এখন দেখা হবে না, ব্যস্ত আছেন। সেই লোকের কাছে গেলি উপকার পাবো?

কাজী বোঝাতে চেষ্টা করেন—মানুষই ভুল করে। সেই ভুলডা শোধরায়ে যে তারে ঠিক পথে আনতি পারে, সেই হৈলো আসল বিপ্লবী। অ্যাতো অধৈর্য হলি কিছু হয় না বাজান।

মদন মাথা নাড়ে সবেগে—নূরমহম্মদরা ফেরে না। ফিরবে ক্যা? তাগরে

তো কোনো দায় নাই বাজান। জীবনের সারকথাডাযে নিজের আখের গুছায়ে নেওয়া, সেডা যে জেনে শুনে করে, সে আমাগরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আগে তো নূরভাই এরম ছিলো নাকো! আমরা গেলি খুব সমাদর কৈরতেন। টাকা-পয়সা দিতেন। গাঁয়ের মানুষের খোঁজ খবর নিতেন। নিজে থেকেই উৎসাহ দিতেন আমাগরে। কত শত. কথা! ফুরায় না। বিপ্লবের পথ ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নাই। জ্ঞান তো তার কম না। পড়া শোনা করেছেন অনেক। দুনিয়ার বই পত্তর তার আলমারিতে সাজানো। ইতিহাস তার মুখস্ত। তো সেই মানুষটারে ভুল ধরায়ে দেবে আমার মতোন ইসকুল ফাইনাল পাস গণ্ডমূর্খ? যাতি হলি অন্য ব্যবস্থা করতি হবে।

কাজী তাকিয়ে দেখেন ছেলেকে। মদনের ধবধবে ফরসা রংটা রোদে পুড়ে পুড়ে তাম্রবর্ণ। চুলে কতদিন তেল নেই কে জানে। মাথায় তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বুকের ছাতিটা পাষাণপ্রতিম। অর্জুনের মতো আজানু লম্বিত বাহু দু'খানায় শক্তির সম্ভার সাজানো। স্বভাবটাও তার বিপরীত। খুব জেদি ছেলে। কাটা-কাটা স্পষ্ট কথা বলতে কাউকে ছাড়ে না। ফলে ওর বিপদ হয় বেশি। লোকে ভুল বোঝে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাটা কম। এই ছেলেকে চাকরির লোভ দেখিয়ে হারু মণ্ডল কিছুদিন বেপথু করেছিলো। তখন ছেলের সাথে তার বিবাদ। গান্ধীর ছবিও একটা ঘরে এনে টাঙিয়েছিলো তাকে আঘাত করার জন্যে। তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেননি। এই ছবি টাঙানোর মন্ত্রণাটা যে হারু মণ্ডলদের, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। জানতেন, মদন একটা গোলমাল পাকাতে চাইছে, হারু মণ্ডলই পেছনে সুতো ছাড়ছে। ওকে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে।

একদিন মাতাল হয়ে ছেলেকে মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখলেন কাজী। কোমরের দু'পাশে হাত। নাটক- সিনেমার ভিলেনের মতো। চোখে জবা ফুলের রং। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে গন্ধ বেরুচ্ছে।

কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো মাতাল ছেলেকে দেখেছিলেন তিনি। দেখতে দেখতে একটু একটু ক'রে, মাথাটায় ঝিম্ ঝিম্ একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন। বোধহয় ভাবলেন, সোহ্‌রাব রুস্তমের দৃশ্যপট। তার পরিণতি। যত অবিমৃশ্যই হোক তা, জাফর কাজী তো জাফর কাজীই। তিনি কোনো বেপথু মাতালকে সহ্য করবেন কেন! সে যতবড় মস্তানই হোক। তিনি তার সংঘাতের চরম সময়টাকে বেছে নিতে একটুও ভয় পাননি। হাতের ডান পাশে গরু বাঁধার খোটা। মোটা দড়ি পাকানো।

নসিরণ দূর থেকে বাপ-ছেলেকে ওই অবস্থায় দেখে ভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তার আগেই অগ্নুৎপাত হয়ে গেলো। গরু বাঁধার খোটাটা একটা হ্যাচ্কা টান দিযে তুলে এনে ছেলের কপালে আঘাত করেছিলেন কাজী।

একটা সুতীব্র চিৎকার। ফিন্কি দেয়া রক্ত ছিট্কে এসে তার শরীরে লাগলো। রক্তাক্ত মুখটা দু'হাতে চেপে ধরে মদন চরকির মতো একবার পাক খেলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পডে গেলো মাটিতে ইন্দ্র পতনের শব্দে।

উন্মত্ত জাফর কাজী সবেগে—ঝড়ের গতিতে লাথি চালালেন ছেলের শরীরে। নসিরণ তাকে সামলাতে পারছিলেন না। বোধহয় একবার তিনিও হুমড়ি খেয়ে ছিট্কে পডে গেলেন। চিৎকার করতে লাগলেন—তুমরা কিডা কনে আছে গো, মদনরে মাইরে য্যালাইলো··· ।

লোকে লোকে লোকারণ্য কাজীর উঠোন।

তারা এসে দিক্হারা কাজীকে জাপটে ধরে। অনুনয় করে। ক্ষমা চায়। কিন্তু বুনো মোষ একবার ক্ষেপে গেলে তাকে নিরস্ত—শান্ত করা তো মুখের কথা না। বাঘের মত গোঙাতে গোঙাতে পাঁচ দশ পনেরোজনের বেরিকেড ছিন্ন ভিন্ন ক'রে শিউলি ফুলের মতো নরম স্নিগ্ধ কাজী বিসুভিয়াসের উদ্গত লাভা হয়ে মদনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন।

মদন তখন অচৈতন্য।

খবর পেয়ে হারু মণ্ডল সমিরুদ্দিকে নিয়ে ছুটে এসেছিলো। কিন্তু কাজী পাড়া কৈবর্ত্য পাডার লোকেরা তাকে এগুতে দেয়নি কাজীর কাছে। হারু মণ্ডল দূর থেকেই শাসিয়ে গিয়েছিলো—ওই ছেলেরে দিয়্যাই কাজীরে...

সে অনেক ইতিহাস। তিনমাস শয্যাশায়ী ছিলো মদন। নসিরণের সেই যে কান্নার শুরু, তার রেশও তিনমাস একটানা দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিলো সংসারকে। যখন তখন কেঁদে কেটে নিজের অদৃষ্টকেই অভিসম্পাৎ করতেন নসিরণ। যদিও তার সব কথাই ছিলো কাজীকে উদ্দেশ্য ক'রে। কিন্তু কাজী তো ধৈর্যের পাহাড়। তিনি অবিচলভাবে ছেলের সেবা যত্ন ক'রে গেছেন মুখ বুজে, প্রায় নিঃশব্দে।

ছেলেকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে বুকের ভেতরে যন্ত্রণাক্লিষ্ট কাজী জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতেন। বলতেন—তুই আমার ছেলে! আমি যার ছেলে, সে আমার আদর্শ। পীর-মুরিদী ছেড়ে তিনি কৃষক হইছিলেন। নিজের হাতে লাঙল ধরে যিনি গর্বিত ছিলেন। ফসল

ফলিয়ে বলেছিলেন—পরিশ্রম যে করে না, অন্যের পরিশ্রমের ফসল যে বাবুর মতো ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ নাচায়ে ভোগ করে, তারা আল্লার দুশমন। মানুষ কি জন্যি মানুষের পায়ের উপরে মাথা ঠুকপি? এ হৈলো গুনাগারি। নাপাক কাজ। য্যাতক্ষণ ক্ষ্যামতা আছে পরিশ্রম করো, খাটো, সৎভাবে জেবন কাটাও। বাদশা আওরঙ্গজেব নিজির হাতে কোরাণের তর্জমা কৈরতেন, টুপি সিলাই কৈরতেন। সেই পয়সায় নিজি চৈলতেন। রাজকোষের পয়সায় তিনি হাত দেন নাই কো কুনোদিন।

মদন শোনে। বাবাকে দেখে। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও বাবাকে শিয়রে দেখে। ঘুম ভেঙেও দেখে বৃদ্ধ তার শিয়রে একইভাবে বসে। কখনো বা বাবার আঙুলের স্পর্শ পায় মাথার চুলে। বুকে। চোখ বুজে পড়ে থাকে সে। ভাল লাগে বাবার ভালবাসার ছোঁয়া। বাবার মুখ। বাবার উদ্বেগভরা চোখের চাউনি।

একদিন বাবার ডান হাতটা নিজের বুকের ভেতরে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো মদন—মাফ করো বাজান। মাফ করো।

কাজী ধীরে ধীরে বলেছিলেন--মানুষই ভুল করে। মানুষই তা শুধরে নেয়।

: বাজান!

: ঘুমা।

: হারু মণ্ডল আমারে পশু বানাত্তি চাইছিলো।

: হারু মণ্ডলের হার হয়া গেলো আইজ।

: জেবনে তুমার অবাধ্য যদি হই—তালি...কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো মদন।

: কাজী তখন হেসে নরম সুরে বলেছিলেন সৈকত—সুদীপ আইছিলো।

: কি কও বাজান? আনন্দে লাফিযে উঠেছিল মদন।

: না। উঠ্‌পিনে। উঠ্‌পিনে। ডাক্তারের মানা। ঘা শুকায় নাই। অ্যাখনো চুয়ায়ে চুয়ায়ে রক্ত পড়ে

: বাজান, সৈকত—সুদীপ আইছিলো বাজান! আমার পুনর্জন্ম...আইজ।

: সবাই আসপে। সারা তিমিরপুর হাতছানি দে ডাকপে। আমার সে যে কত গর্বের কথা। লোকে কবে, মদন হৈলো জাফরকাজীর ব্যাটা। সেকথনো নষ্ট হতি পারে না।

: দোয়া করো বাজান।

যেন উজ্জ্বল মোম ফোঁটায় ফোঁটায় গলে গলে চুঁয়ে চুয়ে পড়ে হৃদয়ের পিলসুজে।

নিঃশব্দে বাপ-ছেলের ভেতরে তার ছোঁয়া স্বচ্ছ, সজল জলধারায় উচ্ছ্বত হয়ে চলে। চলতে চলতে একদিন সে পথ খুঁজে পায়।

অবশেষে পরামর্শ ক'রে সাব্যস্ত হলো, মোংলার বউকে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে রাত পোহালে। মদন নৈকত সুদীপরাই চাঁদা তুলে চিকিৎসার টাকা সংগ্রহ করলো। ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে কাজী রামেশ্বরপুর থেকে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরেছেন ; বেলা তখন মাথার উপরে, ঠিক সেই সময় মূর্তিমান হয়ে দর্শন দিলো নবীন পেয়াদা।

কোর্তা গায়ে। কদমছাট চুল—হাঁটু অব্দি ধুতি। বাঁ হাতে লাঠি ডান হাতে চিঠি।

সেই সময় গরুর চাডাতে ছুটো বিচুলি ছড়িয়ে দিয়ে কেবল মাথায় তেল দিতে যাবেন, দেখলেন নবীন একটা চিঠি বাড়িয়ে দিলো বিশেষ একটা ভঙ্গি করে।

: কি এডা ?

: চিঠি।

: কার ?

: পঞ্চাতির।

: কি জন্যি ?

: ল্যাহা আছে।

: ঠিক আছে। পরে দ্যাখ্‌পোনে।

জাফর কাজী খুব অবাক হলেন নবীনকে টু-শব্দ না ক'রে চলে যেতে দেখে। ভাবলেন স্নানের ঘাটে গিয়ে চিঠিটা পড়ে নেবেন লুকিয়ে যাতে নসিরণ কিছু বুঝতে না পারেন। কিন্তু তা আর হল না। দেখলেন জিজ্ঞাসু মুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন নসিরণ। দেখে ভয় পেলেন মনে মনে। আর যাই হোক তিনি মিথ্যে কথা বলতে পারবেন না। কোনোদিনই নসিরণকে মিথ্যে বলেননি। চিঠিটা খুলে পড়ে ফেললেন নিমেষে। পড়ে তার হাত পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম। জরুরী তলব। পঞ্চায়েতে নিরাপদ লস্কর তার বিরুদ্ধে ঋণের টাকার সালিশ মেনেছে। রামেশ্বরপুর বাজারে নিরাপদর গোলদারি কারবার। সে অনেককাল আগের কথা। দশ বারোবছর। মাসকাবারি জিনিসপত্র আনতেন। হিসেবপত্র কোনদিনও রাখেননি তিনি। কিন্তু একবার

নসিরণই ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন নিরাপদর প্রতি তার আস্থার। বলেছিলেন—একটা দুটো মাস নিজের কাছে হিসেব রেখে যাচাই ক'রে দেখো। অতো জিনিস তো আসে না। মাসে যতো টাকা নিরাপদরে তুমি দিতিছো।

দুমাস রাখতে হয়নি হিসেব। একমাসেই ধরা পড়ে গেলো নিরাপদর ফাঁকিবাজি। পঞ্চাশ টাকার জিনিসে পনেরো টাকা অতিরিক্ত লিখেছে নিরাপদ। শুনে নসিরণ বললেন, এবার হিসাব করোগে, য্যাতোকাল নিরাপদর দোকান থিকে মালপত্র নিতিছি আমরা, পঞ্চাশ টাকায় প্রতি মাসে পুনারো টাকা বাড়তি নিয়া নিছে নিরাপদ। কওগে যাও।

দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন কাজী নিজেই। বলেছিলেন এনিয়ে বিবাদ তিক্ততা ক'রে কি হবে। নিরাপদর কাছ থেকে জিনিস আনা বন্ধ ক'রে দিলেই মিটে গেলো। দিয়েওছিলেন তাই। হিসেবপত্রও মিটিয়ে-চুকিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এই দশবছর নিরাপদর সাথে তার কোনো লেনদেন ছিলো না। দাবি করলে তিনিই পাওনাদার হতে পারেন। দশবছর পরে আজ হঠাৎ নিরাপদ হারু মণ্ডলের কাছে পাওনাদারের অভিযোগ জানাতে এলো কেন?

হারু মণ্ডলের চিঠিতে উল্লেখ করা আছে, আজই সন্ধ্যায় সালিশ বসছে। আপনি অবশ্যই হাজির থাকবেন। উপস্থিত না হলে ধরে নেওয়া হবে, আপনি পঞ্চায়েতের বিচারে আস্থা রাখেন না।

নসিরণের চোখে ধোঁয়া—নবীন কিসির চিঠি দিয়্যা গেলো গো?

মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন কাজী।—নসিরণও পেছনে পেছনে ঢুকলেন—নাইতি না যায়া শুলে যে? কিসের চিঠি?

মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে মনের অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারলেন না কাজী। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস নিলেন বড় ক'রে—নিরাপদ...।

নসিরণের চোখে কৌতূহল—কি?

: নালিস কৈরছে মণ্ডলের কাছে।

: ক্যা?

: টাকা পাবি আমার কাছে।

: কি আনছিলে আবার?

: কিছু না। গত দশবছরে তার সাথে কোনো লেন-দেন নাই আমার।

: তালি?

: মিছেমিছি। হারু মণ্ডল করাইছে।

: তুমি এ বিচারে যায়ো না।

: পঞ্চায়েতের নোটিশ। যাতি হবে মদনের মা। না গেলি আমারই বিপদ হবি। মণ্ডল আমার মৃত্যু না হওয়া পৈর্যন্ত এইভাবেই জ্বালায়ে মারবে।

শুনে নসিরণ কাঁদেন চোখে অঁচেল চাপা দিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলেন— চলো, আমরা তিমিরপুরের বসত উঠায়া অন্য কোনোখানে চলি যাই। এ আর সৈহ্য হয় না। সারাডা জেবন এই অশান্তি। কি কৈরছি আমরা হারু মণ্ডলেরে?

: কি জানো মদনের মা, বাজান কইছে মরার আগে, ভাল-মন্দ যাই হৈক, নিজির ভ্যাশ ছাইড়ে যাবিনে কুনোদিন। বাঁচতি হলি এইখানে, মরতি হলিও এইখানে। তা ছাড়া যাবোই বা কনে? সর্বত্রই এই একই দৃশ্য।

হতাশায় ভেঙে পড়লেন নসিরণ। বুকের ভেতরে কি একটা ঘূর্ণপোকা ঢুকে পড়েছে? কুট্ কুট্ ক'রে কুরে কুরে খাচ্ছে হাড়-মাংস-অস্থি-মজ্জা? অবিরাম এই কুরে কুরে খাওয়া। দিনে শান্তি নেই, রাতে শান্তি নেই এমনকি স্বপ্নের ঘোরেও হাজার দুঃস্বপ্ন আসে ছারপোকার মতো পিল পিল ক'রে। ঘুমের ভেতরে স্বস্তির নির্যাসটুকুও নিংড়ে নিংড়ে খায়। তাড়ালে যায় না। মারলেও মরে না। তিনি চোখের জল মুছে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

খোলা জানলায় শাই শাই ক'রে হাওয়া আসে দক্ষিণের মাঠ পেরিয়ে। গাভীন গরুটা অনেকক্ষণ চেঁচাচ্ছে গোয়াল ঘরে। একমুঠো বিচুলির জন্তে এত হাঁক-ডাক। উঠতে ইচ্ছে করে না কাজীর। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে বিষাদের ছায়া। অবসাদে-শৈথিল্যে ক্লান্ত স্নায়ুতে ঘুম নেমে আসে। চোখ বুজে শুয়ে থাকেন তিনি।

দক্ষিণের দলছুট হাওয়ায় স্মৃতিজাগানিয়া গুণগুণ। কি হলো দেশটার। কি হচ্ছে চারদিকে এ সব। আইন কোথায় গেলো? বিচার-বিবেচনা-বিবেকের দংশনে কোন পাপবোধে অন্যায়বোধে মানুষ নিজেকে সংশোধন করার পথ পরিহার ক'রে এমন পশুবৃত্তিতে মেতে উঠছে। থানা পুলিসই বা আছে কেন। সাধু-সজ্জনের ভরসাস্থল থানা-পুলিস। দুর্জনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত। তো রক্ষাটাতো দূরস্ত্। ওরাই এখন দুর্জনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এমন চিত্র দেশের সর্বত্র।

সৈকত সুদীপরা আদর্শের জন্তে লড়ছে। ওদের লড়াইয়ের পেছনে যুক্তি আছে। আদর্শের জন্তে যে লড়ে, আদর্শ তো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি নয়, মানুষের হিতার্থে আদর্শের বাস্তবায়ন, যত লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন, তারা কখনো কূপমণ্ডুক হয় না, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে। কে হিন্দু, কে মুসলমান

সেসব প্রসঙ্গ অবান্তর। এ ক্ষেত্রে মানুষের সমাজার্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নটি মুখ্য।

চীন দেশের, লেনিন স্তালিনের রাশিয়ার রক্তাক্ত লড়াইয়ের ইতিহাস পড়ে জেনেছেন, অধিকার অর্জনের জন্যে কূপমণ্ডুক হলে চলে না, মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে, সাম্প্রদায়িকতার ভেদ-বুদ্ধি আর জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠতে না পারলে, সর্বোপরি শ্রেণীগত অবস্থান নির্ণয় করার বিচার শক্তি আয়ত্ত না করলে কোন বড় রূপান্তরের স্রোতধারায় নেতৃত্ব করা যায় না। ইতিহাস কোনো শিশু-সুলভ আবেগকে জয়ী করেনি।

সুদীপ-সৈকত-মদনরা এগুচ্ছে। স্রোত একটা আছে। কিন্তু ভাঁটার টান তাতে জোর। উজানমুখী টানটা বড় দুর্বল। প্রায় ক্ষীণ।

ভারতের অর্থনীতি তো এখনো গ্রামীণ। কৃষি তার মূল ভিত্তিভূমি। জমিদারি প্রথার বিলোপ হয়েছে কেবল কাগজে কলমে—আক্ষরিকভাবে। বাস্তবে বহুরূপে জগদ্দল পাথরের মতো গ্রামীণ জীবনের মাথায় চেপে বসে আছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। পশ্চিমবাংলাসহ সারা ভারতে হারু মণ্ডলদের মতো জোতদাররা অকটোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মানুষের বিকাশধারা। সামাজিক প্রবৃদ্ধি।

থানা পুলিশ এদের হাতে। আইনের সমস্ত রকম সুবিধের দিকগুলো হারু মণ্ডলদের পক্ষে। থানায় বিচার নেই। কোর্টে কজন যেতে পারে? যায়? সেইতো থানা-পুলিসেরই কর্তৃত্ব; হাকিমের হুকুম পুলিসও পালন করে না। কেউ কারো তাঁবে থাকতে চায় না। সমাজে ঘনীভূত এই সঙ্কট জন-জীবনকে বিধ্বস্ত করছে ক্রমাগত।

এই তিমিরপুরের পরিধি বিশাল ভারতের তুলনায় কতটুকু? আজীবন দেখছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোয় মাত্র গুটি কয়েক মানুষ তিমির-পুরের প্রবৃদ্ধি প্রতিহত ক'রে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। আর তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব। হারু মণ্ডলরা তাদের একচেটিয়া শোষণ ও জুলুম চালাতে চালাতে যখুনি গণপ্রতিরোধের সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েছে, তখন আর, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেনি, সেই পুরনো অস্ত্র তারা ব্যবহার করেছে চোখ কান-মস্তিষ্ক সজাগ রেখে।

লাগাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

মাহুষের ক্ষোভ ভিন্ন প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

হারু মণ্ডল শত্রু না। তার বাবা ভৈরব মণ্ডলও শত্রু না। শত্রু ওই মুসলমানরা।

তেমনি পাকিস্তানেও। এই একই ফরমুলা। এই একই কৌশল। বিভক্ত করো এবং শাসন করো।

জোট বাঁধা জনগোষ্ঠীকে একচেটিয়াভাবে বেশিদিন শাসনও করা যায় না, শোষণ করাও সম্ভব না। তার জন্যে মানুষের মধ্যে অনৈক্য চাই। বিভ্রান্তি চাই। পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে।

এ আগুন ভাল জ্বলে।

দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে দিগন্ত ছাপিয়ে। লেলিহান শিখায় ছাই হয়ে যায়, ছাই হয়ে যাচ্ছে মানুষের ভালবাসা। সম্প্রীতি। সৌহার্দ্য পারস্পরিক নির্ভরতা আর বিশ্বাস।

এর মূল কোথায়?

কোথায়, কতদূর প্রোথিত তার শিকড়?

শোষকরা যখন শোষণের পরিধির বিস্তার ঘটায়, কে তার কাছে হিন্দু, কে মুসলমান, ভেবে দেখে না। প্রগতিশীলরা মানবিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে জাত-ধর্ম মানে না, শোষকরা তাদের প্রবৃদ্ধির কারণে জাত-ধর্মকে ভুলে যায়। এই বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতা কাজী তার নিজের জীবনেই বহুবার লাভ করেছেন। সমস্ত তিমিরপুর ভুলে গেলেও তিনি নিজে কখনোই ভুলে থাকতে পারেন না পার্বতী ডাক্তারের স্মৃতি। তিনি সচ্ছল ছিলেন কিন্তু শোষক তো ছিলেন না। তাকেও তো লোকচক্ষুর অন্তরালেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো।

অন্য অনেক দিনের মতো কথাটা এই মুহূর্তে মনে হতেই, যন্ত্রণায় বুকটা টন্‌টনিয়ে ওঠে তার। বুকের বাঁ দিকটায়, হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি সেই যন্ত্রণাটা। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে হয়, বুকে হাত বুলিয়ে স্বস্তি পেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আশ্চর্য, ব্যথাটা থেকে থেকে এদিক—ওদিক ছুটোছুটি করে। যেমন এখন করছে। দুর্বোধ্য স্বরে দম বন্ধ ক'রে তিনি গোঙানির শব্দ করেন। উপশমের কোনো লক্ষণ তাতে প্রকাশ পায় না। পাবে কেন? শব্দ দিয়ে হৃদয়ের তোলপাড় প্রশমিত হয়েছে কখনো কারো?

লোকে প্রচার ক'রে দিলো, পার্বতী ডাক্তার সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাক। তো হার্ট অ্যাটাকের আর কোনো স্থান ছিলো না নাকি?

আমবাগানের নিশির ডাকে তিনি কেন গিয়েছিলেন? হার্ট অ্যাটাকও হলো সেখানেই। মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন মাটিতে।

তখনো ভাল ক'রে আলো ফোটেনি। গাছ-গাছালিতে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের টুপ টাপ্ পতনের খেলা। আলো-আঁধারির লুকোচুরি। পাখিদের উড়াল দেবার প্রস্তুতি দূরের ঠিকানায়। দিনভর যেখানে প্রচুর খাদ্যের সম্ভার সাজানো ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ঝড়ের মতো খবর ছড়িয়ে গেলো—পার্বতী ডাক্তার নেই। একটা 'নেই' কত বিপুল শব্দাবলীর জন্ম দিতে পারে—সেদিন চাক্ষুস দেখেছিলেন তিনি। লোকে লোকারণ্য। কিন্তু পুলিস পৌঁছে গিয়েছিলো। বেরিকেড ক'রে রেখেছিলো তারা ডাক্তারের মরদেহ। তবু মানুষের ঢল। মানুষের কান্না। বুক ফাটা। শোকের সে আর এক রূপ। শোক যে ভালবাসার আবেগ, শ্রদ্ধার নির্মাল্য, তিমিরপুরের হিন্দুমুসলিম গরিবের চোখে মুখে জেগে উঠেছিল তারই উদ্ভাস।

কেউ রইলো না। বিনে পয়সায় চিকিচ্ছে করবে। ওষুধের পয়সা না থাকলে নিজের পকেট উজাড় ক'রে হাত বাড়িয়ে বলবেন—জ্বালায়ে মারলি আজন্ম তোরা। নে-বাজার থেকে কিনে আন্‌গে। খবরদার, ওষুধের বদলে চাল কিনে বাড়ি ফিরিসনে যেন।

কে ছুটবে রাত দুপুরে ভিন্ গাঁয়ে জরুরী কল পেয়ে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে! ক্লান্তি ছিলো না মানুষটার। ছিলো না অহংকারবোধ।

গরিবের ঈশ্বর।

আমাগরে সাত জন্মের ভাগ্যি, ডাক্তারবাবু তিমিরপুরে জন্মেছিলো গো।

করম আলির বুড়ি মা পর্দা-পুশিদার দেয়াল ছিন্ন ক'রে বড় সড়কের ওপরে মাথায় হাত দিয়ে কেঁদেছিলেন—আল্লা গো, আমাগরে চৈখের মণিডারে কাইড়ে নিয়্যা গেলে ক্যা। ও জাফর, আমার করম আলি তো বাঁইচতো না, ডাক্তারবাবু না থাকলি করম আলিরে বাঁচাতি পাইরতাম না।

মানুষ এভাবে কেন কাঁদে?

পার্বতী ডাক্তার করম আলিদের কেউ না।

তিনি ভেবেছিলেন সেই জনারণ্যে দাঁড়িয়ে। ভাবতে ভাবতে দেখলেন—ভিড়ের চাপে একসময় তরঙ্গ ভঙ্গ ক্ষোভ জেগে উঠলো সেই জনারণ্যে।

চিৎকার। হৈ হুল্লোড—পুলিস কি জন্যি? আমরা ডাক্তারবাবুর মুখটা

একবার শেষবারের মতো দেখতি চাই। ফুল দিতি চাই তার শরীলের উপরে।

আমাগরে জন্নি সাড়াডা জেবন তিনি ফুল দেছেন, আমরা ক্যা তা পারবো না?

ক্যা?

ভরু মণ্ডল, ভরু মণ্ডলের কারসাজি।

সেই সময় ভিড়ের একেবারে ভেতরের দিক থেকে কে যেন চিৎকার ক'রে উঠেছিলো—

খুন করা হইছে ডাক্তারবাবুরে।

সেই একটা চিৎকার সমস্ত কোলাহলকে মুহূর্তে নৈঃশব্দের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিলো যেন। সে এক জমাট দুঃসহ স্তব্ধতা। চোখে-মুখে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ঝিলিক।

বিস্ফোরণ হবে হে। মহাবিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তের এই গুমোট স্তব্ধতা হঠাৎ চম্‌কে দেবে তিমিরপুরের পাপীদের অন্তরাত্মা।

কিন্তু তা তো হয়নি। কেন হবে? পুলিস প্রস্তুত ছিলো। ভরু মণ্ডলরা প্রস্তুত ছিলো। ততক্ষণে শ্মশানে চিতাও সাজানো হয়ে গেছে।

ভরু মণ্ডল খুব কাঁদলো। ষাটোত্তীর্ণ মণ্ডলের সেই কান্নায় উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ জনারণ্যকে বিভ্রান্তির পাঁকে একটু একটু ক'রে তলিয়ে যেতে দেখলেন জাফর কাজী।

টিয়ার বৈধব্য-রূপ পাথর। সেই রুমাল কেলেঙ্কারীর ঘটনার একমাসের মধ্যে টিয়ার বিয়ে দিয়েছিলেন পার্বতী ডাক্তার। পেছনে ছিলো ভরু মণ্ডলদের চাপ। আর ভবিতব্যের পাগলা খেলায় মাত্র একমাস আঠারো দিন স্বামীর ঘর ক'রে—সিঁথির সিঁদুর মুছে বাবার কাছে ফিরে এসেছিলো চিরকালের মতো। টিয়ার শেষ পাড়ানীর কড়িও আজ ফুরালো গেলো। নিঃসীম অন্ধকার চোখে নিয়ে তাঁকে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন জাফর কাজী।

শোক মানুষকে শুধু কাঁদায় না। অল্প শোকে অবিশ্রান্ত কাঁদায়। গভীর শোক তা যদি জানান না দিয়ে অকস্মাৎ এসে হানা দেয় তো সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে মানুষ পাথর হয়ে যায়। টিয়াকে দেখে তার মনে হয়েছিলো ও আর নিজের ভেতরে আত্মস্থ নেই। বুকের মধ্যে শোকের যে পাখিটি কাঁদে, বিলাপ করে, সে যেন উড়াল পাখায় বহুদূর কোনো পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে চুপটি ক'রে বসে আছে।

সেই সময় ইচ্ছে হয়েছিলো কাজীর, পায়ে পায়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখে চোখে তাকিয়ে অভয়বার্তা শোনায়। টিয়া, আমরা তো আছি। থাকবোও। তোমার সকল দুঃখের ভার আমরা আমাদের ভালবাসা দিয়ে লাঘব ক'রে দেবো।

টিয়ার ঠোঁট কি একবার চিবুক সহ কেঁপে উঠেছিলো তার দিকে ভাবলেশ-হীন চোখে তাকিয়ে? কিছু কি বলতে চেয়েছিলো?

ভরু মণ্ডলরা ততক্ষণে পুলিসের বেরিকেডের মাঝখানে পার্বতী ডাক্তারের মরদেহ নিয়ে শ্মশান যাত্রার পথে বেরিয়ে পড়েছে। খই ছেটানো হচ্ছে। খুচরো পয়সাও। আর মণ্ডলের নিজের বংশের ছেলেদের কাঁধে শবদেহ তুলে দিয়ে চারদিক সচকিত ক'রে ধ্বনি দিচ্ছিলো বোলো হরি, হরিবোল; বোলো হরি, হরিবোল।

আর হাজারো শোকাহত মানুষকে স্তম্ভিত ক'রে সে সময় ভরু মণ্ডল চিৎকার ক'রে, 'হরিবোল' ধ্বনি ছাপিয়ে কেঁদে উঠলো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, হুম্-হুম্ শব্দ তুলে: চলে গ্যালোরে, আমাগরে দেবতা চলে গ্যালো। ওরে—আমাগরে অভিভাবক, আমাগরে গরিবের বন্ধু আইজ চলে গ্যালো.......। এই দুঃখ, এই ব্যথ্যা···কনে রাখমু আমরা....। কনে রাখমু এই যন্ত্রণা...। ওরে, বাঙালিরা দাঁত থাকতি দাঁতের মরম কেউ বুঝিস না, পার্বতী ডাক্তার আমাগরে দাঁত আছিলো...।

সেই চিৎকার, কান্না, শব্দ ও ভঙ্গি করতে করতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলো ভরু মণ্ডল। মুখ দিয়ে ফুপরি উঠতে লাগলো। ভিড় জমে উঠলো মণ্ডলকে ঘিরে। জল, জল ঢালো মাথায়। গরম দুধ আনো। বড় কঠিন শোক পাইছে ভরু মণ্ডল। এতকাল তো কেউ বোঝো নাই তুমরা। নিন্দে কৈরছো মণ্ডল মশাইরে। গাল-মন্দ কৈরছো, মণ্ডল মশাইরে কৈছো, মণ্ডল মানুষ না। জেবন্ত পিচাশ। মানুষের ভাল করতি জানে না। ভালবাসা বলে তার বুকে কুনো বস্তু নাই।

এখন বোঝো হে মানুষ। মণ্ডলের মনডা মাখনের মতো নরম। শিশুর মতো সরল। চায়া ছাখো, ডাক্তারবাবুর মেয়ার চোখে জল নাই। সাড়া-শব্দ নাই। মায়া-মমতার পেরকাশ নাই। মণ্ডলমশাই তার বিপরীত।

তো গাঁয়ের মানুষের এই স্বভাব। সরল রেখায় হাঁটে। চিরকাল একইভাবে হাঁটতেও চায়। পলিমাটির সবুজ ধান শিষ তাদের মন-মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। প্রতিবিম্বন। অভিনয়টা তারা ধরতে পারে না। বোঝেও না। আৎলেমির-

মাতলামির ঘোরে বুদ হয়ে থাকে না বলে সামনের ঘটমান ছবিকে তারা সত্যি বলে বিশ্বাস করে।

সেদিনও করেছিলো বিশ্বাস।

ঠিক। একশোবার ঠিক কথা। মণ্ডল মশাইরে চিনতি ভুল করিছি আমরা। চোখের সামনে ত্যাখো, কেডা কবে মণ্ডল মশাইরে কাঁদতি দেখিছে?

জল ঢালা হলো।

গরম দুধ খাওয়ানো হলো।

ততক্ষণে মরদেহের যাত্রা থেমে রইলো চৌমাথার মোড়ে।

লাফিয়ে উঠে, দাঁড়ালো ভৈরব চন্দ্র মণ্ডল—ওরে আর হবে না মানব জনম-ভাঙলে মাথা পাষাণে...।

না, আপনার শরীর ভাল না। শ্মশানে যাবেন ক্যা?

: কি কও তুমরা? দেবতার স্বর্গযাত্রায় আমি ঘরে থাকপো? শরীল আমার ঠিক আছে। ভাল আছি আমি। হারু কনে?

: হারান আগে গিছে।

: চলো। চলো।

জাফর কাজী অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলেন, ধুতির কোচাটাকে কাছা মেরে-'বলো হরি-হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে মণ্ডল ছুটে চললো চৌমাথায়।

রাস্তায় সাদা ধবধবে খই ছড়িয়ে পড়ে মুঠো মুঠো। খুচরো পয়সার ঝন্-ঝনানি অনুসরণ ক'রে চলে শব যাত্রাকে।

একসময় দলছুট হয়ে ভরু মণ্ডল পিছিয়ে পড়ায় কাজীর প্রায় কাছাকাছি হয়ে যায় গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়। শিহরিত হয়েছিলেন কাজী। মানুষের চোখে কী বিষ থাকে? সাপের জিভের ছট্ফটানি হয়ে তা উগ্‌ড়ে আসে চোখ থেকে? সেই সঙ্গে চাপা ক্রুদ্ধ ...সফোঁসানি বিষের হল্‌কা হয়ে বিদ্ধ করে তাকে—তুমার মতলব আমি জানি। ভাল চাও তো ফিরা যাও। এখানে তুমার কুনো দরকার নাই।

কাজী মনে মনে চমকে উঠেছিলেন। ঠোঁটের কাছে উছ্‌লে ওঠা কথা তিনি প্রাণপণে আটকাতে পেরেছিলেন। কিন্তু পায়ের গতি থামাননি মুহূর্তের জন্যেও। ভরু মণ্ডল আরেকবার বিষমাখা দৃষ্টিতে ক্রোধ ঢেলে দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গিয়েছিলো হরিবোল্-বোলো হরি ধ্বনির মিছিলে। সেদিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হয়েছিলো, তাকে ধমক দেবার জন্যেই ভরু মণ্ডল ইচ্ছে ক'রে পিছিয়ে এসেছিলো। হয়তো অনেক আগে থেকেই মণ্ডল তাকে লক্ষ্য

করছিলো। কিন্তু ধমক দেবার সুযোগ পায়নি এতক্ষণ। সেই সময়েই তার কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছিলো পার্বতী ডাক্তারের হঠাৎ মৃত্যুবরণ। অথচ বলার উপায় নেই।

দক্ষিণ মাঠের হাওয়ায় হু হু শব্দ। শব্দের ভেতরে শব্দের ছন্দাবলী। সরগম্ নেই। প্রকৃতি তার নিজের সরগম্ বাজিয়ে শব্দতরঙ্গের সিম্ফনি বাজায়। দক্ষিণের মাঠটা তো মাঠ নয়। আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল দীঘি। গ্রীষ্মের দাবদাহে পুড়ে পুড়ে, ছোট হতে হতে, এ পারের পাড়ি ঘেঁষে খানিকটা জলাভূমি। তার বুকের কাছে শুধু গলা সমান জল। মাঝে মাঝে খানা-খন্দের ভেতরে একটু একটু জল। অজস্র কচুরিপানা। পানাফুলের জগতের সব সমারোহ যেন এই দক্ষিণের মাঠে। ডান পাশ দিয়ে এসময় গরু-মোষের গাড়ি অনায়াসে চলে যায় ভিন গাঁয়ে বা বন্দরের দিকে। আসেও। তিন-চার-মাস এভাবে পথ খোলা থাকে।

হাওয়াটাও খুব ঠাণ্ডা। গা জুড়িয়ে যায় প্রখর রোদে ঘেমে ওঠা শরীর। সেই হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে দু'টি মরসুমের ফসল তোলে কৃষক। আমন আর রবিশস্য। মাঠ জুড়ে জলাভূমি ছাড় দিয়ে চলে চাষাবাদ। ব্যস্ততায়-পরিশ্রমে ভাটিয়াল-জারী গানের সুরে সুরে দক্ষিণের মাঠে প্রাণের জোয়ার নেচে গেয়ে উথাল-পাথাল।

হু-হু হাওয়ায় চোখ বুজে আলস্যের বিবরে সাঁতার কাটতে কাটতে এখনো কাজীর মনে পড়ে গেলো, পার্বতী ডাক্তারের মৃত্যুটা আসলে খুন।

টিয়ার এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। একগাছা চুলেও তার কাশফুলের আক্রমণ নেই। মেঘের মতো কালো আর রোঁয়া ধানের গুচ্ছের মতো গোছা। শুধু চোখের নিচে ক্লান্তির, অপূর্ণ বাসনা-লাঞ্ছিত হাহাকারের ছায়া। ভাসা ভাসা চোখে বিষণ্ণ জলের ঝিকিমিকি সারাক্ষণ হু-হু ক'রে কেঁদে চলা মনের ছবি হয়ে ফুটে থাকে যেন। তবু তার সারা মুখে সন্ন্যাসিনীর রুক্ষ সৌন্দর্য। কমনীয়তাও। শুকনো ঠোঁটে কারো হৃদয় ছেঁড়া ভালবাসার চুম্বন পড়েনি। থান কাপড়ের উজ্জ্বল প্রভায় ঠোঁট দুটি যেন রুখু গোলাপের পাপড়ি।

ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘাঙ্গী টিয়ার ভাল নামটাও কোনোদিন জানা হয়নি। অবকাশও হয়নি তার। মনে মনে একটা দুর্বল বাসনা তো ছিলোই। ভালবাসা তো কেবল দেহ সর্বস্ব না। ভালবাসার মূল কথা মানবতা। কোথাও তা ব্যাপক। বিস্তৃত। সীমাহীন অন্তহীন। কোথাও বিন্দুতেই থমকে দাঁড়ায়। যেখানে পদে পদে স্বার্থপরতা এসে অন্ধ স্থবির ক'রে দেয়। দেহসর্বস্বতার কামনা

থাকলে তেমনটিই হয়। হতে বাধ্য। না থাকলে ভালবাসা মিছিল হয়ে যায় ভালবাসার। ভালবাসার বিন্দু থেকে ভালবাসবার সিন্ধুপ্রবাহ তৈরী হয় মননে ও চেতনায়। তো টিয়ার প্রতি আকর্ষণ বোধটা ছিলো সিন্ধু প্রবাহের সেই উৎস থেকে।

মাঝখানে দেয়াল। রক্তচক্ষু। চোখে উদগ্র বিষ। হলাহল।

কে নীলকণ্ঠ, যে ঈশ্বরদের বাঁচাবে রাহু-কেতুদের হাত থেকে হলাহল পান ক'রে? বিষের ভাণ্ড হাতে হারু মণ্ডলরা, ভরু মণ্ডলরা। জাত-পাতের বিষ। ধর্মান্ধতার বিষক্রিয়া দেয়ালের ইটে ইটে।

এগুনো যায়নি। কেন? তুমি মুসলমান। হিন্দুর মেয়েকে ভালবাসবার অধিকার নেই তোমার। অথবা তুমি হিন্দু, মুসলমানের দুলালীকে বরণী করার এক্তিয়ার নেই তোমার।

শিশুর সারল্যে জেগে ওঠা অভিমানী ক্রোধে কাজী ভাবতেন, ছিন্ন-ভিন্ন-ছত্রখান করার একটা কিছু অবলম্বন চাই।

ভেঙে গুড়িয়ে দাও, ইস্রাফিলের সিঙার মহাহুঙ্কারে। একদিন—আবাবিলের ঠোঁটে উঠে আসুক পাহাড় প্রমাণ অস্ত্র। তার অবিশ্রান্ত পতন ঘটুক পাপের ধ্বজায়। ধুলিসাৎ হোক পাপাচারের জৌলুস, ধুন্ধুমার। তার মহামারী ব্যভিচার।

কিন্তু অভিমান তো অস্ত্র নির্মাণের কৌশল জানে না। অভিমানের ধর্ম, হৃদয়ের মধ্যে গুমরে গুমরে কুরে কুরে নিজের অস্তিত্বের বিনাশসাধন করা। পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সমস্ত বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হওয়া।

ভরু মণ্ডল তার করতলে বিষের ভাণ্ড নিয়ে এসে সন্ন্যাসিনী টিয়াকে মোহময় ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে বশীভূত করতে চায়। এ চাওয়ার প্রচলন প্রাগৈতি-হাসিকতার সোঁদা-আঁশটে গন্ধ লেগে থাকা—আদিম সাম্যবাদী সমাজের শাসন শোষণহীন প্রেক্ষা-থেকে সদ্য উত্তোরিত শ্রেণী-সমাজের সকাল থেকে আজকের ভরু মণ্ডলদের সন্ধ্যাত্তীর্ণ সময় পর্যন্ত ব্যাপৃত....একই কায়দায়-নিয়ম ও কৌশলের পথ ধরে। হাতে বিষের ভাণ্ড।

অথচ বিশ্বাসযোগ্য ঐন্দ্রজালিক মায়ায় তোমাকে বোঝানো হয়—না-না। বিষের ভাণ্ড কেন হবে? এ হলো অমৃতের ভাণ্ড।

এই-ই অমৃতভাণ্ড। সুধা। এতে তোমার সুখ। শান্তির সন্নিবেশিত ঐশ্বর্য। তোমার দুঃখহরণের অবিনাশী মহার্ঘ্য।

পাথরও তো ঘামে। যে কারণেই হোক। পাথরের বুক চিরেই ঝর্ণাধারার উচ্ছৃত প্রবাহ। সেও যে নিয়মেই হোক। প্রবাহটাতো মিথ্যে নয়?

টিয়ার পাথরস্থ মনও একদিন বাষ্পীভূত হয়। মেঘ জমে, ঘন কালোবরণ বৈদ্যুতিক ঝিলিক সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়। তীব্রতায়। একদিন সে কাঁদে একটু একটু ক'রে। তারপর চারদিকের শূন্যতা যখন তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, তখন সে কাঁদে হাহাকার ক'রে।

সন্ধ্যার ছায়ায় বিষের ভাণ্ড হাতে মূর্তিমান ভরু মণ্ডল। ঠোঁটের তটরেখায় অমৃতের সন্ধান ঐন্দ্রজালিক। অজস্র প্রেমময় সান্ত্বনা তার প্রতিটি কথায়। চোখে জলের ছোঁয়া নদী হতে চায়।

অন্তহীন মরুভূমিতে ভরু মণ্ডল নামক মরীচিকাকে মরুদ্যান বলে ভুল করে টিয়া। তার উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ অবলম্বন চায়—কাকাবাবু, আমার তো কেউ নাই। কে আমারে দেখবে। আমি তো বিষয়-আশয় বুঝি না। চিনিও না। জানিও না। বাবা আমারে এ কোন্ সাগরের মধ্যে ফেলায়ে গ্যালো কাকাবাবু।

ভরু মণ্ডল হুক্ হুক্—ছুক্ ছুক্ শব্দ সৃষ্টি করে জলভরা নাকে। নাকে তার জল। চোখ তার ভেজে না। কিছুতেই ভেজে না। গ্রীনরুমের শেষ রিহার্সেলেও পরখ ক'রে দেখেছে, চোখে জল আসছে। বেশ ভাল পরিমাণেই কিন্তু মঞ্চে তার উল্টো প্রতিফলন। প্রাণপণে ধুতির খুটে চোখ আড়াল করতে হয় অভিনয়টাকে হৃদয়স্পর্শী, মর্মস্পর্শী করতে। ধরা গলায় বাধো বাধো স্বর। আটকে যাওয়া কথা····ওমা, অমন ক'রে কাঁদিস-নারে মা জননী। ডাক্তারবাবু নাই। আমি তো আছি। আর মাথার উপুরি আছে ভগবান। বিশ্বাস হারালি মানুষ দুব্বল হয়া যায়। দেহ-মন নষ্ট হয়, ক্ষয় হয়, ওহ্···এই বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে মণ্ডল।

টিয়া তার বুকে কাঁপন টের পায়। পরিবর্তনের হাওয়া তাকে বিভ্রমের অতল খাদে ক্রমশঃ নিমজ্জিত করে। অদৃশ্য ইন্দ্রজালের আড়ালে দাঁড়িয়ে কোন্ এক বংশীবাদক যেন বলে ওঠে ফিস্‌ফিস্ ক'রে—ভরু মণ্ডলকে বিশ্বাস করো। তোমার বাবার শেষকৃত্যে যে স্বেচ্ছায় পাঁচ হাজার মানুষকে মহোৎসব ক'রে খাওয়ালো। ঘটা ক'রে শোকসভা করলো—আইন সভার সদস্যকে সভাপতি ক'রে খবরের কাগজে তার সংবাদ ছাপা হলো।

মনে মনে মোমের মতো গলে গলে পড়লো টিয়ার অবিশ্বাস। ক্রোধ। ঘরের বাইরে আঁধারের ঝিল্লিমুখর রাত। টিয়ার মাথায় হাত ছোঁয়ায় ভরু মণ্ডল।

নির্জন গৃহকোণে এক বৃদ্ধের শোকবিহ্বল চালচিত্রের সামনে নতজানু টিয়া দ্বিধাহীন হয়ে বিস্মৃত হলো, সুদূর অতীতে আমবাগানের সেই নৃশংস রুমাল

উপহারের দৃশ্যপট। ওই একটা ঘটনার উৎস ধরে তার তাড়াহুড়ো বিয়ে। বৈধব্য। পাহাড়ের ভারে নষ্ট হয়ে যাওয়া তার জীবনের কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা। তার সবকিছুর মূলে এই বৃদ্ধ। এই দাম্ভিক লম্পট—মিথ্যেবাদী লোকটা।

: টিয়া।

টিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ভরু মণ্ডলের বুকে। তুল্‌তুলে নরম বুকটাকে সবেগে নিজের শরীরে জাপটে ধরতে দ্বিধা করে না ভরু মণ্ডল। তার সমস্ত শরীরে দাউ দাউ আগুনের জ্বালা শুকনো ফুটি ফাঁটা তৃষিত শরীর বিদ্রোহ ক'রে করে। তোলপাড় করে। টিয়া-টিয়া বলে বিষের ভাণ্ডের ঢাকনা উন্মোচন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে যায়।

কিন্তু সাবধানী ভরু মণ্ডল সীমার পরিধি সম্পর্কে সচেতন।

বংশপরম্পরায় ভরু মণ্ডলরা সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

প্রয়োজন না হলে লঙ্ঘন করে না।

লঙ্ঘন করার জন্যে পথ তৈরী করার সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন ক'রে তারা সীমা অতিক্রম করে। তখন বাধা দাও, সে বাধাকে তারা পরোয়া করে না। তুমি তখন তার কাছে পতঙ্গ। দুর্বল হলে অনায়াসে পদদলিত ক'রে পিষে মেরে ফেলে।

মানবিকতা?

হাহ্‌হা। তুমি তাহলে গাণ্ডুরাম গ্রাণ্ডসঙ্গের সদস্য।

ওই যে, একটা হলেও, আসল কথাটা বলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—"বাঘ বাঘকে খেয়ে ফুলে ওঠে না, মানুষ মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।"

ভরু মণ্ডলরা সেই ফুলে ফেঁপে ঢোল হওয়ার জাত।

সে আশ্বাস দেয় টিয়াকে আলিঙ্গন মুক্ত ক'রে—জগজ্জননী মা কালী করালিনী নৃ-মুণ্ডমালিনী মা শ্যামা আমাগো সাতপুরুষের বিগ্রহ। বাড়িতি পুরুত বাঁধা আছে। নিত্যি-রোজ মায়ের ভোগার্চনা হয়। সাত তল্লাটের মানুষ জানে—মণ্ডল বাড়িতে মা আমার জেবন্ত। আমারে তুমি সেই জগজ্জননীর নামে ভরসা করতি পারো। ডাক্তারবাবুর ফ্যালায়ে যাওয়া সয়-সম্পত্তির একটা খড়-কুটাও আমি নষ্ট হতি দেবো না। কার-কয়ডা মাথা আছে ঘাড়ে—তুমার জিনিসি হাত ছোঁয়ায়?

টিয়া অভিভূত আবেগে মণ্ডলের পায়ের ধুলো মাথায় ছোঁয়ায়। শরীরে

তার শক্তির জাগরণ অনুভব ক'রে পরম আহ্লাদে বলে—বাবার ডিসপেন্সারির সাথে একখানা দো-চালা হাত চল্লিশেক ঘর উঠাতে চাই কাকাবাবু।

: অত বড় ঘর ক্যা মা ?

: ইস্‌কুল বানাবো।

: বাঃ বাঃ। খুব ভাল কথা গো মা জননী।

: অঢেল সম্পত্তি বাবার। কি হবে ফেলায়ে রেখে।

: খুব ঠিক কথা মা। আহা, আমি আমার জান-প্রাণ দে বানায়ে দেবো।

: আমিও মাস্টারি করবো।

: তাতো কৈরবেই মা।

তো ভরু মণ্ডলের রাত নেই, দিন নেই, সময়—অসময় নেই টিয়াকে দেখতে আসে। কত যে কথা। ফুরোয় না। এইভাবে একটু একটু ক'রে টিয়ার মুখে হাসি ফোটে। বুকের ভার হালকা হয়। চোখের নিচে ক্লান্তির ছায়া মুছে যায়।

ভরু মণ্ডল টিয়ার অসতর্ক মুহূর্ত তার লোভী কুকুরের চোখ দিয়ে দেখে। টিয়ার চোখ ম্যাগাজিনের পাতায় নিমগ্ন। আঁচলটা আগোছালো। বুকের নিটোল কায়া জামার ফাঁকে উন্মুখ। গভীর নিঃশ্বাসে হাপরের টানে ঢেউ খেলছে মসৃণ একটা প্রলোভন।

আয়। আয়। আয়।

ডাকে। ডাকে। হাতছানি দেয় নিজের রিরংসাক্রান্ত মন।

একটু একটু ক'রে এগোয় ভরু মণ্ডল।

পায়ে পায়ে।

নিঃশব্দে। বেড়াল পায়ে।

টিয়া চোখ তুলে তাকায়। চকিতে কাপড় সামলাতে সামলাতে দেখে ভরু, মণ্ডলের হাতে এক ফানা শবরী কলা। হলুদ-পরিপুষ্ট।

মণ্ডল নিজেই চেয়ার টেনে বসে। হাসতে হাসতে বলে—ইসকুল ঘর তোলার ব্যাপারডা সব ঠিক-ঠাক কৈরে ফ্যালাইছি আজ।

আনন্দে শিশুর মতো নেচে ওঠে টিয়া—কবে শুরু কৈরবেন তালে ?

: এই দিন-পুনারোর মদ্দি।

: খুব ভাল কথা।

: মাগো, তুমার মুখে হাসি দেখলি আমার যে কী আনন্দ হয়··· । দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণ্ডল। তারপর কলার ফানাটা বাড়িয়ে ধরে বলে—রাখো।

: না-না। রোজ রোজ আপনি শুধু শুধু অ্যাত্তোসব আনেন ক্যা··· ।

অমনি বিষণ্ণ দেখায় ভরু মণ্ডলের মুখ। যেন তার জীবনে এত্তবড় দুঃখের কারণ আর কখনো ঘটেনি। কলার ফানাটা মেঝেয় রেখে দিয়ে বলে ওঠে ভাঙা গলায়—মনের মধ্যি যখন এই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে মা তুমার, তালি তো আর আসা যাবিনে।

শুনে টিয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সে ছুটে গিয়ে কলার ফানা তুলে নিয়ে টেবিলে রাখে। তারপর নিজের অপরাধ খণ্ডনের স্বরে বলে—না-না। সে কি কথা। আপনে না আলি আমার কি গতি হবে কাকাবাবু।

কথা বলতেই গলা ভিজে যায়। চোখ ছাপিয়ে জল আসে। তাই দেখে ছুটে আসে মণ্ডল। টিয়ার মাথায় অবলীলায় হাত রেখে কাছে টেনে নিয়ে বুকে বুক রেখে সেও কেঁদে কেঁদে বলে—ওরে, মা আমার জগজ্জননীর মতো অভিমানী। কাঁদিসনে, কাঁদিসনে। আমি তালে গলায় দড়ি দেবো।

টিয়া কাঁপে ভরু মণ্ডলের বুকের ভেতরে।

দু'হাতে টিয়াকে সরিয়ে তার মুখটা নিজের সামনে দর্পণের মতো মেলে ধরে নির্নিমেষ চোখে দেখতে দেখতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ভরু মণ্ডল—তুই আমার জগজ্জননী। তোর সব সাধ পূর্ণ করার জন্যি আমি আমার জেবনডা সঁপে দেবো....।

ভরু মণ্ডলের গাল বেয়ে চোখের জল গড়ায়।

হারিকেনের আলোয় টিয়ার মুখটাকে মনে হয় চিত্রপট। আচম্‌কা-'মা'-'মাগো' বলে ভরু মণ্ডল টিয়ার ঠোঁটে চুম্বন করে।

কাঁপে। কাঁপে।

হু হু হাওয়ায় কাঁপতে থাকে টিয়া।

মণ্ডল সীমার পরিধি ধরে রাখে। রেখে টিয়াকে খাটে বসিয়ে দিয়ে চিবুক নেড়ে বলে—তুই আমার পাপ ধুয়ে দিলি মা। জেবনে অনেক অন্যায়-পাপ করিছি। এই বুড়া বয়সে তোর পুণ্যের কাছে নিজেরে জড়ায়ে প্রাচিত্তি করবো। ইবার।

কাঁপছে টিয়ার অন্তরাত্মা তখনো।

আচম্‌কা এই চুম্বন নারীত্বের রুদ্ধ দরোজা-জানালায় কী কড়া নেড়ে দেবার ইঙ্গিত? না। না। ভরু মণ্ডল তার পিতৃতুল্য। পিতৃস্নেহের আবেগে এই চুম্বন তার কাছে আশির্বাদের মতো। অন্য কোনো মানে খুঁজতে যাওয়া পাপ। পাপ। পাপের পঙ্কিলতায় অবগাহনের মতো ক্লেদাক্ত।

ধুয়ে যায় মনের জমাট গ্লানি। ভরু মণ্ডল পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করতে করতে বলে—তশিল অফিসে গিছিলাম। তশিলদার আইন দেখায়। হ্যানা-ত্যানা নানারকম ফন্দি। আসল কথা তো সিকি বিড়ি চাই। ঘুষ। আমার খুব রাগ হয়া গ্যালো-মা। কলাম, আমার মা-জননীর একলাটি সোময় কাটেনা। নিজের ভিটেয় বিনে পয়সায় ইসকুল খুলবি। সরকারের উচিত দুই হাতে সাহায্য করা। তো আপনি অত আইন দেখান যে? এগাঁয়ে ওসব ধানাই-পানাই চলবিনে। তো এট্টু ঠাণ্ডা হয় তশিলদারবাবু। তবু কৈলো ভবিষ্যতে সরকারী সাহায্য পাত্তি হলি আইন মাফিক চিঠি পত্র দিত্তি হবে, আর বসত ভিটায় ইস্‌কুলের বাড়ি বানাত্তি হলিও পারমিশন নিত্তি হবে। আমি কলাম—কি নিয়ম কানুন তাতো আমাগরে জানা নাই। আপনে সাহায্য করেন। তখন এই সরকারি ফরোম্‌ডা দে কৈলো যার জায়গা তার সই করায়ে আমারে ফেরত দিবেন। সব নাকি সেই কৈরে দেবে।

মণ্ডল একটা সত্তর টাকা দামের ননজুডিশিয়াল ফর্ম বের করে—ভারত সরকারের প্রতীক চিহ্নের জলছাপের ডান কোণে আঙুল ঠেকিয়ে দেখিয়ে দেয়—গ্যাও তো দেখি এইখানে একটা সই। দেখি তশিলদার ব্যাটার মুরোদ কতখানি।

টিয়া একবার স্ট্যাম্পের দিকে, একবার ভরু মণ্ডলের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে। মণ্ডল কলমের ক্যাপ খুলে বাড়িয়ে দেয়—কলমডা এট্টু ঝাঁকায়ে ন্যাও। কালিডা ঠিকমতো আসতিছে না।

অবশেষে মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে টিয়ার—কি কন কাকাবাবু? এযে সাদা স্ট্যাম্প।

মণ্ডল সহসা মুখটা এমন করে যে, জগজ্জননী মায়ের কৃপালাভে সে স্বর্গীয় জ্যোতিতে এই মুহূর্তে দীপ্র। মাথা নেড়ে আধ বোজা চোখে গুন গুন করে গাইতে থাকে—সকলি তোমার ইচ্ছা মাগো, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি/তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি/....গান থেমে যায়। তারপর তেমনি ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বিড়বিড় করতে থাকে— ব্রহ্মময়ী, ইসকুলডা জানি হয় মা...। সবই তো তার ইচ্ছে........

টিয়া দেখে, অবিরল মণ্ডলের মুদিত দুই চোখ থেকে জলধারা নেমে আসছে। আর অদ্ভুৎ এক জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত তার মুখমণ্ডল। গলার শিরাগুলিও অসম্ভব ফুলে উঠেছে। যেন ফেটে যাবে....

কি করবে সে ?

স্বাক্ষর করবে ? কিছু লেখা নেই যে ?

যেন নিমিলিত চোখ' মণ্ডলের কণ্ঠ থেকে স্বয়ং জগজ্জননী কথা বলে উঠলো —বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ/তর্কে বহুদূর।

টিয়া আশ্চর্য। ভরু মণ্ডলের কণ্ঠস্বর তো ওরকম নয়। এই কথা ভাবতে ভাবতেই সে ভরু মণ্ডলের কণ্ঠ শুনতে পেলো—মন সাদা থাকলি—সাদায় কুনো দোষ নাইরে বেটি।

শুনে খচ্‌ খচ্‌ ক'রে স্ট্যাম্পে সই ক'রে দিলো টিয়া।

ভয়ে ভয়ে ডাকলে'—কাকাবাবু।

চোখ মেলে স্ট্যাম্পটা হাতে নেয় মণ্ডল। গোল ক'রে মুড়িয়ে ঠোঁট মেলে আকর্ণ হেসে আবার টিযাকে আদর করে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে যায়-কলা খাস বেটি।

আল্‌গোছে ঘাড় কাত করে টিয়া। খাবে সে কলা।

কাজী পাড়ার মজনু গিয়েছিলো। অন্যদিনের মতো ডাক্তারের বাড়িতে দুধ দুইয়ে দিতে। একজন হিন্দুস্থানী বহুদিনের পুরনো মুনিষ রাম ভকত্‌ ওর জ্বর বলে মজনু যেতো দুধ দুইয়ে দিতে। কাজী মজনুর কাছে খোঁজ-খবর নিতেন। রামেশ্বরপুর বাজারে রাম ভকত্‌-এর সঙ্গে দেখা হলেও খবর নিতেন টিয়ার। ভরু মণ্ডল যে ওই বাড়িতে এখন দিনে-রাতে দু'চারবার যাতায়াত করে, এটা-সেটা দিয়ে আসে, ঘণ্টাখানেক ক'রে বসে আলাপ আলোচনা করে, খুঁটিনাটি এসবই শুনতেন রাম ভকত্‌-এর কাছে। টিয়া খবর পাঠাতো সে ইসকুল খুলছে, বাবার ডিস্‌পেন্‌সারি ঘরের সঙ্গে আরো একটি বড় ঘর তুলে। একটা বড় ধরনের অঘটন যে ঘটতে চলেছে তা আগেই টের পেয়েছিলেন তিনি।

মজনু খুব বিষণ্ণমুখ নিয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিলো। টিয়ার এই প্রথম চিঠি। কম্যুনিস্ট পার্টির মুকুন্দ সাহা ডেকেছিলেন পার্টি অফিসে কি আলোচনা আছে জরুরী। সন্ধেবেলা সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি। এই সময় পথে মজনুর সঙ্গে

ক্রোধ—৬

দেখা। তিনি ভাবতে পারেননি টিয়া চিঠি লিখবে।

: কার চিঠিরে?

: টিয়া দিদির।

একটা এলোপাথারি বাতাস। কাজীর বাবড়ী চুল সে বাতাসে এলোমেলো হয়ে তার কপালে জেগে ওঠা বিস্ময়ের ভাঁজগুলি ঢেকে দেয়। হু হু করে অতীত, সুদূরের বাঁশী হয়ে বেজে ওঠে হৃদয়ের নিভৃতে। ছেলে ভুলানো ছড়ার মতো এলোমেলো ঝক্ ঝক্ ছন্দের দোল্ দোল্। কেন? নাম তার টিয়া হলো কেন? টিয়ার মতো লাল ঠোঁট, টিয়ার মতো রাঙা করতল। ছট্‌ফটানিও যে তেমনি। আমবাগানে, পেয়ারা বাগানে দস্যিপনা। গাছ থেকে কোচড় ভরে ডাঁশা পেয়ারা নিয়ে লাফিয়ে পড়ে ছুট্ ছুট্ ছুট্। একদিন না, দু'দিন না, প্রায়ই লেংচে লেংচে হাঁটতো। চোট্ লেগেছে পায়ে। লাগবেই তো। অত যে দস্যিপনা।

একবার ন'দশ বছরের সময় ওর হাঁটুর ওপরে ডাক্তারবাবু নিজে তিনটে সেলাই করেছিলেন। এক-দোকা-নাকি গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে একটা ভাঙা বোতলের কাচ ঢুকে গিয়েছিলো। সেকি রক্ত। চিৎকার চেঁচামেচিতে এক হাট মানুষ।

সেই মেয়েটি এখন পাথর। গম্ভীর। কোথায় হারিয়ে গেলো তার কুসুম নরম হৃদয়ের সেই আলোড়ন। সেই ছট্‌ফটানি অস্থিরতা। প্রজাপতির পাখনামেলা চাঞ্চল্য। চিরকাল যে একরকম চলে না। তার অতীত আঁধার। তার বর্তমান আঁধার। তার ভবিষ্যৎ অতল আঁধারের গহ্বরে নিমজ্জিত। তাকে সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। মনটা আকুলি-বিকুলি করে।

সামনে যে প্রাচীর?

প্রাচীরের গায়ে পেরেক ঠোকা নিষিদ্ধ এক ফলক উৎকীর্ণ।

নিষেধ, তোমার প্রবেশ নিষেধ হে।

তবু তার চিঠি আজ হাতের মুঠোয়। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পার হয়ে একটু একটু ক'রে পরিবর্তিত সমাজের জটিল কাঠামোর বৃত্তে বিচরণ করতে করতে ফেলে আসা অতীতের জন্যে মনটা কেমন কেমন করে।

কতই তো বিচিত্র, কিংবা বৈচিত্র্যহীন ঘটনার সাক্ষী তিনি নিজে। তবুও সেই একটা মুহূর্ত তার মানসপটে খোদাইকরা কারুকার্যের দুঃখময়, আনন্দময় ভাস্কর্য হয়ে আজো অম্লান হয়ে রয়েছে।

এক কিশোরী এসেছিলো প্রদোষোত্তীর্ণ আলো-আঁধারীর ছায়ায় ভুরে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আমবাগানের চাঁদ না ওঠা সময়ে। আপন হাতে ফুল তোলা রুমালের উপহার দিয়ে মনের নৈবেদ্য ভালবাসার ডালায় সাজিয়ে। সে ছিলো নিষ্কাম-পবিত্রতার ফুল। হৃদয়ের নিভৃত থেকে উৎসরণের স্রোত-ধারা সেই কিশোরীকে ডাক দিয়েছিলো....।

সে তখন অতীত জানতো না। বর্তমান জানতো না। ভবিষ্যৎ তার চেনার বাইরে ছিলো। সময়টা যখন ভালবাসা ভালবাসা বলে কাঁদে, তখন সে হিন্দু চেনে না, মুসলমান চেনে না। সে তখন আবেগ তাড়িত নিজের আবিষ্কৃত মানবিক ভালবাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আবেগ কি শুধুই আবেগ? বাস্তবতা বিবর্জিত?

তাই কি? একেবারেই মূল্যহীন তা?

মনোবিজ্ঞানীরা কি বলে, জানেন না তিনি। জানার সুযোগও তো এ জীবনে হলো না। টিয়াতো সেদিনের প্রদোষোত্তীর্ণ আম্রকুঞ্জের সবুজের সাথে একাকার হতে এসেছিলো। যে সবুজ কোনো শিল্পীর অ্যাকাডেমিক রংচর্যার ফসল ছিলো না। প্রকৃতির অকৃপণ হাতের তৈরি সেই রঙে ছিলো মাটি মানুষের যূথবদ্ধতা।

কিন্তু এখন মনে হয়, ভালবাসার উপহার দিতে এসে টিয়া সেদিনই অতীত চিনেছিলো। বর্তমান চিনেছিলো। অবাক দু'চোখে জলের ধারা বইয়ে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছিলো রাহু আচ্ছন্ন কঠিন ভবিষ্যতের নিষ্ঠুরতা। কিশোরীর চোখ মেলে দেখেছিলো মানুষে মানুষে কি দুস্তর ব্যবধান। বুঝেওছিলো—গভীর বিষাদে, এই সমাজে মানুষের কি কদর্থ! শুধু হিন্দু-মুসলমান আর তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কেন? কেন? কেন?

এক দেশে জন্ম। এক দেশে কর্ম। এক দেশে মানুষ। এক বিদ্যালয়ে পাঠ। ধানে-গমে চালে-ডালে মাছে-মাংসে দুধে-ঘিয়ে সব্‌জিতে সমান আকর্ষণ। তাদের মধ্যে এ ব্যবধান কেন।

ডাক্তারবাবু অত যে দেবতুল্য মানুষ, সেই তিনিও তো সমাজ নামক ভরু মণ্ডলদের চাপে বা ভয়ে, তাকে লেখাপড়ায় শেষ পর্যন্ত আর সাহায্য করলেন না। হৃদয়ের ভালবাসা নীরবে হারিয়ে গেলো। সেই সাথে আর একজনের গভীর আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে গেলো চিরতরে। না, এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ তার নেই। ডাক্তারবাবুকে দোষও দেন না। সেই যে টিয়াকে উদ্ধার

করেছিলেন কৃয়ো থেকে, তার বিনিময়ে তিনি তো কোনো দান চাননি। চেয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর নৈকট্য। তার সস্নেহ ছায়া। তা তো তিনি পেয়েওছিলেন। তারপর অতবড় মানুষটা একদিন কেঁদে ফেলেছিলেন শিশুর মতো।

: জাফর দুনিয়ায় ধর্মটা যদি না আইসতো, তালে হয়তো বা মানুষ খানিকটা শান্তিতে থাকতি পাইরতো রে। কি হতিছে এ সব? কলকাতায় রক্তের বান। নোয়াখালীতে রক্তের হোলি খেলা। কিসির এ স্বাধীনতা? এ স্বাধীনতার মানে কী? লড়াই হবে ইংরেজের সাথে। তাতো তেমন জোরের হৈলো না। আমরা দেশোয়ালীরা নিজিরা মারামারি কাটাকাটি করতিছি। ইংরেজ মসনদে বসে হাততালি দিতিছে। হাসতিছে মজা দেইখে দেইখে। দেখিস একদিন আমাগরে বিবেক জাইগা উঠলি আফসোসের অন্ত থাকপিনে।

সেও একটা সময়। দাঙ্গা। আগুন। রাম রহিমকে মারছে। রহিম রামকে খতম করছে। তো চারণ কবি মুকুন্দ দাসের প্রাণ হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। গান বাঁধেন তিনি—রাম রহিম না জুদা করো ভাই, মনটা খাঁটি রাখোজী…।

কে কার কথা শোনে। তবু যেসব জায়গ' সেসময় মুকুন্দ দাসের পদ-চারণায়—তার বজ্রকঠিন কণ্ঠের ডাকে উৎরোল হয়ে উঠেছিলো সেসব এলাকার হিন্দু-মুসলমান-চাষী-তাঁতি-কামার-কুমোরেরা দাঙ্গার কথা শুনে পরস্পরের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছে। তারা কেউ কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। মন দুঃখের গভীরতায় বিদ্ধ হয়েছে বারবার।

পার্বতী ডাক্তারও নির্ভুল ছিলেন না। নিজেকেও তো কাজী তা মনে করেন না। কোনো মানুষই নির্ভুল নয়। তবু গুণের পাল্লাটা ভারী হলে দোষের পাল্লাটা হালকা হয়ে যায়। দোষটাকে কেউ বড় ক'রে দেখে না। পার্বতী ডাক্তারের গুণের পাল্লাটা ভারী ছিলো তিনি গান্ধীবাদী ছিলেন। খদ্দর পরতেন না। বলতেন—ওটা বাইরের অভিনয়রে। খদ্দর পরলি দেশপ্রেমিক হবো, দিশি হবো, আর না পরলি ইংরেজের দালাল, এ সব আসলে দেশপ্রেমের প্রমাণ না। দেশপ্রেম প্রাণের জিনিসরে। পোশাকে হয়তো রুচির পরিচয় থাকে। তো সে হতিছে, যার যেমন রুচি। গান্ধির সবকিছুই কি খাঁটি জিনিস? তাও না। গুণ যেমন তাঁর, দোষও তার তেমন।

কাজী শুনতেন।

বলতেন ডাক্তার ঘর ভর্তি রোগীর সামনে।—আমাগরে নেতারা এখন গান্ধীর শিষ্য হওয়ার জন্যি রাতারাতি স্যুট কোট ছেড়ে গান্ধী টুপি মাথায় তোলার রেস শুরু কৈরছে। গরিব মানুষরা কিন্তু এসব বোঝে না। তাগরে প্রশ্ন পেট-ভাতের।

কাউকে ইন্‌জেকশন পুশ করতে করতে তির্যক চোখে তাকাতেন বসে থাকা নিরীহ মুখগুলির দিকে—গরীবরা তো হাবাগোবা। কই-বিড়লা টাটা কি-আদমজী ইস্পাহানীর বুকে চাকু মারতি গিছে? যায় কারা? হাবা-গোবা গরীবরা। যায় কি জন্যি? ওই টাটা বিড়লা আদমজী ইস্পাহানীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। আদমজী-ইস্পাহানীর দরকার আলাদা একটা দেশের। সেখানে টাটা-বিড়লা থাকপিনে। তাগরে রাজত্বি করতি, লুণ্ঠন করতি সুবিধে হবে। সেই জন্যি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যি দাঙ্গা বাঁধায়ে দেখাতি হবে, দেশ ভাগ না হলি শান্তি হবিনে। আর তাগরে সাথে মদত দিতিছে কারা? এ দাঙ্গার পিছনে টাটা-বিড়লারাও আছে। আছে বললি সবটা বলা হয় না। পুরোপুরি আছে ওরা।

: আর আমরা? কথা বলতে বলতে রাগে ডাক্তারবাবুর দুই চোখে ঘৃণার আগুন ছোটে—হাবা গোবারা—সেই ধনীগরে দালাল নেতারা মন্ত্র দিলো—লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্...তো আমরা মূর্খের দল—বন্দেমাতরম্ আর আল্লা হু আকবর ধ্বনি দিতি দিতি তেড়ে মেড়ে দাউ-খোন্তা লাঠি বল্লম-ছোরা-টাঙ্গি নিয়্যা ঝাঁপায়ে পৈড়লাম একজন আরেকজনের ঘাড়ে। নেহরু জিন্না সাহেবের কি যায় আসে? হেরাই তো ইংরেজের পরে গদিতে বৈসপে। মজা লুঠবেনে। আমরা মূর্খরা ভুকা প্যাটে তাগরে সেলাম ঠুকপানে। এই তো রেজাল্ট?

নসিরণ এ সময় ঘরে আসেন। হাঁড়ি পাতিলে প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজতে খুঁজতে একবার ফিরে তাকান কাজীর দিকে। তার দু'চোখে ভ্রুকুটি জাগে। কি হলো? বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি মানুষটা। তার মায়া হয় খুব। ঘুমোলে ঘুমোক। দুঃখে কষ্টে জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে গেলো মানুষটা। তিনি নিঃশব্দে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন কাজী একবার চোখ মেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ফেলতে ফেলতে আবারও জুড়ে আসে তার চোখের পাতা। তন্দ্রার ঘোরে তিনি পাশ ফেরেন।

মদনের বয়স তখন বারো তেরো। তার নিজের শরীরে প্রৌঢ়ত্বের পাকা-পাকি অবস্থান। চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। তবু জীবন ও যৌবনের তেজে

দীপ্ত। মনে অসম্ভব আলোড়ন। তিনি হাজার দুঃসহতায় আক্রান্ত হয়েও মনের শক্তিতে ধরে রাখতে চান জীবনের তারুণ্য। টিয়ার চিঠি হাতে নিয়ে সেই তারুণ্যের প্রেরণায় তিনি বারোয়ারীতলায় সেই বুড়ো বটবৃক্ষের নিচে এসে বসলেন।

দূরে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। সকলকেই তিনি চেনেন। কে একজন পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে আদাব দিলো। তিনি মাথা নাড়লেন। মাঠ থেকে গরু চরানো শেষ ক'রে চাষীরা ফিরে যাচ্ছে ঘরে। একটা ফুটফুটে চার পাঁচ বছরের মেয়ে খানিকটা দূরে একা একা ঘুরছে। প্রজাপতি হচ্ছে দু'পাশে ডানা মেলে। ছুটছে। দাঁড়াচ্ছে। ঘুরপাক দিচ্ছে। বাঁশীর জোর শব্দ শুনলেন। গোল···গোল চিৎকার।

একপক্ষ গোল দিয়েছে।

তারই কোলাহল। আনন্দধ্বনি।

ডানদিকে হরিপদর টিম্ টিম্ ক'রে খুঁড়িয়ে চলা মুদিখানা। তার সামনে বাঁশের বাখারি দিয়ে বেঞ্চ। দু'একজন খদ্দেরকে দেখা যাচ্ছে। ওর পাশে একটা চায়ের দোকান। কুঞ্জ বাগ্‌দির। 'অচ্ছ্যুৎ' বলে অচল। বাগ্‌দিদের 'জল অচল'। দোকানটা বন্ধ। কুঞ্জ বাগ্‌দি ইটভাটার কাজে বসিরহাট চলে গেছে। অনেকদিন দেখেন না। ওর বউ এসেছিলো-রিলিফের দরখাস্ত লেখাতে। লিখেও দিয়েছিলেন।

দীর্ঘশ্বাসটা কখনো কাউকে জানান দিয়ে আসে না। আচম্‌কা বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে। এখনো এলো।

কিছুতেই তিনি চিঠিটা খুলতে পারছিলেন না। কেন? তাও জানেন না। কোথায় যেন একটা দ্বিধা, সংকোচ তাকে ক্রমশ দুর্বল ক'রে দিচ্ছিলো। একটুকরো চিঠি। কে জানে, কি আছে তার মধ্যে। মজনুটাতো কিছু বললো না। চলে গেলো চিঠিটা দিয়েই। মজনুরা কি জানে, টিয়া একদিন তাকে একটা ফুল তোলা রুমাল উপহার দিতে এসে সারাজীবনের মতো নিঃসীম অন্ধকারকে বরণ করেছিলো?

না। আপনমনে সান্ত্বনা পেতে চাইলেন তিনি। সেতো অনেককাল আগের কথা। মজনুর তখন জন্মই হয়নি।

চার ভাঁজ চিঠিটা।

একটা ভাঁজ খুললেন। সম্বোধনটা চোখে পড়লো—'হে পাষাণ।'

নিজের ভেতরে ভূমিকম্প হয়ে গেলো কাজীর। কেন তিনি' হে পাষাণ' ? কেন ? এতদিন পরে, কতযুগ পরে কেন 'হে পাষাণ' বলে ডাক দিয়ে ওঠে কিশোরকালের অবরুদ্ধ অভিমান ?

শুরুটা বজ্রপাতের মতো বাকরুদ্ধ ক'রে দেয়।

বিবেক দংশনের জ্বালা অগ্ন্যুৎপাত হয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিরা উপশিরাকে ঝিম্ ধরিয়ে দেয়।

কাজী তো কখনো বিমূঢ়তাকে প্রশ্রয় দেননি। নিজেকে বাঁধলেন শক্ত হাতে তিনি। না। না। একি বালখিল্য আবেগ! এ তো তাকে মানায় না।

তিনি মোল্লা-মৌলবিদের 'কাফের' অপবাদও সহ্য করেননি। হিন্দুদের ন্যাওটা, দালাল হয়েছেন কতবারই তো। পীর বংশের কলঙ্ক বলে ফতোয়া জারি করেছে ওরা। একবার ঈদের নমাজ আদায় করতে মসজিদে ঢুকতে দেননি ইমাম সাহেব। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, কাজী যদি জামাতে হাজির থাকে তো তিনি অন্য জামাতে ইমামতি করবেন। কাজী সেদিন নত মস্তকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। একটা আনন্দের দিনকে তিনি মাটি করতে চাননি।

শুধু আপনমনে কাজী নজরুলের দুটি পংক্তি তার বিবেককে ঝোড়ো মাতামাতিতে অস্থির ক'রে তুলে'ছলো। নজরুল, তুমি কি জাফর কাজীর পরিণতির কথা জানতে ? আমার পিতৃপুরুষের গড়া মসজিদ থেকে আমাকে মোল্লা সাহেব বিতাড়িত করলেন। তোমার মতো আমি যদি বলতে পারতাম, কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় / ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের তালা দেওয়া যত দ্বার....।

সংযত কাজী আত্মস্থ করলেন নিজের অস্থিরতা।

চিঠিটা মেলে ধরলেন—

সেই যে তুমি পালিয়ে গেলে নিষ্ঠুর নিয়তিবেশী ভরু মণ্ডলের হাতে মার খেয়ে, এ জীবনে তোমাকে আর আমার উপহার দেওয়া হলো না। এ যে কী কষ্ট গো...। এতো বছর পরেও একটা দিনও তোমাকে, শুধু তোমাকেই একলাটি পেলাম না। বাবার শ্মশানযাত্রায় তোমাকে কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। জানি তুমি শশ্মানেও গিয়েছিলে। রাম ভকত্-এর মুখে শুনেছি, তুমি সবার চলে যাওয়ার পরেও সেখানে ছিলে।

সেই তুমি বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এলে না। তারপরেও না। একদিন তুমি কুয়ো থেকে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে উদ্ধার করেছিলে। বাবার মৃত্যুর পর, আমি তো সমুদ্রের মাঝখানে পড়েছি। একবারও মনে পড়লো না? ভরু মণ্ডল ঈশ্বরের ছদ্মবেশে আমাকে ভুলিয়ে অনেক টাকা দামের একটা স্ট্যাম্পে সই নিয়ে গেছে, আর আসে না। খবর না পেয়ে আমি দেখা করেছিলাম। সে আমাকে কোনোরকম পাত্তাই দেয়নি। আমাকে যেন চেনেই না। বলে দিয়েছে, এখন ব্যস্ত, সময় হলে দেখা করবে।

জাফরদা, লোকের মুখে শুনতে পেলাম, বাবার শ্রাদ্ধ শান্তির জন্যে আমি নাকি দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছি। আর সেই স্ট্যাম্পে উল্লেখ আছে সারা জীবন আমি আমার ভরণপোষণ, ও দেখাশোনার জন্যে বাবার অস্থাবর সম্পত্তি তার কাছে বিক্রি ক'রে দিয়েছি। এর মধ্যেই আমাদের জমির ফসল সে কেটে নিয়ে গেছে। আমবাগানের ফলফলাদিও নিয়ে যাচ্ছে। দামী দামী গাছ কেটে ফেলছে। আমি কী করবো? কার কাছে যাবো? তিমিরপুরের হিন্দু-মুসলমান সকলে তোমাকে মানে, আমাকে বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়টুকু উদ্ধার ক'রে দাও। আজই একবার আসবে। না, কোনো অন্যায় প্রশ্রয়ের জন্যে তোমাকে বিব্রত করবো না। যদি না আসো তাহলে অন্তত শ্মশানযাত্রায় সামিল হোয়ো শেষবারের মতো।

বজ্র'হত কাজী চোখ খুলে তাকালেন সামনের দিকে। ফুটবল খেলার শেষ বাঁশী বাজে। ছেলেরা হৈ হল্লোড় ক'রে চলে যেতে যেতে তার সামনে এসে থমকায়। চারদিক থেকে কিশোর-কণ্ঠের নমস্কার নমস্কার গুঞ্জনে কাজীর দু'-চোখে খুশির হাসি জাগিয়ে তোলে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে বিদায় জানান।

ওরা চলে যায়। চলে যায় অজস্র শব্দাবলীর সমাহার ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

কে একজন হিন্দি সিনেমার গান গাইছে। ও দুনিয়া কি রাখোয়ালে... শুন্ দরদ ভরা মেরে নালে।

বিকেলের ছায়া ডানা বিস্তার করছে ক্রমশ। বুঝতে পারা যায়, এই ছায়ায় ঢুকে যাবে রাত্রির জমাট অন্ধকার। ঝুপ ক'রে চুপি চুপি ঢুকে পড়ার অপেক্ষা শুধু।

অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। হাঁটতে লাগলেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, বণিকের মানদণ্ড, চিরকালই রাজদণ্ডে পরিণত হয়। মানদণ্ডটা

বিরাট এক ফাঁকিবাজির ফানুস। মানুষের চেতনাকে বে-পথ্ ক'রে মানদণ্ড একদিন খড়্গে রূপান্তরিত হয়। আক্রমণ ক'রে বসে সরাসরি। তখন তার মান-সম্মান, অপবাদ-অপমানের পরোয়া নেই।

আঁধার তখনো আঁধার হয়নি। ঘোর হয়ে আসছে একটু ক'রে। এ দিকটায় পাখিকুলের কাকলি খুব প্রকট। ঝোঁপ-ঝাড়ে, বড় গাছে, বাঁশবাগানে কেবলই পাখি। তার নানা ধরন। পানকৌড়ি, ডাহুক, শঙ্খচিলরা যেমন আছে, তেমনি আছে মানুষের মধ্যে আনাগোনা করা প্রতিদিনকার চেনা পাখিরাও, শালিক, টিয়া, বুলবুলি, ছাতারে, হুরহুরে, কাঠঠোকরা, বসন্ত বৌরী, মাছরাঙা, ফিঙে, ধান খইরি, পান পায়রা, হরিয়াল, ঘুঘুরাও। জলপিপিদের, গাঙশালিকদেরও মহাসমারোহ সমস্ত তল্লাট জুড়ে। সন্ধ্যায় ওদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে ওঠে কোরাশের সুরে।

বঁইচির ঝোঁপ তো মাঝে মাঝেই। রাতে জোনাকীরা আলো জ্বেলে বসে থাকে। শেঁয়াকুল, সোনাকাঁটা, নাটাকাঁটাও প্রকৃতির নিজের অবদান। ছড়িয়ে বিছিয়ে যে-খানে যেমন, শিল্পীর নৈপুণ্যে সাজিয়ে রাখা।

বর্ষায় নিজের মনেই জন্ম নেয় প্রকৃতির গর্ভে ধানী ঘাস। তখন কৃষকদের স্বস্তি।

যত খুশি গরু-মোষ ছেড়ে দাও। একটুখানি নজর রাখা। দলছুট না হয়।

চড়ে-বরে পেটটা ঢোল বানিয়ে হেলে দুলে দুল্‌কি চালে ঘরে ফিরে যাবে।

যত দুঃখ, তত আনন্দও। যত নেই, তত আছেও।

ধুতির খুঁটে অসংখ্য সোনাকাঁটা। পায়ে বেঁধে।

এখন কোনোদিকে তো খেয়াল করার সময় নেই।

শেঁয়াকুল ঝোঁপ আগে ছিলো না ডাক্তারবাবুর বাড়ির সীমানায়। এখন গজিয়ে উঠেছে শাসনহীন রাজত্বে। বাঁদিকে একটা হিজলগাছ। দুটি কৃষ্ণচূড়া। পাতাবাহারের কেয়ারী করা সরু পথ বেয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। পাতাবাহারের দক্ষিণ পাশে ফুলের বাগান। ডাক্তারবাবুর সখ ছিলো বাগানের। নিজের হাতে পরিচর্যা করতেন।

একটা কোমল স্নিগ্ধতা ছড়ানো পথে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবার আমন্ত্রণ।

নিরাভরণা টিয়াকে দেখতে পেলেন কাজী।

শান বাঁধানো বারান্দায় দাবার শরীর আঁকা শতরঞ্চে বসে কিছু একটা সেলাই করছিলো। কিন্তু তার মনোযোগ পথের দিকে। বারবার চোখ তুলে

তাকাচ্ছিলো। সাদা-সবুজ পাড় থান কাপড়ে জড়ানো শরীর। জামাটাও। পাট করা সিঁথি। সাদা। কোনো কৃষ্ণচূড়া, কোনো পলাশ সেখানে অরুপণ ছোঁয়ায় সুখ জাগিয়ে রাখেনি।

চোখ দুটি ঠিক তেমনি। ঝকমকে। বিষণ্ণতার ছোঁয়া গভীর। যেন শতাব্দীর এক শোকাবহ প্রতীকের মূর্তিকে দেখতে দেখতে নিজের ভেতরে প্রতিবিম্বিত হলেন কাজী। কি যেন নেই। 'নেই' জিনিসটি কী? কি যেন পাওয়া হয়নি। 'পাওয়া' কাকে বলে? কি যেন তার হারিয়ে গেছে। কি হারিয়ে যায়?

বারান্দার বাঁদিকে সেই কাঠমালতী ফুলের গাছটা। গাছের বয়স বোঝা যায় তার হালকা হয়ে যাওয়া পাতায়, ন্যাড়া শরীর দেখে। দু'একটা হলুদ-গোলাপী একাকার হওয়া ফুল। দেখলে কষ্ট হয়। তুলসিমঞ্চের পেছনে সেই ডালিম গাছটাও ফলহীন। একটা ফিকে লাল রঙের আধফোট' কোঁড়ক। টিয়ার নিজের হাতে বোনা ডালিম গাছটা কি টিয়ার দুঃখে এমন নিরাভরণা? কাজী এনে দিয়েছিলেন কলমটা। নিজের বাড়ির ভাল জাতের ডালিম। খুব বড় হয় আকারে। মিষ্টিটা মিছ্রির মতো।

দেখে ডাক্তারকাকা খুব খুশি। বললেন—টিয়ারে কওগে লাগাতি। তুমি সাথে সাথে গর্তটর্ত কৈরে দিও।

কি খুশি টিয়া। কি উজ্জ্বল তার চোখ মুখ। ডাক্তার কাক দাঁড়িয়ে ছিলেন। টিযার উৎসাহের অন্ত ছিলো না। জল আনে, খোস্তা আনে, পচানো গোবর আনে। কাজী গর্ত খুঁড়েছিলেন। তারপর রোজ সকালে-বিকালে পরিচর্যা। জল ঢালায় উৎসাহ টিয়ার। দেখতে দেখতে বছর না ঘুরতেই বেড়ে ওঠা কলমের গাছে ফুল ফোটে। ফলও ধরে।

সে যে কী আনন্দ টিয়ার। তা-তা থই থই খোলসে-পুঁটির ছটফটানি। কাকিমা, টিয়ার মা তখনো বেঁচে। তিনিই টিয়াকে দিয়ে প্রথম ডালিমটা তোলালেন। আকারে বাতাপি লেবুর মতো ঢাউস। বললেন, ঠাকুরবাড়ি দিয়ায়।

স্নান ক'রে, সেজে গুজে ঠাকুরবাড়ি গিয়ে ফলটা দিয়ে এলো টিয়া। আর একটা কাজীকে দিতে বলেছিলেন কাকিমা। কাজী সেদিন হেসেই খুন। বলেছিলেন, দুর, তুই খুব বোকা। কাকিমা কলিই দিতি হবে? আমাগরে বাড়িত্তি পাঁচ-ছয়ডা গাছ। কে খায়? আমার তো ইচ্ছ্যাই করে না একদম।

অমনি টিয়ার গাল ফুলে ঢোল। রাগ।

: খাইবা না তো ঠিক?

: না কত খাবো?

: ঠিক তো?

: অঠিক কথা কবো ক্যানো?

: ঢং করো বেশি বেশি।

: মোটেও না।

: কি মোটেও না! আমি দিতেছি, তাও খাতি পারো না?

কাজী তার কিশোর বয়সের অনুপম আনন্দ ঝরিয়ে বলেছিলেন অভিমানী টিয়ার চোখে চোখে তাকিয়ে—তুই বিষ দিলিউ খাতি হবে?

ব্যস্। রাগ বলে রাগ। চোখ ফেটে জল। ফুঁসতে ফুঁসতে জবাব দেয়—আমি তুমারে বিষ দিতিছি? ধুস্।

ছুঁড়ে ফেলে দিলো ডালিমটা নোংরা জায়গায়। তারপর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে দুম্-দাম্ পায়ে চলে গেলো কাজীর সামনে থেকে।

কাজীর সেকি হাসি। খুব হেসেছিলেন। দৃশ্যটা এখনো চোখে চোখে ভাসে।

সেই টিয়া। এখন মৃদুস্বরে ডাকলেন তিনি।

: টিয়া!

টিয়া বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলো। ঝলকে-ছলকে ওঠে সারা শরীর। কণ্ঠ থেকে অপ্রস্তুত জিজ্ঞাসা বেরিয়ে আসে—কে? কে?

স্খলিত হাতের সূচ-সুতো কাপড়। দুই ঠোঁটে বিদ্যুতের ঝিলিক্। তাতে আলো নেই। শুধু কাঁপুনিটা। তার বুক কাঁপে। পা কাঁপে। কাঁপন তার কণ্ঠে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—শেষ পৈর্যন্ত এলে?

কাজী হাসেন শুভ্র ক'রে। পঁয়তাল্লিশ বছরের দীর্ঘদেহী, ছিপ্‌ছিপে দেহটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে একটুখানি। চোখের চশমাটা আঙুলের ডগায় ঠেলে তুলে শুধু বলেন—তুমি আসতি লিখছো যে।

: ও।

ঝর ঝর ক'রে অমনি দু'চোখ বেয়ে জল নামে। হয়তো নিজেকে ভেঙে পড়তে দিতে চায় না টিয়া। তাই উদ্‌গত আবেগটাকে সামলাতে দ্রুত বেগে ঘুরে যায় চোখে আঁচল চেপে।

কাজী একা।

উঠোনে আঁধার নামছে।

প্রথমটায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। বিমূঢ়তায় আচ্ছন্নের মতো। কি করবেন ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আঁধারের সামিয়ানার নিচে। কোন্ জাদুকর যেন হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহের উৎস মুখে বসে স্মৃতির নষ্টালজিয়ায় বাঁশী বাজিয়ে দেয়।

একটু পরেই টিয়া ফিরে আসে।

বুড়িমণি, নেতুরামের মা, সে থাকে টিয়ার কছে। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে সে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। নেতুরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিওন। অভাবী। কাজী ওদের জন্যে একসময় অনেক কিছু করেছেন। নেতুরামের চাকরিটিও তিনিই ক'রে দিয়েছিলেন।

বুড়িমণিকে দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি। রাম ভকত্ ডিস্‌পেন্‌সারি ঘরে শুয়ে শুয়ে কাশছিলো খুব। জ্বর ওর। সর্দি-কাশির জ্বর। ভাবলেন, যাবার সময় ওকে দেখে যাবেন। ওষুধপত্র লাগলে এনে দেবেন বাজার থেকে।

: কি করতি হবি আমারে, কও।

: আমার মাথায় কিছু নাই। কি কবো ?

: ভরু মণ্ডলের সাথে দেখা করতি হয় তালি।

: সেতো এমনিতেই তুমার শত্রু। আমার ব্যাপার নিয়ে গেলি তুলকালাম করবেনে।

: তা তো করবিই। আরো আগে খবর দিলি অ্যাতোদূর গড়াতি পাইরতো না ব্যাপারডা।

: তুমিও তো আসো নাই। পাষাণের মতো থির হয়া থইকলে।

: সে কথা থাইক। আমি তো অবাক হই, তোমারই বা বুদ্ধির বিভ্রম হয় কিসির জন্নি ? চিনতে না তুমি ভরু মণ্ডল, হারু মণ্ডলরে ?

টিয়া পায়ের আঙুলে মাটি খোঁড়ে। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনেন কাজী। যেন অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে—টিয়া বললো—বিপদে বুদ্ধির নাশ। আমারো তাই হৈছিলো। না হলি দ্বিধা-দ্বন্দ কৈরেও সই দিলাম ক্যা সাদা স্ট্যাম্পের উপরে।

হারিকেনের আলো কাঁপে।

আঁধার ক্রমশ জমাট হতে হতে ঝুপসি হয়ে যায়।

টিয়া বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কষ্টের বিষণ্ণ বিশ্বায়ণ।

নিচে কাজী।

টিয়ার খেয়াল হলো—বৈস্‌পে না? নাকি নিচে থিকেই চলে যাবে কথা কোয়ে?

কাজী মাথা নাড়েন—থাক। কাজের কথা তো হত্তিছেই।

তোমার অ্যাতো ভয় ক্যা?

কাজী হাসতে চেষ্টা করেন—ভয় করবো কিসির জন্যি টিয়া।

: ভয়ের জন্যিই তো আসো না।

: না। না। জেবনে একটা বস্তুকেই ভয় পায়া আইছি। পাপ, অন্যায় ছাড়া আর কিছুকে ডরাইনে টিয়া। অজান্তে হয়তো অন্যায় হয়া থাকপি, কিন্তু জেনে শুনে কুনোদিন পাপ করি নাই।

: বাবা তোমারে সত্যি সত্যিই ভালবাইসতেন জাফরদা।

: জানি। সেই জন্যিই দূরে দূরে ছিলাম।

একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠে কর্কশ গলায়। গা ছম্ ছম্ ডাক। লোকে বলে প্যাঁচার ডাক অশুভ। তাই কি? পাখি তার প্রয়োজনে ডাকে। ঝিঁঝিঁ পোকারাও নিষ্প্রয়োজনে ডাকে না। তাতে শুভ অশুভর কি আছে।

টিয়া স্পষ্ট ক'রে তাকায় কাজীর মুখের দিকে।

কাজী চোখ নামিয়ে নেন। বলেন—রাত হয়া গ্যালো। মুকুন্দবাবু একবার পার্টি অফিসে দেখা করতি খবর দিছেন। তোমার বিষয়ডাও উত্থাপন করবো।

: সে তুমি যা করো কৈরবে। একবার ঘরে আস্‌পে না? রাগ?

: ছিঃ টিয়া। রাগ ক্যানো। তুমি তো কোনো অন্যায় করো নাই। বরং আমি শুনে খুশি হৈছিলেম, তুমি ইস্‌কুল খুইলবে ঠিক কৈরছো। ভাবছিলাম একদিন সোময় কৈরে তুমারে শুভেচ্ছা জানায়ে যাবো।

: হৈলো কই। মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

: তা ঠিক। তবু তো মানুষের চেষ্টার কামাই নাই। একটা কথা কয়ে যাই টিয়া, যে জেবনের সমেস্যা নাই, সে জেবনের মানেও নাই। সমেস্যা না থাকলি তা মৃত। জড় অচল। তুমি আমি সকলে সংগ্রাম করতিছি সমেস্যা মেটানোর জন্যি। যেদিন সংগ্রাম থিকে সরে দাঁড়ানের কথা ভাববো, সেদিন আমাগরে আর কিছু হবে না।

: জাফরদা, তুমি আমার পাশে থাকলি—আমি চেষ্টা কৈরে দেইখতাম—মরা বাগানে আবার ফুল ফুটানো যায় কিনা।

: যায়। শক্তি, সততা, সাহস আর পরিশ্রম থাকলি পারা যায়।

: আমারও তো কোনো পাপ নাই জাফরদা।

: সমাজের পাপ। সমাজব্যবস্থার পাপে আমরা শাস্তি পাই। আমরা কতবড় আহাম্মক টিয়া, একই নদীর জল কাইটা দুই ভাগ করতি চাই। হয় কথনো? হয় না। যারা সেই পাপের পথে নামিছে, একদিন তাগরে অনেক বড় খেসারত দিয়্যা প্রায়চিত্তি করতি হবে দেইখে নিও।

ঠিক সেই সময়, সেই জমাট আঁধারের বুক চিরে একটা শঙ্খচূড় ফনা তুলে পেছন থেকে হিস্‌স্‌ ক'রে ওঠে। সাপ। বিষধর। শুধু তার দাঁতে না, সমস্ত শরীর জুড়ে গরলের মারণ প্রবাহ।

সেই সাপ কথা বলে ভরু মণ্ডলের কণ্ঠে—ফের, ফের নেড়ের বাচ্চা নেড়ে—হিন্দু বিধবার ঘরে রাত্তির বেলা। কি অভিপ্রায়? হিন্দু বিধবার ইজ্জৎ মারতি চাস?

: কাকাবাবু। কাকাবাবু। আর্তনাদ ক'রে ওঠে টিয়া।

: চোপ। চোপ পার্বতী ডাক্তারের দুলালী।

: না। না...এসব...., টিয়া কি যেন বলতে চায়। অথচ বলতেই পারে না। কথা আটকে যায় শঙ্খচূড়ের সামনে।

পঁয়ষট্টি বছরের শঙ্খচূড়। কি তার হিংস্র, কদর্য উপস্থিতি। বয়সের ভারে একটুও নত হয় না শরীর। উদ্ধত মারণ খেলায় তার শক্তির উল্লম্ফন চলে চোখে-মুখে। তার একটিও দাঁত পড়েনি। নড়েওনি ঝরে পড়ার ঘন্টি বাজিয়ে। বাঁ হাতে জাপানী অটোমেটিক ঘড়ি। নতুন মডেলের ডায়ালটা অন্ধকারেও ঐশ্বর্যের চেকনাই ছড়ায়। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে চায়, 'প্রবেশ নিষেধ-'এর সীমানা লঙ্ঘনকারীকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

শঙ্খচূড় আবার হিস্ ক'রে ওঠে—শোনো জাফর মিঞা, আমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ। হিন্দু বিধবার ঘরে রাত্তির আঁধারে আনাগোনার মানেডা আমি বুঝি। খুব বুঝি। কিন্তু বেশিদূর আইগাবার চিষ্টা করলি তুমারে আমি....। ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের মাথার চুলে ঝড়ের গতিতে আঙুল খামচে ধরে বারবার। তার ঠোঁটে ফুলে ফুলে ওঠে কদর্য রেখা—তুমার ঘরে বিবি বাচ্চা আছে। তাও পরের ঘরে নজর? মানেডা কি? নাকি হিন্দু ঘরের

মেয়েছেলের সোয়াদতা বেশি ?

: ছিঃ কাকাবাবু ছিঃ ! কি ঘেন্নার কথা। ক্যামন কৈরে কতিছেন এসব পাপবাক্য ?

টিয়া নিজেকে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। না, বশ্যতা না ভয় না, জবাবের জবাব দিতে হবে তাকে।

তখুনি তর্জনী তুলে টিয়াকে বিদ্ধ করে ভক্ত মণ্ডল তার অশ্লীল বাক্যবাণে—ওলো সুন্দরী সোহাগী রাধে, কেষ্টলীলে চালাতি পাপের কথা মনে হয় না।

: ভগবান !

টিয়ার পায়ের নিচে পৃথিবীটা ঘুরপাক খায়। সবেগে দু'হাতে নিজের শ্রুতি শক্তিকে চেপে ধরে উথ্‌লে ওঠা আর্তনাদটাকে কান্নার হাত থেকে বাঁচাতে চায়—মণ্ডল, তুমি একটা জানোয়ার। না হলি, আমার বড়দাদার মতো মানুষটারে নিয়া তুমি এ কথা কোতি পাইরতে না।

শুনে হা হা ক'রে হাসে ভক্ত মণ্ডলের বিষদাঁতগুলি—বড়দাদারে বড়দাদা। নষ্ট মেয়েছেলে, হিন্দু ঘরে দাদার অভাব আছে ? তাগরে দাদা বানালি লীলে জমে না ?

: তুমার মাথায় আমি কাটারির কোপ বসাবো মণ্ডল। ফিন্‌কি দিয়্যা রক্ত ছুটাবো....

: জানি। তাই হবি। শিশুকালে বিধবা হয়া—জোয়ানকিতা তো ক্ষয় হয় নাই। তাই এই রাত্তির জল্‌সা। এর বিচার হবি। অ্যামন বিচার যে.... থু থু ক'রে থুথু ছেটায় মণ্ডল পাথর হয়ে যাওয়া কাজীর মুখে।—তিমিরপুরের মানুষ এইরকম কৈরে থুতু দিবি তোগরে মুখে। বলে আবারও থুথু ছেটায় মণ্ডল।

কাজীর সারা মুখে দলা দলা থুথু লাগে। গা গুলিয়ে সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে ওঠে। বুকের আগুন তার মুহূর্তে মাথায় উঠে যায়। গন্‌গনে তার জ্বালা। তীব্র তার কামড়। ক্রোধ, তুলকালাম একটি ক্রোধ কাজীকে বেসামাল উত্যক্ত ক'রে তোলে। চোখের সামনে রাশি রাশি হলুদ ফুল ভেসে বেড়িয়ে অট্টহাস্য ক'রে তাকে বিদ্রুপ করে। ধিক্‌কার দেয়। কাজী, তুমি ভীরু, কাপুরুষ, তুমি দুর্বল। তুমি তো চিৎকার ক'রে বলো, তুমি হিন্দু না, মুসলমান না, তুমি মানুষ। তুমি কারো চেয়ে হীন না, কারো থেকে দুর্বল না। জন্মসূত্রে তুমি এ দেশের সমস্ত কিছুর অধিকারী।

এ সমাজ পুরুষকারের কাছে নত। তুমি তবে অমিত তেজে গর্জে উঠতে পারো না কেন? প্রতিবাদ যে করে, সে নিজে বাঁচে, সহধর্মীদের বাঁচায়। গড়ে ওঠে পাপের বিরুদ্ধে-দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ।

তবু অপ্রকাশিত ক্রোধে, শান্ত সমাহিত কাজী বলে ওঠেন—না। এভাবে বলা ঠিক না। আমারে নেড়ে কন, বিধর্মী কন, পাকিস্তানের এজেন্ট কন—সে আলাদা কথা। আপনের নিজের সমাজের একটা অনাথিনী মেয়ের নামে কলঙ্ক আরোপ অন্যায়।

গর্জন ক'রে ওঠে ভরু মণ্ডল—শালা শুয়ারের বাচ্চা, আমি অন্যায় করি।

তখুনি কাজীর মাথার আগুনটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে মুহূর্তে। ঝপ্ ক'রে খাম্‌চে ধরলেন ভরু মণ্ডলের জামার কলার। ছিঁড়ে গেলো জামাটা। মণ্ডল, আমি রক্ত মাংসের মানুষ, চিরকাল কেউ বোবা হয়া থাকতি পারে না। কেউ পারে না....।

: কি! আমার, আমার শরীলে হাত এই বলে প্রথমটায় থম্‌কে যায় মণ্ডল। কাজীর মুঠোয় তখনো মণ্ডলের জামা। একটা হ্যাচকা টানে মণ্ডলের দেহটাকে নিজের সামনে এনে গর্জে ওঠন—মণ্ডল, ক্ষমা চাও টিয়ার কাছে, না হলি, না হলি···।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে মণ্ডল। ভয় পেয়ে সে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করে—হেই তুমরা কিডা কনে আছাও গো, জাফর কাজী আমারে খুন কৈরে ফ্যাল্‌লো...। মাইরে ফ্যাল্‌লো—বাঁচাও-রে....শিগ্‌গির কৈরে আইসো...মোসলমান আমার গায়ে হাত দ্যায়....

সভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার ক'রে ওঠে টিয়া—জাফরদা, পায় ধরি তুমার। গুণ্ডারা তুমারে মাইরে ফ্যালাবে! তুমি পলাও....।

: না। কাজী পলায় না। বলে এক ঝটকায় চিৎকার করতে থাকা ভরু মণ্ডলকে ঠেলে দিয়ে ফুঁসে ওঠেন—আমি সদরের সামনে আছি। চলো-কারে ডাকপে তুমি। বলে ছুটে চলে এলেন ডিস্‌পেনসারির সামনে।

পেছনে পেছনে ছুটে আসে ভরু মণ্ডল চিৎকার করতে করতে—পলায়া যায় নেড়ের বাচ্চা, ধরো, ধরো....কিডা আছো ধরো।

কোথায় যে থাকে এত মানুষ। রাতের অন্ধকার ভেদ ক'রে চারদিক থেকে ছুটে আসতে লগেলো তারা। মুহূর্তে হুলুস্থুলু পড়ে গেলো। কেউ খালি হাতে না। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে নিয়ে ছুটে এসেছে এদিকে।

নানা প্রশ্ন তাদের উত্তেজনায় : কি ? কি হৈছে ? কেউ বলে—ডাকাইত।' ডাকাইত পৈড়ছে ডাক্তার বাড়ি।

হিজল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুকছিলেন কাজী। ভরু মণ্ডলকে উন্মাদের মতো ছুটে আসতে দেখে চারদিকের মানুষ থমকে পড়ে। ভরু মণ্ডল চিৎকার ক'রে কাজীকে দেখায়—ওই যে, ওই যে আসল ডাকাইত। এ ডাকাইত ধন-সম্পদ লুট করতি আসে নাই। হিন্দু ঘরের বিধবার ইজ্জৎ লুট করতি তার ঘরে ঢুইকেছিল। আমাগরে সমাজের আর মান-ইজ্জৎ নাই। সেই কথা কৈছি দেখে আমার অপরাধ হৈছে। ভ্যাখো, তুমরা পাঁচজন ভ্যাখো—মাইরে কিছু রাখে নাই আমারে। মাটিতে ফ্যালায়া, লাথিয়ে মাইরে, গলা টিপে, জামা কাপুড় ছিঁড়ে শেষ কৈরে দিছে...

হাওয়াটা সঙ্গে সঙ্গে গরম। সকলের চোখ হিজলগাছের ছায়ায়।

ভরু মণ্ডল চেঁচাতে থাকে—ডাক্তারের মেয়াডা ছিনালের ছিনাল। তুমরা ভ্যাখো নাই ?

তার জন্তি কি কৈরছি আমি ? জানডা দিয়া দিছি....আমারে অসৈভ্যডা কি কইছে জানো ?

: কি ? কি কইছে ?

দম্ নেয় না মণ্ডল। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠার মুখে আগুনে ঘি ঢেলে দেয়—কয়, ওই বুইড়া ভাম, মোসলমানরে আমি আমার ভাতার বানামু. তার সাথে যা ইচ্ছা করমু, তাতে তোর কিরে হারামীর বাচ্চা।...ভগবান, শ্যামা-মারে....একি শুইনল্যাম আমি আমার কানে। বলে ধপাস ক'রে মাটিতে বসে পড়ে মণ্ডল। শিশুর মতো চিৎকার ক'রে কাঁদে—মারো, আমারে তুমরা মারো, আমার আর মান নাই, লজ্জা নাই, কি জন্যি আর এই অপমান মাথায় নিয়্যা বাঁচমু। জাফরের মতো বিধর্মী বেজন্মা আমারে মারে ! ও হো হো হো রে...

হাওয়া গরম। তাতে ধিকি ধিকি আগুন। আগুনের স্বভাব দাহ্যবস্তুর সন্ধানে দাউ দাউ ক'রে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠা।

ভিড়ের মধ্যে ঘুস্‌ঘুসে গুঞ্জন। সে গুঞ্জন ক্রমশ আক্রোশ ছড়ায়।

: পাকিস্তানে নিজিগরে জন্মোভিটায় মার খাইছি ওগোরে জাতভাইয়ের হাতে। আমাগরে ভিটা মাটি থিকে খ্যদায়া দিছে কুইত্তার বাচ্চার মতো। হাতে ধরিছি, পায় ধরিছি, শালারা শোনে নাই। ঘরে আগুন দিছে।

সেয়ানা মা-বৈন্‌গরে ইজ্জৎ খাইছে।

: তাশি বোঝো। বুইঝা দ্যাহো শালাগরে কী দাপট। হিন্দুস্থানেও উরা ডরায় না। ভরু-মণ্ডলরে ধৈরা মারে।

: কোন্ শালার হিন্দুর হিম্মৎ আছে যে. পাকিস্তানের মাটিত খাড়ায়া একজন মুসলমানের গা-গতরে হাত তোলে? আছে হিম্মৎ?

: শালা ইণ্ডিয়ার বান্‌চোত সরকার চায়ে দ্যাহে না? শালাগরে চোখ নাই?

: মার মার শালাকে।

কে একজন হিজল গাছের দিকে ছুটে যায়।

আগুন ছড়াতে থাকে।

একটা ঘুষি-আচম্‌কা কাজীর নাকে এসে লাগে। আরেকটা চোয়ালে। দু'বার টাল খায় অকম্প্র প্রতীতির শরীরটা। তার চশমাটা ছিট্‌কে কোথায় কার পায়ের তলায় চুরচুর হয়ে যায়। নাক দিয়ে গলগল ক'রে রক্ত আসে। ঠোঁট কেটে ফোঁটা ফোঁটা নোনা আস্বাদ চিবুক বেয়ে বুকে নামতে থাকে। সাদা জামায় ছোপ্ ছোপ্ কৃষ্ণচূড়া। তবুও টাল সামলাতে সামলাতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখেন তিনি।

: বিচার চাই। প্রকাশ্য বিচারে শালাকে ফাঁসী কাঠে তুলতি হবে।

: শালাগরে পাড়ায় আগুন জ্বালায়ে—সীমান্ত পার করি দেবো ইবার।

: ভরু মণ্ডলের গায়ে হাত? আমাগরে মাথা।

: আর ওই ছিনাল টিয়া মাগিরে ওই শালার সাথে কবরে পাঠাতি হবে। হিন্দুধর্মের সম্ভ্রম মাটির সাথে মিশায়া দিছে বেইশ্যা মাগি।

চিৎকার ওঠে—আলো নিয়্যা আইসো। আর ওই শালা পাঁটারে ধৈরে নিয়্যা চলো মণ্ডলের কাছারি বাড়ি। আজই বিচার হবি।

চারপাঁচ জনে এক সাথে কাজীকে চেপে ধরে। একটুও বাধা দিলেন না কাজী। ওরা যখন বন্দির পশুর মতো টেনে হিঁচড়ে তাকে হৈ হৈ ক'রে অনেকখানি পথ হেঁটে মণ্ডলের কাছারি বাড়ির সামনে এনে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়, তখনো তিনি শব্দ করলেন না। যদিও যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। চেষ্টায় কষ্ট হচ্ছিলো। একসময় মনে হলো ছাতিটা ফেটে যাবে। তবুও তিনি মুখ খুললেন না।

আর হারু মণ্ডলের সেকি আস্ফালন। অন্দর মহল থেকে হৈ-হল্লা

শুনে ছুটে এসে সব শুনে তার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা থাকে না। সে চিৎকার ক'রে হুকুম জারি করে—যাও, সেই হিন্দু জাতের কলঙ্কভারে ধৈরে নিয়্যা আসো। বিচার হবি আইজ!

একটা হল্লা ফের ছুটে যায় পার্বতী ডাক্তারের বাড়ির দিকে। সামনে পড়ে যায় অসুস্থ রাম ভকত্। সে প্রাণপণে বাধা দেয় হল্লাকে। একে তো বৃদ্ধ, তাতে জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছিলো, ঠিকমতো দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছিলো তার। তবু সে ওদের কাছে কাকুতি মিনতি জানায়।

একজন হুকুম দেয়—মার শালা খোট্টাভারে।

রাম ভকত্-এর মাথায় লাঠি পড়ে। অমনি কাটা কলাগাছের মতো ধপাস্ ক'রে মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারায় সে।

কিন্তু টিয়া কোথায়?

নেহুরামের মা বুড়িমণি কোথায়?

: চিড়িয়া উড়াল দিছেরে। খোঁজ। ঘর-দোর-বন-জঙ্গল খোঁজ। টাইনে বার কর শালিরে। খায়েস মিটানো হবি আজ।

তছনছ হয়ে যায় সাজানো গোছানো ঘর দোর। রান্নাঘর, ডিসপেন্সারি, বন জঙ্গল এমন কি পায়খানা পর্যন্ত তছনছ ক'রে উন্মত্ত হল্লাটা খুঁজে বেড়ায় টিয়াকে।

মেলে না, কোথাও মেলে না শিকার।

ক্রুদ্ধ হল্লা তখন তড়পাতে তড়পাতে ফিরে য য়।

আর সেইসময় উর্ধ্বশ্বাসে এলো চুলে, গাছ কোমর ক'রে জড়িয়ে পরা শাড়িতে উল্কাপাত ঘটায় এক সন্ন্যাসিনী···।

কাজীপাড়ায় খবর যায়। খবর যায় কৈবর্ত্য পাড়ায়। ঘরে ঘরে। ঘর থেকে ঘরে। ঘর পেরিয়ে পার্টি অফিসে....।

চোখের নিমেষে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে যায় সবখানে। দেড়-দুশো-চাষী টাঙ্গী, বর্শা, বল্লম, চ্যাঙা, কাটারি নিয়ে ধ্বনি তোলে ইয়া আলী। আলী। আলী...ইইই। খুন কা বদলা খুন।

দেড় দুশো হাতে মশাল। রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আকাশ-মাটি ভেদে যায় দাউ দাউ মশালের শিখায়। এ পাড়ায় কাঁপন।

ও পাড়ায় উত্তেজনা।

কাজীপাড়ায় মশাল ছুটতে ছুট্তে এগোয়। এগোয়। এগিয়ে আসে।

তারও আগে ছুটে আসে পার্টি অফিস থেকে মুকুন্দ সাহা—তার ক্যাডার নিয়ে। চশমা হারিয়ে প্রায় অন্ধ কাজীকে তারা বেরিকেড ক'রে দাঁড়িয়ে যায়।

প্রস্তুত হয়ে যায় হারু মণ্ডল ভরু মণ্ডলের সমর্থকরাও।

রঙ্গলাল দাগা; দীপক সান্যালরা মস্তান বাহিনী পাঠায় রামেশ্বরপুর বাজার থেকে। থানাকে সতর্ক রাখা হয়। কোনোরকম বেকায়দা পরিস্থিতি হলে তারা ছুটে আসবে ভরু মণ্ডলদের বাঁচাতে।

হারু মণ্ডলের হাতে বন্দুক। পিস্তল রিভলবার বিলি হয়ে যায় রঙ্গলাল দাগার ষ্টোররুমের আয়রন সেফ থেকে।

মশাল এগিয়ে আসে।

হারু মণ্ডলরা পেট্রোলবোমা, গ্রেনেড-পিস্তল-বন্দুকে সজ্জিত হয়ে ধ্বনি তোলে বন্দেমাতরম্, জয় শিবোশম্ভু—

সামনের ফস্‌লি জমির আল্ ধরে এগিয়ে আসা আঁকাবাঁকা মশালের শিখাগুলিকে একবার থম্‌কে পড়তে দেখা যায়। তারপর কেঁপে ওঠে। ছুটতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়, নারায়ে তক্‌বীর...আল্লা হু আকবর প্রতিধ্বনি।

এদিকে বন্দেমাতরম্, জয় শিবোশম্ভু...।

ওদিক থেকে—নারায়ে তক্‌বীর....আল্লা হু আকবর।

মুকুন্দ সাহা হালে জলের নাগাল পাচ্ছিলেন না। হারু মণ্ডলদের উদ্দেশ্যে তিনি একসময় বলতে থাকেন—এসব ভারী অন্যায় হতিছে হারু। সময় থাকতি তোমাগরে সাবধান করতিছি। যদি কোনো জীবনহানি হয় তো তুমাগরে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতি হবে।

হারু মণ্ডল খিস্তি দেয় সঙ্গে সঙ্গে—যান-যান শালা নেড়ের দালাল। কাজীরে ছাইড়ে দিয়্যা ভাইগা যান। যান কৈলাম।

ক্যাডাররা নির্দেশের জন্যে তাকায় মুকুন্দ সাহার দিকে। মাথা নাড়েন তিনি—মাথা ঠাণ্ডা রাখো। খবরদার, মাথা গরম করলি সর্বনাশ হয়্যা যাবে।

এতক্ষণে কাজী পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে যান মাঠের দিকে। তাকে বেরিকেড ক'রে এগোয় পার্টির ক্যাডাররা।

পেছন থেকে চেঁচায় হারু মণ্ডল—এর ফল ভাল হবিনে। কাজীরে আমাগরে হাওলা কইরে যান। অরে আইজ শ্যামা মায়ের চরণে বলি দেবো

আমি।

সমস্বরে সমর্থন জানায় মস্তানবাহিনী—নরবলি। জয় মা তারা, জয় শিবোশম্ভু···

উত্তেজনা চরমে।

ঃ ঠেকাতি হবে ওদের মুকুন্দ দা। আসেন শিগ্‌গির। বলে ছুটতে থাকেন কাজী। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করেন—থামো, থামো। ও রহিমুদ্দি। ও কলিমুল্লাহ, তুমরা থামো। কিছু হয় নাই আমার। আর আইগায়ো না।

নারায়ে তক্‌বীর···আল্লা হু আকবর।

মশাল কাঁপে, মশাল আন্দোলিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত কাজী পাড়ার হৃদয়ভরা ভালবাসা যেন মশাল আন্দোলিত ক'রে অভয় জানায়—আছি হে কাজী, আমরা আছি।

এই সময় কৈবর্ত্যপাড়া, দাসপাড়া, বাগদিপাড়া ভেঙে মানুষ আসতে থাকে। পেছন থেকে চিৎকার ক'রে তারা থামতে বলে মশাল প্রবাহকে।

ঃ হেই খাড়াও, রইসো হে। এক সাথে যাবো। ভরু মণ্ডলের কৈলজেডারে ছিঁড়ে আনবো আইজ। হেই রহিমুদ্দি, হেই সফদের আলি, কলিমুল্লাহ চাচা খাড়াও।

মুকুন্দ সাহা ছোটেন সামনের দিকে। ক্যাডাররা ছুটে যায়। তারা শ্লোগান তোলে—লালঝাণ্ডা করে পুকার / ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

কাজীপাড়ার মশাল এগিয়ে আসে। থামে না। কাজী রক্তাক্ত শরীরে মশালের মিছিলের সামনে আকাশে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠেন—হুঁশিয়ার....হুঁশিয়ার হও।

কেউ থামতে চায় না।

চাপ দিয়ে স্ফীত মিছিল উপ্‌ছে পড়তে চেষ্টা করে।

কাজী চিৎকার করতে থাকেন—হেই কলিমুল্লাহ, গাজীযুল, রহিমুদ্দি, সাবধান! আর এক পাও আগালি আমি নিজি খুন হয়া যাবো···। ফিরা্যা যাও, ফিরা্যা যাও তুমরা।

গাজীযুল লাফ দিয়ে কাজীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার দু'চোখে মত্ত ক্রোধ—না, ফিরা্যা যাবো না। তুমার শতরে হাত উঠায়; কেডা সেই কালাপাহাড় তিমিরপুরে? . চিৎকার করতে থাকে সে—কয়ডা কল্লা

তার ঘাড়ের উপুর ? কোন আশমানের নিচি বাস করে সে ? কোন্ মার দুধ খায়া বড় হৈচে সেই নরপিচাশডা ?

কাজী তাকে জাপটে ধরে অনুনয় করেন—ওরে, শিশুরা ভুল করতি পারে, বাপেরা তার ক্ষমা না করলি—কিয়ামত হয়া যাবি। থাম তুরা। থাম।

ষাটোত্তর কলিমুল্লাহ্ ঝড় হয়ে আসেন—হৈক্ কিয়ামত। কথায় কথায় মুসলমান বইলে অপমান করে ক্যা ভরু মণ্ডলেরা ? আমরা তো শান্তিতি থাকতি চাই। একসাথে···এক ঘাটে, এক মাঠে হাত মিলায়া চলতি চাই। তা উরা চায় না। উরা অশান্তি চায়।

কাজী দুই হাতে গাজিয়ুলকে ঠেকিয়ে রেখে বলেন—সংখ্যালঘুদের এই হকিকৎ। তুমি চাচা পাকিস্তানে ছ্যাখোগে, সিখানেও হিন্দুগরে মোল্লারা দেখতি পারে না। মালাউন কয়া, কাফের কয়া গাইল মন্দ করে। কিন্তু সিখানকার সাধারণ মানুষ এসব পছন্দ করে না। এখানকার সাধারণ মানুষও ভরু মণ্ডলগরে মতো না। তারা হারু-ভরুর হীন চক্রান্তকে সমর্থনও করেনা। ওই মুকুন্দ দাদা আইছেন। সত্তুর বছরের মানুষ, তারে তুমরা অপমান করলি আল্লার ওরস পৈর্যন্ত কাঁইপে উঠপে। শান্ত হও।

কৈবর্ত্য-দাসেরা-বাগ্দিরা এসে ঘিরে দাঁড়ায় মশাল মিছিলকে। তাদের সামনে রণরঙ্গিনী সন্ন্যাসিনী এক নারী মূর্তি।

কাজী বিস্ময়ে বিমূঢ়।

তারই সামনে টিয়া।

কুঞ্জ বাগ্দি মাথার পাগড়িটা টাইট ক'রে বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসে—ইস্-এ তুমার কি হইছে কাজী ? নাক-মুখ রক্তে ভাসাভাসি····কোন্ শ্যালো··· কোন্ শ্যালো তুমাক্ মারিছে কাজী···চলো হে···জোর কদমে চলো···

কাজী সবেগে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে বৃদ্ধ কুঞ্জ বাগ্দির পা জড়িয়ে ধরেন—কাকা—থামো কাকা, পায় ধরি তুমার···

তীব্র বেগে মাথা নাড়েন কুঞ্জ বাগ্দি—থামা থামি নাই। থামবো ক্যা ? ভরু মণ্ডল আমাগরে-ক্ষ্যাত-খোলা, জলা-জমিন ব্যবাক গিরাস কৈরে নেছে। তুমারে মারে ক্যা তাকি আমরা জানিনে ভাইবছো কাজী ? তুমি যে কৃষক সমিতি করো। মণ্ডলরে বাধা দিতি যাও বারবার। হেই রাগ। তো তুমি মানেই তো আমরা ব্যবাকে···কাজী মানে কুঞ্জ বাগ্দি, কুঞ্জ বাগ্দি মানে কাজী। আমরা গরীব, আমরা এক।

: কাকা। ঠিক। ঠিক কথা।

: তালি যাতি দ্যাও। মুকাবিলা হয়া যাইক।

: না।

হাঁপাতে হাঁপাতে মুকুন্দ সাহা আসেন। তার কণ্ঠ ধরে যায় ক্লান্তিতে। তবু তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন—পরে এর বিহিত করা হবি। যে যার ঘরে ফিরি যান।

গাজিযুল চেঁচিয়ে ওঠে—আমরা জানতি চাই, ইণ্ডিয়ায় কোন্ কোন্ ধর্মের মানুষ থাকতি পারবে? মুকুন্দ সাহা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—সব ধর্মের মানুষের দেশ ইণ্ডিয়া। যদি কেউ মনে করে ইণ্ডিয়া শুধু হিন্দুগরে দেশ, তারা দেশের বন্ধু না। শত্রু। আমরা রাজনীতিগতভাবে তার মুকাবিলা করবো। তিনরঙের ভিতরে আরও একট রং লুকায়া আছে। তার রং কালো। সেডাই তাগরে আসল রং। জাত-পাত-ধর্ম-বিধর্মের বিভেদের গ্যারাকল সিথানে। এখন শান্ত হয়া ঘরে যান। কাজীরে আমি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবো। সময়মতো ঘরে পৌঁছায়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার। শুনে শান্ত হয়ে যায় হুতাশন। ওদিকে হারু মণ্ডলরাও চুপ্‌সে যায়।

একে একে নিভে যায় মশাল।

আঁধারে ঢেকে যায় ফস্‌লি মাঠের আকাশ মাটি।

মুকুন্দ সাহা টিয়াকে কাছে ডেকে আনেন—তুমার সব কথা আমি জানি। চলো ঘরে চলো। কিডা তুমার অধিকার কাইড়ে নেয়—সে আমরা দেখবো।

টিয়াকে ঘরে পৌঁছে দিলেন ওরা। পৌঁছে দিতে গিয়ে আবিষ্কৃত হলো রাম ভকত্ এর জ্ঞানহীন দেহটা তখনো পথের মাঝে পড়ে আছে।

তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে এসে—নাড়ি টিপে ডাক্তার বললেন—হার্ট-ফেল করেছে।

: কতক্ষণ?

: ঘণ্টাখানেক আগে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিলো।

ছেলেরা লাশ বয়ে নিয়ে যাবে টিয়ার কাছে। মুকুন্দ সাহার নিষেধ অমান্য ক'রে যেতে চাইলেন কাজীও। বললেন—মুকুন্দ দা, আপনি সত্তুর বছরেও অস্ত্র হাতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতিছেন। সে তুলনায় আমি তো নও জোয়ান। সামাইন্য রক্তপাতে কি হইছে আমার?

: তালি যাও। কালই রাম ভকত্ এর মৃত্যুর হদিস করতি হবে।

থানা পুলিস কিছুই করবি নে। তবু আমি একবার থানার সাথে যোগাযোগ করতিছি। যদি লাশ ময়না তদন্ত করতি চায় তো কৈরবে। দাহ করার অনুমতি দিলি—রাতেই শ্মশানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতি হবে। তুমি ঘরে যাও।

কাজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—রাম ভকত্ তো উলুখাগড়া। নির্দোষ বেচারি বেঘোরে জেবনডা দিলো বিদেশ বিভূঁয়ে।

: তাই তো হয় কাজী। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, প্রাণ যায় উলুখাগড়াগরে। তো এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো সবাই মিলে। এডাতো রীতিমতো সাম্প্রদায়িকতা। রায়োটিং অ্যাটিচুড। আমরা সময়মতো এক হতি পারছিলাম বলে রক্তগঙ্গার হাত থিকে রেহাই পায়া গেলো তিমিরপুর। তা না হলি ভাবাই যায় না কী হৈতো এতক্ষণ। আর একটা কথা কাজী, উরা তুমারে সহজে ছাড়বি নে। তোমার চরিত্র নিয়্যা দোষারোপ কেউ বিশ্বাসই করে না। করবিও না। আসল কথা, তুমি যদি ঘায়েল হও, তালি দক্ষিণের মাঠের বিশাল অঞ্চলডা ভরু মণ্ডলের দখলে চলে আসপে। পার্বতী ডাক্তারের মেয়েডাও খুব বোকা। কি জন্তি, জানি না, সে আমাগরে বিশ্বেসই কৈরতো না। এখন বুঝতি পাইরছে—তিন রঙের কী অপার মহিমা।

কাজী মাথা নাড়লেন : বোধহয় পাইরছে।

মুকুন্দ সাহা বললেন : কাজী, আদর্শের বাস্তবায়ন ছাড়া বাঁচার কোনো পথই নাই গরীব মানুষের। আইন-প্রশাসন তো দেখতিছো। দেশ জুড়ে নৈরাজ্য চলতিছে। ঘরে ঘরে হাহাকার। মানুষের টেনশনে টেনশনে মাথা খারাপের অবস্থা। চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি, নারী নির্যাতন তো প্রতিমুহূর্তের ঘটনা। পুলিস উগ্রপন্থী বিশেষণ চাপায়া থানা হাজতে জেলখানায় দেশপ্রেমিকদের নির্বিচারে খুন করতিছে। পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দেখিছো যে—জজ সাহেবের বিচারকক্ষে বাঘের খাঁচা থাকে? আগে তো ছিলো না। এদানীং হইছে। চোর ডাকাতের জন্তি না। দেশপ্রেমিকদের ওতে ঢুকায়ে বিচারের নামে নাটক হয়। এরা নাকি ভয়ানক বিপজ্জনক। ফাঁকা কাঠগড়ায় দাঁড়া করালি—লাফায়ে ঘাড় মটকায়া দিতি পারে বিচারকের। আছে কোনো প্রতিবাদ?

পার্টির ছেলেরাই লাশ নিয়ে চললো পার্বতী ডাক্তারের বাড়ি। কাজীও

গেলেন সাথে সাথে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজনের মিছিল। তারা প্রস্তুতি নিয়েই এলো। কাজী টের পেলেন, আর্মসস্কোয়াডের ডজনখানেক ছেলেও মিছিলের ভেতরে রয়েছে। আর ওরা থাকলে অস্ত্রও থাকবে।

মুকুন্দ সাহা বলে দিয়েছিলেন কাজীকে ঠিকমতো এবং তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছে দিতে। কিন্তু পথে বেরুলে ফেরাটা নিজের হাতের বাইরেই থেকে যায়। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, যে মেয়ে তার বাবার মৃত্যুর দিন পাথর হয়েছিলো, সেই মেয়ে রামভকতের লাশ ধরে অবিশ্রান্ত কান্নায় বাতাস মথিত করলো।

সেদিনই রাতে পুলিস এসে লাশ নিয়ে চলে গেলো। ডিস্‌পেন্‌সারি রুমে থেকে গেলো দশ-বারোজন পার্টির ছেলে। লোকাল কমিটির সেক্রেটারি মুকুন্দ সাহার তাই নির্দেশ ছিলো।

কাজী অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন নসিরণ মদনকে নিয়ে আলো জ্বালিয়ে বারান্দায় বসে আছেন। মদন ঘুমে ঢুলছে। তখন আর শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তির অবশেষও ছিলো না। নসিরণকে শুধু বললেন— দরোজা দিয়্যা শোও। আমি ঘুমাবো।

হাওয়াকে তো হাতের মুঠোয় বন্দী করা যায় না।

কেউ কেউ হয়তো সে চেষ্টাও করে। যেমন আকাশকে কেউ সুনীল চাদরের মতো মনে ক'রে বিছানা সাজায়। সাজিয়ে তৃপ্তি পায়।

হাওয়াটা প্রকৃতির মর্জি। মানব প্রকৃতির হাওয়াটাও মানুষের তৈরি হলেও তার মতিগতি, সেই স্রষ্টা মানুষই বুঝতে পারে না।

একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে আর একটা মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাওয়াটা সেই দিকেই প্রবাহিত হতে থাকে।

রাম ভকতের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে চষে ফেললেন কাজীরা তিমিরপুর, রামেশ্বর পুর, হাস্নাবাদ অঞ্চল। মিছিল সকালে যদি দুশো লোকের হয়, তো বিকেলে হয় চারশো। মাঠে-ঘাটে-বন্দরে। শেষে থানা ঘেরাও ক'রে অবস্থান শুরু করেন।

রাম ভকতের হত্যাকারী ভরু মণ্ডল হারু মণ্ডল। তাদের গ্রেফতার করতে হবে। এই শ্লোগানে সকাল সন্ধ্যা তিমিরপুর রামেশ্বরপুর হাস্নাবাদে ইছামতীর জল তোলপাড় হয়ে চলে।

জোর হাওয়া তীব্রগতিতে প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার দুর্গে আঘাত করতে

মানুদা বাঁচায়।

মানুদা আমাদের কাণ্ডারী হে!

বাঁচায় মস্তানদের হাতে পাইপ গান তুলে দিয়ে। পেটো বানাও। অ্যাসিড বৃষ্টি করো। খাম্‌চে খুবলে নাও যুবতীদের স্তন। উরু। জঙ্ঘা। নিতম্ব...

ছিন্ন ভিন্ন করো গণতন্ত্রের দুশমনদের হৃৎপিণ্ড।

এইভাবে নেচে নেচে বেড়ায় মৃত্যুর কালোমুখোশরা হাতে হাতে জীবন হননের অস্ত্র নিয়ে। ভয় নেই হে। কলেজ স্ট্রীটে কালীপুজোর মহাসমারোহ।

ফিলিমের স্টার আসছে।

মিলিটারী সেনানায়ক আসছে।

মায়ের পুজো। চাঁদা দাও। পাঁচ-দশ-হাজারি রসিদ। না দিলে...তুমি গণতন্ত্রের দুশমন।

জগজ্জননী শ্যামা মা গণতান্ত্রিক গান্ধীর দেশকে বাঁচাবে। চাঁদা দাও। আমরা কারণসুধা খাবো।

নরবলি উৎসব চালিয়ে যাও যদি মায়ের নামে চাঁদা না পাও।

যত পারো উগ্রপন্থী বিশেষণে দরোজায় দরোজায় কড়া নাড়ো।

একবার। দু'বার। তিনবার।

খট্ খট্ খট্।

যদি প্রশ্ন করে—কে? কে? কে?

উত্তর দিয়ে যাও...গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। মানুদার সৈনিক। শ্যামা মায়ের সেবক, অহিংসার পূজারী।

গান গেয়ে যাও—শ্যামা মা-কি আমার কালোরে...।

এইভাবে ভরু 'মণ্ডলের মহাপ্রয়াণ' ঘটে। তিমিরপুরে মানুদার আশীর্বাদ-ধন্য হারু মণ্ডল হয়ে যায় দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। পার্বতী ডাক্তারের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি জগজ্জননী শ্যামা মায়ের বিগ্রহ-ধারক হারু মণ্ডল তার উদরে নৈবেদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

হালুম হালুম ডাক তার কণ্ঠে।

আর ক্ষণে প্রতিক্ষণে চোখ বুজে আপন মনে গেয়ে যায়—শ্যামা মা কি আমার কালোরে। গাইতে গাইতে কাঁদে।

সেই সময় শ্যামা মায়ের সেবায়েতের দরবারে ডাক এলো কাজীর। মন্দিরে তখন মায়ের সান্ধ্যকালীন পূজার্চনা। কাশর ঘণ্টাধ্বনি...

উলুজোকায়।

মন্দির থেকে গরদের উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে রক্ত চন্দনের তিলক আঁকা কপাল নিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে কাছারি ঘরে আসে হারু মণ্ডল।

কাজীকে ইশারায় কাছে যেতে বলে। কাজী সে আদেশ পালন করেন। কারণ সেসময় চারদিকে প্রতিদিন খুন, প্রতিদিন তাণ্ডব। ঘর-পোড়া গরু সিদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ভয় কাজীর মনেও। মদন-সুদীপ-সৈকতরা সেসময় এলাকা ছাড়া। চারদিকে খা-খা-শূন্যতা।

গাছ-গাছালির পত্র-পুঞ্জে শূন্যতার ভয়টা হাওয়ায় হাওয়ায় এক অশরীরি ভয় জাগায়।

পথে-ঘাটে মানুষের মুখে কুলুপ আঁটা। টু শব্দহীন।

হারু মণ্ডলের এক নম্বর মস্তানের পোস্টে তখন সমিরুদ্দির আবির্ভাব। তাকে দেখলে যুবক ছেলের মায়ের বুক কাঁপে ত্রাসে। তারা না দেখার ভান ক'রে সরে যায় অন্যত্র। আসলে কে সমিরুদ্দি? তার গায়ের জোর কার জোরে জোর হয়ে নির্বিচারে ত্রাস সৃষ্টি করে দিনের পর দিন? সেতো একটা দানবীয় রবোট।

চাবিটা হারু মণ্ডলের হাতে। চাবি দিলে চলে। না দিলে অচল।

একবার স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর না নিতে পেরে দীপক সান্যাল অপমানে—ছিঁড়ে ফেলেছিলো। আজও দীপক সান্যাল হাজির। হাজির অনাদি খাসকেল, রঙ্গলাল দাগা। একই দৃশ্যের পুনরাভিনয়।

সামনে মায়ের প্রসাদী কারণসুধা। দিশি জিনিস। চানাচুর। অনেকক্ষণ ধরে তারা বসে বসে মায়ের প্রসাদী সেবন করছিলো ভক্তিগদগদ চিত্তে। তারিয়ে তারিয়ে, মৌজ ক'রে।

ধেনো জিনিসের গন্ধটা এমনিতেই উগ্র।

টেবিলে ছড়ানো তাসের বাণ্ডিল।

কাজী পরিস্থিতিটা আঁচ ক'রে নিলেন। হারু মণ্ডলের ইশারায় কাছে যেতেই তার কান ধরে হিড় হিড় ক'রে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দাঁড় করায় মণ্ডল—সোনারে! কেউ নাই তোর বংশে দিতে বাতি। হারামীর ছেলেরা এখন লালঝাণ্ডা পাছায় গুইজে চম্পট দিছে।

শুনে ঝা ঝা ক'রে ওঠে কাজীর মাথা-কান।

সান্যাল হাতের গেলাসটা বাড়িয়ে দেয় ভুরু নাচিয়ে, কদর্য ভঙ্গিতে হাসতে

হাসতে—আহা নেতা মানুষ। কানে হাত দিও না হে মণ্ডল। পাপ হবি।

অনাদি খাসকেল গেলাসে ছুক্‌ ছুক্‌ শব্দে দুবার চুমুক দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—ঠিক। আমি কই, অ্যাকে তো মাগীর ধলা গাও, তাতে মাগী কমুনিষ্টির ছাও...দিন রাত্তির গিলা খায়, রাশিয়ার লেনিন আর চীন দ্যাশের ম্যাও...

রঙ্গলালের তখন নেশার মেজাজ। লাল চোখ। ঠোঁটটা উলটে ফুক্‌ ফুক ক'রে হাসে—হাঁজী, ঔর একটা সায়ের জুড়িয়ে দিন খিটকেল জী....

অনাদি প্রতিবাদ করে—কতবার হাম কহিয়ে দিয়েছি যে হামি শালা খিটকেল না। খাচ্চকেল, তো উল্‌টা পাল্‌টা... ।

রঙ্গলাল হা-হা ক'রে হেসে তার ভুল শুধ্‌রে নেয়—সরি। দিমাগ্‌ ঠিক থাকে না।

সান্যাল মনে করিয়ে দেয়—সায়েরটা কন দেখি...

কাজী মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে সহ্য করেন সমস্ত অপমান। তার তখন একটাই সান্ত্বনা, পৃথিবীতে মনীষীরা অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য ক'রে তাঁরা তাঁদের কাজ ক'রে গেছেন। গ্যালিলিওকে তো চরম জীবন-যাপন করতে হয়েছিলো একদিন সামন্ত সংস্কৃতির ধারক বাহক গীর্জার পাদ্রীদের হাতে... । তিনি গ্যালিলিও নন, মাও নন, লেনিন নন, কিন্তু তিনি তো ওঁদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ। ওঁদের দর্শনের প্রতি অনুগত কর্মী। শত্রুরা তো লাঞ্ছনার বিবর নির্মাণ করে। আদর্শবাদীরা সেই বিবরে ওদেরকেই নিক্ষেপ করার কাজে সংগ্রাম ক'রে যায়।

সেক্ষেত্রে শত্রুর জুতোর মালাটা তো ফুলের মালার সমান। এ থেকে প্রমাণ হয়, পাপীদের বিরুদ্ধে লড়াইটা সঠিক পথে এগুচ্ছে।

সান্যালের অনুরোধে দাগা সায়ের শোনায় —এক তো মুসলমানকি গরম্‌—দুস্‌রি ঝাণ্ডাবালাকি পিয়ার / তিস্‌রি ওহি যো টিয়া টিয়া ওঁঠোছে পুকারতে.../ কাজী,মাই ডিয়ার... ।

হাসির কোয়াশে গড়াগড়ি যায় মণ্ডলের কাছারি ঘর।

উদ্দাম, উন্মাদ হাসি।

দাগা বসে বসেই কপালের পাশে ডান হাত ঠেকিয়ে, বাঁ হাতে কোমর দুলিয়ে অশ্লীল একটা মুদ্রা সৃষ্টি করে।

হাসি।

আবার। আরো।

অনাদি—দুই আঙুল মুখে পুরে সিটি বাজায় হুই হুই হুইরে...।

গেলাসের মদ ছিটকে ছড়িয়ে দেয় সান্যাল কাজীর চোখে মুখে। দ্রুত চোখ বন্ধ করায় চোখ দুটি রেহাই পায়। কিন্তু-মুখ-জামা-বুক ভিজে যায় উগ্র তরল ধেনোতে। উৎকট ঝাঁঝে গা গুলিয়ে বমি আসে কাজীর। তবু নিরুপায় তিনি আজ। জানতেন, এ মুহূর্তে গাজিয়ুলবা গ্রামছাড়া, কৈবর্ত্যপাড়ার দাস—বাগ্‌দি পাড়াকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছে পুলিস—হারুমণ্ডলো হুকুমবরদার—সমিরুদ্দি নবীনরা। আজ আর কেউ ছুটে আসবে না লাঠি হাতে, মশাল জ্বালিয়ে, গুলির সামনে, চাকুর সামনে অকুতভয়ে...।

হারু মণ্ডলদের কাছে এখন একজন মানুষ, একটা ছারপোকায় কোনো পার্থক্য নেই। যে কোনো সময় আঙুলে পিষে—ইছামতীর জলে ফেলে দিতে পারে। এখন মজুদার সেবকরা থানা হাজতেই মেয়েদের ওপরে বলাৎকার চালাচ্ছে। আসামী পালিয়ে যাবার অজুহাত দিয়ে রাতের অন্ধকারে গুলি ক'রে খুন করছে। বেধড়ক পিটিয়ে জীবনের মতো অন্ধ কিংবা পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে। কোনো বিচার নেই। কোনো প্রতিবাদ নেই। মানুষের বিবেক তাতে লাঞ্ছিত হয় না। দংশিত হয় না। আগের কালে পথে একটা কুকুর মরে পড়ে থাকলে মানুষ ফিরে তাকিয়ে দেখতো। এখন পথের মাঝখানে মানুষের লাশ পড়ে থাকলে ব্যস্ত-ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ সেই লাশের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়। টুঁ-শব্দ নেই উহু-আহা নেই। যেন ভ্রুক্ষেপের মতো কোনো ঘটনাই না। স্বাভাবিকতার সীমা এমনিভাবে ছাড়াতে ছাড়াতে মানুষের সব কিছু সয়ে গেছে। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক আছে। সেটা, আমি,একবচন, উত্তমপুরুষ আর সেই আমিত্বকে ঘিরে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

আজ প্রতিটি মানুষ সেই আমিত্বকে ঘিরে, উত্তম পুরুষ হয়ে বিচরণ করছে। অন্যের দুঃখে কাতর হওয়ার মনন নেই, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। বিবেক বুদ্ধি নামক মানবিক মূল্যবোধ শুধু—এই আমি, দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে এত করলাম, বিনিময়ে আমি কী পেলাম—প্রশ্নে পরশ্রীকাতরতায় আক্রান্ত সংক্রামক ব্যাধিতে।

রক্তক্ষয় হওয়া এ সমাজ ডুবে যাচ্ছে এক অতল অদৃশ্য অন্ধকারের বিবরে।

কাজীর সামনে সেই সত্তর টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের আবির্ভাব ঘটে। হারু মণ্ডলের শ্যামা মায়ের মন্দির ফেরা গরদের উত্তরীয়র আড়াল

থেকে একটা ঝকঝকে পিস্তলের নল বেরিয়ে আসে ;

দীপক সান্যাল চাপা স্বরে হুকুম দেয়—সই করো।

পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও। আমাকে তুলে নাও তোমার কোলে। কাজীর হৃৎপিণ্ডে রক্তের দাপাদাপি। অস্থি-মজ্জা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে ফিন্‌কি দেয়া রক্ত।

মন্দিরে শ্যামা মায়ের রামপ্রসাদী কীর্তন গাওয়া হচ্ছে। তার স্বর কাজী শুনতে পান / চাইনে মাগো রাজা হতে…।

হারু মণ্ডল কলম এগিয়ে দেয়—ধরো। সই করো।

কাজী চোখ তোলেন। হারু মণ্ডলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তিনি সেসময় মনে মনে শিউরে ওঠেন। হারু মণ্ডলের হাসিটা কি মানুষের হাসি? হাসতে পারে মানুষ এরকম নিঃশব্দ পৈশাচিক ভঙ্গিতে! তিনি বুঝতে পারেন ওরা ছাড়বে না আজ। কিই বা তার আছে। বিঘে দশেক জমি কাঠা আটেক জমির ওপরে সাত পুরুষের ভিটে বাড়ি। এ নিয়ে কী হবে হারু মণ্ডলের? কতটুকু হবে? তার মনে পড়ে মুকুন্দ সাহার সেইকথাগুলি। বিন্দু বিন্দু ক'রে সাগর-মহাসাগর। হারু মণ্ডলরাও সেকথার মানে জানে। চমৎকার-ভাবে জানে। বিন্দু বিন্দু জাফর কাজীদের রক্তছেঁড়া মাটি আত্মসাৎ ক'রে ওরা সাগর-মহাসাগরের মালিক হয়ে যায়। আরও একটা বড় কারণ, তাকে উৎখাত করা। কাজীপাড়ায় মণ্ডলদের অনুগত দালাল তৈরি ক'রে কম্যুনিস্টদের ঘাঁটিটাকে ছত্রখানকরা। পাকাপাকি দখল কায়েম করার জন্তে ওরা বেপরোয়া, মরিয়া।

তিনি হাত বাড়িয়ে কলমটা নিয়ে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করলেন। কাগজখানা মণ্ডল প্রায় সাথে সাথে ছোঁ মেরে নিয়ে সান্যালকে দেয়। দেখে মাথা নাড়ে সান্যাল। চকিতে একবার কাজীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলে—কি হৈলো? বড় ব্যথা লাগতিছে বুকে? যাও টিয়ারাণীর ঘরে যাও গে! গলা জড়ায়ে দুঃখের কথা কওগে। শুয়ারের বাচ্চা।

অনাদি খাসকেল তখন প্রায় মাতাল। সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—যায়ে লাভ হবিনে। মালডা শুকায়ে আমৃসি হয়া গিছে।

সান্যাল ফোড়ন কাটে—তাতে কি। চট্‌কায়া খালি সোয়াদ আছে

কাজী দরজার দিকে ফিরলেন! তিনি তখন কাঁপছিলেন।

মন্দিরে তখনো রামপ্রসাদী গান গাইছিলো কারা।

মণ্ডল বলে উঠলো সেই সময়—কাজী।

কাজী ফিরলেন।

: মোসলমানগরে ভোটগুলা আমার চাই। সামনের ইলেকশনে উল্টা-পাল্টা হলি পরিণাম আরো ভয়ানক হবি মনে রাইখো।

কাজী শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে দরোজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

নসিরণ অপেক্ষা করছিলেন স্বামীর।

কাঁদছিলেন একা একা। বুকের ভেতরে কেবলই ভয়। আর বুঝি ফিরবে না। রাত ভোর হলে কেউ এসে চুপি চুপি খবর দিয়ে যাবে—কাজীর লাশে কুকুর বসেছে ধান ক্ষেতে।

এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি একবার ঘরে যাচ্ছিলেন, আর একবার বাইরে ছুটে আসছিলেন। উন্মুখ হয়ে দেখছিলেন পথ।

আল্লা। আল্লা-মাবুদ, আমাগরে তুমি ভিখারি কৈরে ছাও, তৌ মানুষটারে জানে মাইরো না। আমরা তিমিরপুর ছাইড়া চৈলে যামু। গাছ-তলায় থাকমু আল্লা, কিচ্ছু চাই না...।

আসে না, আসে না সে মানুষ। অস্থির নসিরণ জায়নামাজ বিছালেন। ওজু ক'রে এবাদত বন্দেগীতে সেজদায় পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি ফিরলেন। আর কোনোদিন নসিরণ যা করেননি, আজ তাই করলেন—দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন কাজীকে। জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সেই মুহূর্তে নিজেকেও সামলাতে পারলেন না কাজী। সমস্ত শরীরে তার ভূমিকম্প হয়ে গেলো। তিনিও শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

নসিরণ হতবাক। তার কান্না থেমে যায়। এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা তার কাছে। কোনোদিন এত দুঃখ, এত কষ্টেও যে মানুষটাকে বিচলিত দেখেননি, কঠিন দৃঢ়তায় সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির রাশ টেনে ধরে যিনি সময়কে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন, চোখের জলকে ধিক্কার দিয়েছেন, তার চোখে আজ জল? তিনিই আজ অবুঝের মতো কাঁদছেন! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার কপালে কুঞ্চন জাগে। সবিস্ময়ে তিনি দূরে সরে গিয়ে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—একি, তুমি মদ খাইছো?

শিশুর মতো বিছানায় বসে তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়লেন

—না·। উরা আমার সর্বস্ব ছিনতাই কৈরে গায়ে মদ চাইলে দিলো মদনের মা।

: এ্যয় মাবুদ তুমি, কনে। তুমি কনে মাবুদ। একি অনাচার, গুনাহের কথা শুনি।

: কাইল যদি ওরা ঘাড় ধৈরে বাইর কইরে দেয় ভিটা থিকে—মুখবুজে বাড়ায়া যাতি হবে।

: ক্যা? ক্যা? কি সর্বনাশের নিশান উড়ায়া তুমি ঘরে ফিরলা গো?

: নসিরণ, আমাগরে জন্মভাই কি গুনাহের? উরা সাদা স্ট্যাম্পে আমার সই নিলো পিস্তল ঠেকায়ে।

: তুমি সই দিলা? একটা আর্তচিৎকারে নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ করলেন নসিরণ।

: তুমার জনি্য কষ্ট হৈলো মদনের মুখটা চোখের সামনে ভাইসা উঠলো। সই দিলাম। না দিলি তুমার ঘরে আমার লাশডাও পৌছাতো না। শেয়াল-শকুনে উপড়ায়া নিতো কৈল্জে, চোখ, সর্বদেহডা।

: চুপ। চুপ করো।

ফিস্ ফিস্ করেন নসিরণ। ফুঁপিয়ে শিউরে ওঠা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি বসে পড়েন মেঝেতে।—গাছতলায় থাকপো আমরা। রেল লাইনের ধারে ধারে কত মানুষ খোলা-খাপড়ার ঘর বানায়া বাস করে। আমরা তাই থাকপো·· বলতে বলতে সামনের তক্তপোষের পায়ায় খুব জোরে নিজের মাথাটা ঠুকে দেন আচমকা...

: নসিরণ! নসু, আমার নসু···। কাজী ছুটে এসে জাপটে ধরেন নসিরণকে। মুখটা কোলে টেনে নিয়ে চমকে ওঠেন। ভুরুর কাছটা কেটে গেছে। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে...। দেখতে দেখতে কি হলো কাজীর কে জানে। তার বুকের আবেগে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ থেকে চুইয়ে পড়া রক্তের উৎসে তিনি ঠোঁট ছোঁয়ালেন। টানলেন জোরে জোরে। নোনা আস্বাদ তার জিভে। তার প্রিয় নসুর রক্তের স্বাদ···। মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে আদর করতে করতে ডাকলেন—নসু, আমি আছি, মদন আছে, তুমি আছো, ভয় কি?

নসিরণ ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেন স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে—আমার সারা গতরে ভয় গো মদনের বাজান। মনের ভিতরে বড় কঠিন অসুখ ঢুইকে ···দিনমান আমার সুখের ঘরডারে ঠোকড়ায়া খায়। বড় কঠিন তার

জ্বালা। বড় বিষম তার ঘা। অ্যাতো কষ্টেও মনে হয়—তুমি যদি হাসিমুখটারে আমার সামনে খেলাত্তি পাইরতে···মদনের যদি একটা গতি হৈতো....আর... হারু মণ্ডলরা যদি তুমার নামডা ভুইলে য্যাতো....

: নস্থ। এইভাবে আমাগরে ভাবত্তি হবি। কেউ সুখ নিয়্যা বাঁচে, কেউ দুঃখ নিয়্যা জীবন কাটায়। আমরা সুখের নাগাল নাই বা পালেম, দুঃখেও যদি শান্তি থাইকতো...তাও হবিনে জানি, শান্তি তো দুনিয়াতেই নাই। কুনোদিনও শান্তি আসপে না। একদিন ইতিহাসের পাতায় 'শান্তি' শব্দটা পৈড়বে লোকে। মনে কৈরবে, 'শান্তি' নামে একসময় দুনিয়ায় কিছু একটা ছিলো।

: অতো কঠিন কথা আমার মাথায় আসে নাগো।

: আসপে না ক্যা নস্থ? তুমি তো বাস্তবে দাঁড়ায়ে সবরকম অভিজ্ঞতা অর্জন কৈরছো। দেইখছো মানুষ ঈশ্বর হয়, মানুষ শয়তান হয়। 'স্বরায়ে নাস' পাঠ কৈরলে তো এ শয়তান তাড়ানো যায় না। এ শয়তান সোজা হয় শক্তির সামনে। সে শক্তি কনে? গাজিয়ুলরা, কৈবর্ত্যপাড়া-দাসপাড়া-বাগ্‌দিপাড়ার হাজার ছেলে আজ শয়তানের অত্যাচারে ঘর ছাড়া। তো আশার কথা নস্থ, শয়তানের জোরেরও তো সীমা আছে একটা। একদিন তারা ঘা খায়া মাটিত্ মুখ থুবড়ে পৈড়বে।

: না গো না। হারু মণ্ডলগরে নাশ হবিনে কুনোদিন। থানা-পুলিস উয়াগরে হুকুমে ওঠ্ বোস করে। হাজারডা ন করলিও যাগরে সাতখুন মাফ...তাগরে সাথে কেডা পারে? মদনরা পাগলামি করে গো....। তুমিও তাই করতিছো।

: না নস্থ। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেন কাজী।

: সাচা কথা কই আমি। জীবনে অনেক দেইখলাম। ম্যালা মানুষ। তারা কি সবাই আছে? নাই। যে যার সুখের খোঁজে সোময় থাকতি থাকতি উড়াল দিছে। সেই যে তুমার ছাত্র, নূরমোহাম্মদ কৈলকাতায় যায়া অতবড়ো ডাক্তার হইছে। ফিরা চায় তুমাগরে দিক? ছোটকালে কত আইসতো। আমি নাড়ু-বড়ু খাতি দিছি। খাইছে। গাছের আমডা কলাডা-আমশব্‌রীডা হাতে দিলি খাইছে···। তখোন তুমি তার গুরু আছিলে। কত বড় বড়, ভাল ভাল কথা কৈতো...হিন্দু-মোসলমান মাইনতো না। নামাজ-রোজা কৈরতো.না। জিগ্যেস করলি কৈতো...ধর্ম মানুষের

মনের ঘরে বেড়া দিছে, সমাজে ভেদ-বুদ্ধি আনিছে, মানবধর্ম সকলের উপরে....। কনে গ্যালো সেসব বড় বড় বুলি?

কাজী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

নসিরণ যে জীবন থেকে নিংড়ে নেয়া অভিজ্ঞতার কথা বলেন; সেখানে তো অকাট্য যুক্তিরা এসেও মাথা নত করে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না কিছুতেই।

তার সর্বস্ব চলে গেলো আজ। সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরের তো তাই মানে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে দাঁড়িয়ে চাকরির পরিস্থিটা ভাবতে গিয়ে তিনি চমকে ওঠেন। আর তো তিনটে বছর। আর মদন যে পথে পা বাড়িয়েছে, কখনো পাকাপাকিভাবে ঘরে ফিরবে সে পথ থেকে, তাও মনে করেন না। মদন মদনের পথে চলবে। চলুক। সে চলায় আনন্দ আছে, গর্ব আছে, আছে মনুষ্যত্বের জয়গান। কোনোদিন যদি সমাজ বদলায়, যদি মানুষ বদলায়, সেই মূল বদলের আদর্শে, সেদিন সময় থাকলে ফিরে আসায় বিশ্বজয়ের জয়ডঙ্কা বেজে উঠবে।

যদি পদস্খলন হয়, গরীবের নিক্ষিপ্ত থুথু ছিট্‌কে পড়বে সারা মুখ জুড়ে। তাই সামনের দিন খুব কঠিন, ভয়ানক দিন হে। যদি ঘর না থাকে, মাথা গোজার ঠাঁই না থাকে, যদি জমিতে ফসলের অধিকার সত্যি সত্যিই কেড়ে নেয় মণ্ডলের আগ্রাসী ক্ষুধা, কি করবেন তিনি চাকরিহীন বেকার বার্ধক্যের সাঁকোতে দাঁড়িয়ে! ধু ধু অন্ধকার, নির্বিকল্প জীবন হে।

নসিরণ তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে শুয়ে। সেকি পরম নিশ্চিন্ততার কোন ঐহি বাণীর জন্যে প্রতীক্ষা করছে এখন? না-না, তিনি কেন ভাববেন—নসুও তো জীবনে কিছু পেলো না। স্বার্থপরতার চরম এ আত্মজিজ্ঞাসা। ক'জন পেয়েছে জীবনে পঞ্চমুখ অধিকারের পাঁচটাকেই?

ক'জন পায়? পাওয়ার পথ খোলা আছে ক'জনের?

মুকুন্দ সাহা বলতেন, তুমার হাতে পথের নিশানা। অথচ তুমি নিজেই পথের নিশানা গুলায়ে ফেলিছো। তুমি যে নেতা, তোমার কথা ছিলো, তুমি বড় নেতা হবে আমাগরে। গরীবের বিন্দু বিন্দু সমর্থন দিয়্যা তুমারে নেতা তৈরির দায়িত্ব আমাগরে। তারপরে তুমি নেতা। তো নেতা হয়্যা তুমি কি কৈরলে? তুমার গাড়ির দরকার। তার কি ব্যাখ্যা? কি জন্তি গাড়ি চাই? তুমার উপুরে সারা দেশের

দায়...দায়িত্ব। ছুটোছুটি করতি হয় হাজার জাগায়। ঠিক কথা। গরীবের না খাওয়া পয়সা চাঁদা হয়া তুমার হাতে গ্যালো। কিনলে গাড়ি। তারপর কৈলে—বাড়িডা ভাল দরকার। কি জন্নি? ব্যাখ্যা দিলা, ড্যাম্প ঘর, টি, বি হতি পারে, নিমুনিয়া হতি পারে। তাও ঠিক।

তারপর তুমার চারধারে তুমার দেখাদেখি হাজার পাতি নেতারাও এক-সুরে ম্যাও করতি শুরু করে। তো আমরা গরীবরা অ্যাতো ম্যাও কি কৈরে সামলাই—কও?

আমরা খালি প্যাটে কচু-ঘেচু ঢুকায়া দম নিতি চিষ্টা করি। তুমরা চাউমিন দিয়্যা নাস্তা করো। তুমাগরে বউরা কৈলকাতার নিউমার্কেটে পুজোয়-আরচায় কী কী শৌখিন জিনিস কিনলো—তুমাগরে ডগ্‌মগো-ঠোঁট-লাল হাত-কাটা জামা পরা বউগরে রঙিন ছবি সহ সেই খবর বুর্জোয়া কাগজগুলান 'মনের আনন্দে বলো হরি' কয়া ঝক্‌ঝকে কৈরে ছাপায়।

আমরা গরীবরা হাততালি দিয়্যা বুর্জোয়াগরে কৈ, ওহে, চায়া ছাখো, দেইখে পরাণ-মন জুড়ায়া ন্যাও হে একবার। খালি তুমাগরে নেতাগরে বউ—বউমারাই হাত-কাটা জামা—আর দামী ঠোঁটপালিশ মাথায় না, আমাগরে নেতাগরে বউ—ব্যাটার বউরাও মাথায়। কি আনন্দ, কি আনন্দ ..ইনকিলাব-জিন্দাবাদ....

কাজী তাকিয়ে দেখেন, নসিরণ ঘুমিয়ে পড়েছে তার হাঁটুতে মাথা রেখে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন-পরম নিশ্চিন্তে। বহুদিন পরে তার নস্বর জন্যে বুকের ভেতরটা কিরকম আন্‌চান্‌ ক'রে ওঠে। গায়ের জামাটা ছেঁড়া। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে সেলাই। শাড়িটাও তাপ্পিতে তাপ্পিতে 'তাপ্পিজোড়' ডিজাইন হয়ে গেছে। আজকাল তো কতশত বিচিত্র সব শাড়ির ডিজাইন বেরিয়েছে। কত অদ্ভুত ধরনের সব নাম। নসিরণের শাড়িটার নাম যদি 'তাপ্পিজোড়' হয় তো ভালই শোনায় নামটা। নিজের নিষ্ঠুর রসিকতায় তিনি নিজেই মনে মনে হাসলেন।

মুকুন্দ সাহার পার্টি জীবনের শেষ দিকটায় একটা 'নতুন বোধ' সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি বড় বড় নেতাদেরকে একদম পাত্তা দিতেন না। পছন্দ করতেন না। বিশ্বাসও করতেন না। নাম না ধরে একান্তে বসে তিনি প্রায়ই আত্মশুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে রথী মহারথীদের জীবনধারা নিয়ে টান চড়াতেন। কিন্তু নাম না ধরলেও, উপমাগুলিই নামের উত্তমপুরুষদের চিহ্নিত ক'রে দিতো।

তিনি হারু মণ্ডলদের প্রতিহত করার কথা বলতে গিয়ে বলতেন, আমাগরে যা আছে, তাই নিয়্যা এইসব পরগাছাগরে সমূলে উৎখাত করতি পারি…কিন্তু পারতিছি না ক্যা ?

যেদিন গরীবের মুক্তি হবি, সেদিন গরীবরাই তাগরে পার্টির অফিস বুকের খুশিতে রাঙায়ে দিবি। সেইডাইতো আসল হে।

তো তুমরা বোঝো-আসল-নকলের যে খেলা চৈলছে। চোক্ষু, কান, মস্তিষ্ক খোলা রাইখে না বুঝলি—শেষকালে আমার গল্প ফুরাইলো নটে গাছটি মুড়াইলো।

বলে হা হা ক'রে হাসতেন মুকুন্দ সাহা। নাকি হাসির আড়ালে ক্রোধ ?

হয়তো ক্রোধ আর হাসি একই সঙ্গে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন। দু'-একজন ছাড়া পার্টিতে কেউ তার সমালোচনা করতো না কখনো। যারা সমালোচনা করতো তারা নটে গাছটি মুড়িয়ে দেবার লাইনে দাঁড়িয়ে৽।

রাতজাগা পাখিরা ডাকে। পাখায় পাখায় নিশিজাগরণের শব্দ। গভীর রাতের সঙ্কেত ওদের আলস্য ভাঙার নড়াচড়ায়। কাজী দুই হাতে নসিরণকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন একসময়। আশ্চর্য, ঘুম ভাঙে না নসিরণের। অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকেই দুই হাতে কাজীর গলা জড়িয়ে ধরেন।

কাজী হাসেন। হয়তো টের পান, তার নম্র প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে জীবনের এক অনাবিল কোমল বাসনায় জেগে থেকেও ঘুমের ভান করছে। কেন এই লুকুচুরি খেলা ! এ কোন্ নেশা নসিরণের বুকে রুপোলী মাছের মতো থল্‌বল্ করছে আজ !

ধীরে, সন্তর্পণে নম্র রুখু ঠোঁটে তিনি আঙুলের স্পর্শ রাখেন।

কতকাল শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের এই পাপড়িযুগলে মনের মানুষের গাঢ় চুম্বন পড়েনি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাজীর নিজেরও চোখের পাতায় ঘুম নামে….

বুঝি তখনো ঘুম ভাঙতে বাকি ছিলো কাজীর।

পরদিন ইস্কুলে ঢোকার মুখে এক মারমুখো জটলার সামনা সামনি হতে হলো তাকে। তুমুল শ্লোগান চলতে লাগলো তাকে ঘিরে। বিশ্রী, অশ্রাব্য শ্লোগান।

ছোট ছোট ছেলেদের মুখে কারা তুলে দিয়েছে এই সর্বনাশের চূড়ান্ত মন্ত্র?

ঝকঝকে রোদ ইসকুলের মাঠে। বাড়িতে। সামনের দিঘিতে।

বটগাছের নিচে কিছু অচেনা মুখ। কোনোদিন এদের তিমিরপুরে দেখেননি তিনি। ওরা কি করছে? কারা ওই সব মুখ? কেন এসেছে।

প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র?

কেন?

কত বয়স যারা গেটে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে? ন' দশ-তের-পনেরোর বেশি কি?

গেট কোথায়? তিনদিকে খোলা মাঠ। সবদিক দিয়েই ঢোকা যায়। কিন্তু তিনি মাঠের মাঝখানে-সড়কের ধার ঘেঁষে দু'পাশে খুঁটি পুঁতে একটা প্রবেশ পথ ক'রে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকবছর পূর্বে। অন্তরা এদিক ওদিক দিয়ে ঢুকে পড়ে। তিনি সবসময় প্রবেশ পথের নিশানাটা ঠিক রেখেছেন। কথনো নিশানা ভুল হয়নি তার। গেট থেকে একটা পায়ে চলাপথ চলে গেছে ইসকুলের ছোট অফিস ঘরটায়।

দূর থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন, গেটের বাইরে যেখানে একজন আচারওয়ালা আর ঝালমুড়ির দোকানী রোজ বসে, সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের হাতে কালো পতাকা। ওরা ঘুর ঘুর করছে। তিনি যতই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ততই ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে উঠছিলো যেন।

কোনো শোক দিবস কি আজ? ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, বা সূর্যসেন—অথবা বিনয়-বাদল-দিনেশের মৃত্যুর দিন?

তিনি কাছাকাছি হতেই একসঙ্গে ছেলেরা ছুটে এসে তাকে ঘেরাও ক'রে ফেললো। হাতের কালো পতাকা বারবার শূন্যে উঁচিয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করলো—চরিত্রহীন জাফর কাজী-ধ্বংস হোক, দূর হঠো।

দূর হঠো। নিপাত যাও—

ফুট্‌ফুটে সেই ছেলেটি। দীপক সান্যালের ছেলে। বারো-তেরো বছর বয়স। শিপক। ওই তো শ্লোগান লিড করছিলো-লাফ ঝাঁপ ক'রে...

কাজী ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলেন। শিপক এসে সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। চিৎকার ক'রে শিপক ওর বাঁশীর মতো মিষ্টি কণ্ঠে বিষ উদ্গীরণ করলো—আপনি আমাদের ইসকুলে ঢুকতে পারবেন না। তাহলি আমরা ইসট্রাইক করবো।

কাজীর সমস্ত শরীরে একটা বরফের স্রোত বয়ে গেলো। তিনি দেখলেন, অফিসরুমের বারান্দায় দাঁড়ানো অন্যান্য শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে হাসছে! দেখে অসম্মানে ঝলসে যায় সমস্ত শরীর।

আলবিদা—আলবিদা। শেষ বিদায়ের বাঁশী বাজিয়ে দেয় তার বিবেক। এইবার 'বন্দরের কাল হলো শেষ।'

কাজী শিশুদের দিকে তাকালেন। মুখ ফুটে একবার বলতে চাইলেন, ওরে তোদের মুখে এখনো ফুলের সুবাস, তুলসিমঞ্চের পবিত্রতা, সেই তোরা কার হাতে অমৃত ফেলে বিষ মুখে নিলি?

এই ভবিষ্যৎ হননের সর্বনাশা নিশান কে তোদের হাতে তুলে দিয়েছে?

তিনি বুকচাপা অস্থির একটা যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। মনে মনে বললেন—গুড বাই, গুড বাই ইউ অল।

দু'চোখে কি জলের আভাস তার? স্মৃতির অতল জলে সবুজ শ্যাওলায় সাঁতারকাটা আলোড়ন? ফিরতে ফিরতে শুনতে পেলেন শিপকের লিডিং শ্লোগান—হায় হায় করিলো...

তখন দুয়েক শিশু করতালি দিয়ে জবাব দিলো সঙ্গে সঙ্গে—জাফর মাস্টার কাঁদিলো....।

: জাফর মাস্টার কাঁদিলো...

: ল্যাজ তুলে পালালো....

দ্রুত, যত দ্রুত সম্ভব, কাজী পা চালালেন। শেষে ফসলের মাঠ দিয়ে ছুটতে লাগলেন দুই হাতে কান চেপে ধরে। তবু, তবু যেন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন হৃদয় বিদীর্ণ করা শিশু মুখে বিষবাক্যের ডঙ্কা....। অন্তরের গভীরে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত কাজী একসময় উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলেন—না। না। শিশুরাই ঈশ্বর। এ তুমরা কী করতিছো....কোন্ সর্বনাশের বিবরে নিজিগরে সন্তান-সন্ততিদেঃ ডুবায়ে দিতিছো....

তুমরা সব পারো। নিজিগরে সুখের জন্যি, দরকার হলি তুমরা আপন শিশুর মুণ্ডচ্ছেদ কৈরে তুমাগরে গ্রেট মাস্তুদার পায়ের নিচে ভেট দিতি পারো।

তুমরা হিন্দু না। তুমরা মুসলমান না। খৃস্টান—বুদ্ধ না···

তুমরা জল্লাদ। তুমরা খুনী। তুমরা সৈভ্যতার চরম অভিশাপ....

: কেডা, কেডা যায়? কেডা যায়?

গেরুয়া বসন, হাতে একতারা, কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি....বাঁ হাত শূন্যে তুলে ঈশ্বর বৈরাগী দাঁড়িয়ে পড়েছে। চেঁচিয়ে ডাকছে কাজীকে।

কাজীর তো দাঁড়াবার সময় নেই।

কাজী ছুটে যাচ্ছেন কাজীপাড়ার দিকে। না, না, না, আর না। একটা দণ্ডও না। আজই, এই মুহূর্তে নসিরণের হাত ধরবেন। চলো নসিরণ, তিমিরপুরকে আল্‌বিদা জানায়ে চলো-যেদিক দুই চোক্ষু যায় চৈলে যাবো আমরা।

: কাজী দাদা, হেই কাজী দাদা....

প্রায় সমবয়সী ঈশ্বর হাওয়ায় হাওয়ায় তার ঝাঁকড়া বাবড়ি উড়িয়ে মাঠ বরাবর ছুটতে লাগলো।

: একি অনাসিষ্টি কাণ্ড গো তুমার কাজীদাদা, দোহাই তুমার, হেই কাজীদাদা, আমি ঈশ্বর। আমি ঈশ্বর।

ছুটতে ছুটতে, ঘামতে ঘামতে, ক্লান্ত ক্রুদ্ধ কাজী চিৎকার ক'রে বলেন, ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মারা গিছে।

: কাজীদা। খাড়ায়ে যাও। কি হইছে....কি হইছে তুমার ?

: আশমান আর আশমানে নাই। এত্তকাল ছিলো। আইজ হুড়মার কৈরে ভাইঙ্গা আমার মাথার উপুর পৈড়ছে... ভীষণ ভারী। আমি সৈতে পারিনেকো...ঈশ্বরদা।

বলে উল্‌কার গতিতে ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন কাজী। সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজেই ছুটতে অসমর্থ। তার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

হাওয়ায় রক্তের গন্ধ পায় ঈশ্বর।

চারদিকে মাঠভাঙা রোদ্দুর। সূর্যটা এখনও মাথার উপর ওঠেনি। এরই মধ্যে ঠায় বেশিদূর তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অনেকদিন বৃষ্টি নেই। ক্রমশ গাছ-পালা-হলুদ হ'তে শুরু করেছে। মাটি ফেটে চৌচির।

নদী-নালা-দিঘি শুকিয়ে যাচ্ছে।

মেঘ জমে। ঘন-কালো জমাট হওয়ার আগেই দূর দিগন্তে উড়াল দিয়ে পালিয়ে যায়।

রোজই মেঘ আর হাওয়ার এই রকম ইয়ার্কি চলছে। ওরাতো আসলে

ইয়ার দোস্তই। কিছুতেই বর্ষণ হয়ে তৃষিত তাপিত মাটিকে শান্ত করছে না। এই নামছি-নামবো করছে, কিন্তু কিশোরী মেয়ের মতো অস্থিরতা। চাঞ্চল্য। পালাই পালাই খেলায় তার আনন্দ। চৈতি ফসল মাঠেই পুড়ছে।

ঈশ্বর মাথার পাগড়িটা ঠিক করতে করতে কাজীপাড়ার পথ ধরে। ছায়াহীন অনেকটা পথ পার হতে জিভ্ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু না গিয়ে যেন উপায় নেই। কাজী তাকে ধন্দে ফেলেছে। এ ঘটনা তার কাছে অদৃষ্টপূর্ব। কাজীর মতো মানুষ ওইভাবে ছুটে চলে গেলো কেন। কিসের আশমান ভেঙে পড়লো তার মাথায় ? কেন ?

জোরে জোরে হেঁটে যেতে যেতে হাঁপাতে লাগলো সে। তবুও ঈশ্বরকে এইভাবে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হচ্ছে যুগ যুগান্ত। যখন মানুষ খাবি খায় অনন্ত দুঃখ কষ্টের বৃশ্চিক দংশনে, বেঁচে থাকার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে মৃত্যুর প্রার্থনা জানায়, ঈশ্বর ছুটে যায় এমনি দ্রুত পায়ে হেঁটে। তার শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার পরোয়া করলে তো চলে না। তাকে লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয়।

ঈশ্বরকে চেনে না, এমন মানুষ চব্বিশপরগনার এই অঞ্চলে কে আছে ? কিংবদন্তীর মানুষ ঈশ্বর বাউলকে কেউ কোনোদিন কারো কাছে হাত পেতে ভিক্ষে নিতে দেখেনি। কেউ সেধেও একটা টাকা, বা একটা আধুলি-সিকি কোনো দিন তার হাতে গুঁজে দিতে পারেনি। ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়। একতারা বাজিয়ে চলে যেতে যেতে গান ধরে—নাউ আছে, খেওয়ানী নাইরে, মানুষ নাইরে পাড়ে, আমি ডাক দিমু কারে।

কি ক'রে চলে ঈশ্বরের ?

কেউ বলে ঈশ্বর সি আই ডি-র লোক। কেউ বলে ডাকাতদের খোঁজদার। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় মানুষের ঘরে দুয়ারে। তারপর খোঁজ খবর নিয়ে সঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দেয় দস্যুদের। ওরাই খরচ চালায় ঈশ্বরের। ও হলো ডাকাতের সর্দার।

কেউ বলে ঈশ্বর সাধকেরও সাধক। জ্যোতির্ময় পুরুষ। ওর ভুক লাগে না। তৃষ্ণা পায় না। ঈশ্বরের গান গাইতে গাইতে ঈশ্বর ইহজাগতিকতার উর্ধ্বে পৌঁছে গেছে। নিজের কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি। অথচ কে কবে শুনেছে, সে ঝুলিতে ভিক্ষে চড়ে না। যেচে টাকা-পয়সা দিলে ঘেন্নায় ফিরিয়ে দেয়। আর ওই একটা গান সব সময় ও গায়। নাউ আছে খেওয়ানী নাইরে/মানুষ নাইরে পাড়ে/আমি ডাক দিমু কারে ?

নৌকো আছে। মাঝি নেই। নদীর কূলে ন...

পার হওয়ার জন্তে কাকে সে ডাকবে?

নানাজনের নানা ব্যাখ্যা। কেউ বলে আধ্যাত্মিক মার্গের গান। ঈশ্ব. উপাসনা। কেউ তা অস্বীকার করে। বলে, এ হলো সমাজ রূপান্তরের আহ্বান।

ঈশ্বর তাহলে লালঝাণ্ডাঅলাদের অস্ত্র-শস্ত্রের জোগানদার?

এইভাবে ঈশ্বরের দিন বহে যায়।

যদি ঈশ্বরকেই প্রশ্ন করা হয়, তুমি কে?

অবলীলায় সে বলে দেয়—আমি ঈশ্বর। তুমরা সারাজীবন ছুই নাম্বারী কৈরে—যারে ঘুষ দিয়্যা বৈতরণী পার হত্তি চাও।

উত্তর দিয়ে সে হাহা ক'রে হাসে। মেয়েমহলে তার কদর বেশি। ঈশ্বর কোনো তাবিজ-কবজ দেয় না। অসুখ বিসুখে টোট্‌কা ওষুধ দেয় সে। সবই গাছ গাছড়া। সে বোঝায়, তাবিজে কবজে ফাঁকিবাজি। কুনো ফল হয় না। অসুখ তুমার শরীলের ভিতরে, তা সেই ভিতরের চিকিচ্ছে করা দরকার। ঘা'র উপুরে ওষুধ না পড়লি কি হয়? কিচ্ছু হয় না। যারা ধান্দাবাজ, তারা তাবিজ কবজের বেসাত্তি করে।

কেউ যদি বলে, ঈশ্বরঠাকুর, অ যার আইবুড়ো মেয়েডার বিয়্যা হয় না। কেউ গিয়েন করিছে। তুমি একবার ঝাঁড়-ফুঁক কৈরে গ্যাও। না হয় একটা কবজ।

রেগে যায় ঈশ্বর। ধমক দিয়ে বলে, কেউ তুমার মেয়ারে গিয়েন করে নাই। মেয়ার যে তুমার রংডা কালো? যৈতুক দিত্তিও জান যায়. আসল গিয়েন এইখেনে। সেই জন্তি বিয়্যা হয় না। যদি এক টাকার জাগায় পাঁচ টাকা যৈতুক দিত্তি পারো তো কাইল বিহানেই বর জুটি যাবানে। পাইরবে?

মেয়ের মায়ের মুখে বিষাদ—কনে পাবো বাবা? সোমসার চালাত্তি পারিনে কো।

তখন মাথা নাড়ে ঈশ্বর—তাহলি বোঝো, তাবিজের কুনো কেরামতি নাই।

কারো বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনি শুনলে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে সেখানে। ঝোলা থেকে চাল বের ক'রে কুলোয় ঢেলে দিয়ে. বলে—আমার ক্ষিদে নাইরে। তুরা ফুটায়ে খাগে।

কোথায় কে তার ঝোলায় চাল তুলে দেয় কেউ তা জানে না। শুধু হৃদয় দিয়ে বোঝে—ঈশ্বর ঈশ্বরই। তার তুলনা সে নিজেই।

মুকুন্দ সাহার খুব অন্তরঙ্গ মানুষ ঈশ্বর। যখন তার অবসর সময়, সেসময় ঈশ্বর গান গেয়ে শোনাতো। একটার পর একটা। সুরের পরে সুরের খেলা। গাঁও গেরামের মিঠে সুরের সেই গানে মুকুন্দ সাহার প্রাণে ছন্দ নাচতো।

সপ্তাহে দু'তিন দিন ঈশ্বরের গান না শুনলে মুকুন্দ সাহার চলতো না। আর সেও তো তেমনই। কেউ খোঁচা মেরে যদি জিজ্ঞেস করতো—অ ঈশ্বর দাদা, ওই বুড়াটার সাথে তুমার অ্যাতো খাতির ক্যা? আমাগরে তো একটা গানও শুনাও না। বুড়ারে দশ-পনেরোখানা এক বৈঠে বৈসে শুনাও যে? কি ভায় সে তুমারে।

খুব রাগ হতো ঈশ্বরের। ভ্রূ কুচকে তাকিয়ে দেখতো প্রশ্নকারীকে। দেখতে দেখতে ফোঁস ক'রে বলে উঠতো—কুলাঙ্গারের মতো কথা কও কেন? হুঁশ থাকে না কথার? তুমার বাপের সাথে তুমার অ্যাতো খাতির কি জন্নি? বাপ তো বুড়া ভাম।

প্রশ্নকারী চুপ। আর কোনো কথা বলতো না। রঙ্গলাল দাগা একবার বাজার সমিতির উদ্যোগে গান-বাজনার আয়োজনের দায়িত্ব দিলো দীপক সান্যালের ওপর। অনেক নামী-দামী শিল্পী এসেছিলো রামেশ্বরপুর বাজারে। সেখানে গান গাইতে ডাক পড়লো ঈশ্বরের। ঈশ্বর হাজির যথাসময়ে মঞ্চে। একতারা হাতে। পরিচ্ছন্ন গেরুয়া বসনে। মুখে মিটি মিটি হাসি। গাঁয়ের মানুষ তো ভাবতেও পারেনি এই আসরে গান গাইতে রাজি হবে ঈশ্বর। দীপক সান্যালদের তো সে প্রকাশ্যেই গাদ্দার বলে গালি দিতো। ওরা ছিলো ঈশ্বরের চোখে অমানুষ।

তাদের জলসায় ক্যাপা ঈশ্বর বাউল একতারা হাতে?

একটা আনন্দের শোরগোল উঠলো....

সবাই ভেবেছিলো ঈশ্বর তার সেই প্রিয় গানটা দিয়ে শুরু করবে। কিন্তু শুরু করলো অন্য রকম গান দিয়ে। বিশুদ্ধ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে।

: নমস্কার গো বাবু মশাইরা। নমস্কার। এই আসরে ডাক পড়েছে আমার মতো ভিখেরির। সেতো আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি। যেখানে মরুভূমির লোক আসল ভিখেরি রঙ্গলাল দাগারা লোটা কম্বল নিয়ে এসে আজ

আমাদের সকল ঘরের লোটা কম্বলে টান দিয়েছে—এ আসরের তিনি আয়োজক হে। তো গান যদি শুনতে চান, তো শোনাই, কোন চোরের আয়োজনার সভায় আমার মতো ঈশ্বরের গান গাওয়া চলেনা। এই আমার গান। ক্ষমা করবেন অধম এই দীন ভিখেরিকে। নমস্কার আপনাদের চরণে। ঘৃণা দাগাবাবুদের। যারা চাষা-ভুষোর মনে প্রাণে দিয়েছে গো কঠিন দাগা।

ব্যস্। নেমে গিয়েছিলো ক্যাপা ঈশ্বর আলোঝলমল মঞ্চ থেকে।

সেই থেকে সে দাগা-গোষ্ঠীর জানী-দুশমন। কিন্তু সেদিন সে যখন মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলো হাসিমুখে, সেই সময় তুমুল করতালিতে মুখর হয়ে উঠেছিলো হাজার শ্রোতার আসর। চার দিক থেকে 'গুরু' 'গুরু' আওয়াজ উঠেছিলো।

সেই আসরে কাজীও ছিলেন। শুনেছিলেন ঈশ্বর বাউল গান গাইবে রঙ্গলাল দাগাদের আসরে। তার অসীম কৌতূহল হয়েছিলো মনে। ভেবেছিলেন, ক্যাপা পাগলের কখন কী খেয়াল হয় কে জানে! ছেলেদের জিজ্ঞেসও করেছিলেন। তারা কেউ কিছু বলতে পারেনি। এক সপ্তাহের ওপর তাদের কারো সাথেই ঈশ্বরের দেখা হয়নি। তারাও শুনে অবাক। কেউ কেউ ক্রোধও প্রকাশ করেছিলো। মুকুন্দ সাহার যে দু'চারজন 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' ক্যাডা'র ছিলো—তারা তাকেও ঠুকেছিলো খুব। ভাবখানা, 'কি হে বুড়ো, এবার তো হাটে হাঁড়ি ভাঙছে।'

মুকুন্দ সাহা কাজীকে অপ্রসন্ন মুখে বলেছিলেন—দেখেন গে তো—কি গান গায় ঈশ্বর। যত সব পাগল নিয়্যা আমার ইজ্জৎ যায় এখন।

মঞ্চ থেকে উদ্ধত ভঙ্গিতে নেমে এলে ঈশ্বরকে খুব সাবাস দিয়েছিলেন কাজী। বলেছিলেন—এযে দশলাখ মানুষের জনসভার সমান কাজ···। কাইল সারা চব্বিশ পরগনায় এ খবর ছড়ায়ে যাবে লোকের মুখে মুখে। জেবনে অ্যামন কাণ্ড দেখি নাই ঈশ্বর। কি দেখাইলা তুমি।

এ হৈলো তুমার আসল ক্যাপা রূপ।

ঈশ্বর ছিলো গম্ভীর। কোনো কথার উত্তর না দিয়ে সে একতারা হাতে মাঠের পথ ধরেছিলো আর আপন মনে গাইতে শুরু করেছিলো তার প্রিয় সেই গানটি···আমার নাউ আছে খেওয়ানী নাইরে, মানুষ নাইরে পাড়ে, আমি ডাক দিমু কারে···।

সেই ঈশ্বর বাউল এখন ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়ে এসে হাজির হয় কাজীবাড়ির আঙিনায়। মাথার পাগড়ি খুলে মুখের ঘাম মোছে। সমস্ত শরীর জুড়ে দাউ দাউ রোদে পোড়া জ্বালা। তেষ্টায় বুক গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু গলা চড়িয়ে ডাক দেয়—কাজীদাদা, ও কাজীদাদা··· ।

নসিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ডাক শুনে। ঈশ্বরকে দেখে মাথার ঘোমটা টেনে নত মুখে বোধহয় কান্নার আবেগ সামলাতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বর এগিয়ে যায় আরো খানিকটা। কাছে গিয়ে বলে—ভাবীগো....সেই কথাটা—বলি 'কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন।' মানেডা কী কোত্তি পারো? আমি কই। আমি কই? যে চোর সেতো সাধু সজ্জনগরেও চোর মনে করে। তো এসব নিয়্যা দুঃখ পাতি হয় না। সোময় সবকিছু সাব্যস্ত কৈরে দ্যায়। আমাগরে কি দায়িত্ব? যাতে সেই সোময়ডা সঠিকভাবে—সঠিক সোময়ে আসে তার চিন্তা করা।

নসিরণ ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন—মানুষটা তো মানুষ নাই দাদা। ঘরে গিয়া দ্যাখেন পুট্‌লা-পাট্‌লি বান্দা-ছান্দা করতিছে।

: ক্যা!

: আইজ রাইতেই সে চৈলে যাবে গেরাম ছাইড়ে। থাকপে না।

ক্লান্ত ঈশ্বর সবেগে মাথা নাড়ে—চলো, ঘরে চলো। যাতি চালিই যাওয়া হয় না। জাফরকাজী আমাগরে মুকুটহীন রাজা। রাজা কনে যাবি? ও কাজীদাদা···

কাজী মুখ তুলে তাকালেন না। সাড়াও দিলেন না। এক মনে থম্‌থমে মুখে ঘরের জিনিসপত্তর গোছগাছ করেন। তাকে তখন অন্য গ্রহের মানুষ মনে হয়। এ পৃথিবীর সাথে তার কোনো নাড়ির বন্ধন নেই। কোনোদিন ছিলোও না। এখানে এসেছিলেন দু'দিনের অতিথি হয়ে। আতিথ্য তার শেষ। এবার যাবার পালা। তাই 'পশ্চাতে ফিরে চাহিবার নাইযে সময় তার।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে ঈশ্বরের মুখে হাসি ফোটে। সে তার ক্লান্তির কথা ভুলে যায়। তেষ্টার কথাও মনে থাকে না। এই সেই কাজী, ঈশ্বরের আরস কাঁপলেও যাকে টলানো যায়নি কোনোদিন। নিজের গোত্রের মোল্লা-মৌলবীরা যার বিরুদ্ধে 'কাফের' ফতোয়া জারি করেছে বারবার। বয়কট করেছে তার হাতের খাবার দাবার।' কোনো সামাজিক দায়। কিন্তু কাজী

তাতে টলেননি। তিনি হাসি মুখে চাষা-ভুষোদের দলে মিশে গেছেন। তাদের তৈরী করেছেন। তোমার অসুখ, কাজী আছেন। ডাক্তারের ব্যবস্থা হবে। ওষুধের ব্যবস্থা হবে। শুধু সময়মতো তাকে জানিয়ে দিয়ে এসো। কি, তুমি রিলিফ পাওনি? রেশন কার্ডের জন্যে পায়ের তালু ক্ষয় করছো? কাজী আছেন। চলে যাও। তোমার ছেলের ইসকুল যাবার বয়স হলো? ঠাঁই মিলছে না? কাজীকে বলো।

না। কোনো অনুরোধ করতে হবে কেন? তিনি খুশি হবেন। চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখবে। তিনি তো বলেন, তুমরা মুসলমানরা আবারও আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে ফিরা যাতিছো। আরে মুহম্মদ তো খালি নবী নন, তিনি তো বিপ্লবীও হে সেই যুগে। তিনি নিজে ক্রীতদাসকে নিজির ছেলে হিসেবে বরণ কৈরছিলেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিছিলেন। তুমাগরে চোক্ষুতে আঙুল দিয়া দেখায়া দিছেন তিনি—'আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।' তার মানে কি? তার মানে তুমি ক্রীতদাসগরে মুক্তির কথা কও, আর তুমার নিজির ঘরে সারি সারি চাকর-বাকর। তাগরে চাকর-বাকরের মতোই খাতি পরতি দ্যাও। মাইনে পত্তরের তো চৈদ্দ রকম বাহানা। সেই জন্যিই নিজির চাকররে ছেলে বৈলে ঘোষণা কৈরলেন। মুহম্মদ কৈছেন ল্যাখাপড়া জ্ঞান অর্জনের জন্যি দরকার হলি চীনে যাও। তার মানে কি? অন্ধকার থিকে আলোর দিক পা বাড়াও, তুমরা যারা কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুব দিয়্যা নষ্ট হয়া যাতিছো। জ্ঞান-বুদ্ধি হলি বিবেকের উদার চিন্তা। বোকা মূর্খ থাকলি বিবেক হয়া যায় শয়তানের বশীভূত। যার জ্ঞান-বুদ্ধি উদারতা নাই, তার গুনাহেরও সীমা নাই হে। মূর্খতাই তো গুনাহ। সব থিকে বড় পাপ। সেই পাপকে তাড়াতাড়ি হবি। না হলি মুসলমান হয়তো হতি পাইরবে, কিন্তু জগতের আলোকিত সভায় তুমাগরে কুনো স্থান হবিনে।

ঈশ্বর গুনগুনিয়ে গান ধরে—'ওরে ও পাগলা ভোলা, দেরে দে প্রলয় দোলা, গারদগুলা জোরসে ধরে হ্যাঁচকা টানে, মার হাঁক হায়দরি হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ডাক, ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।'

কাজী চোখ তুলে তাকালেন ক্ষণিকের জন্যে। চোখাচোখি হয়ে যায় দু'জনের। দরজায় ঠেস্ দিয়ে নসিরণ তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে উদাসিনী। মুখে আঁচল চাপা। ঈশ্বর হাসে ঈশ্বরের মতোই। কাজী আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মনে মনে কঠিন হতে চাইলেন। না, কোনো পিছু

ভাকে আর ফেরা নয়। কোনো মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া নয়। তিমিরপুরের আকাশে বাতাসে বিষ ছড়িয়ে আছে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে প্রতিমুহূর্তে ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

তিনি পুট্‌লি বাঁধতে লাগলেন দ্রুত হাতে।

ঈশ্বর হাসিমুখে গান গায় আবার—ও আমার পাগল মন/তুমি ভাবছো বসে সর্বক্ষণ/উড়াল দিবে যেথায় আছে শান্তিবন/পাগল রে তুই ভাবলি কিসে/নেইকো সেথায় বিষ-পবন॥ গান গাইতে গাইতে ঈশ্বর এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কাজীর কাছে। তারপর শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরে কাজীর বাঁ হাতের কবজি।

: কাজীদাদা।

: তুমারে তো আমি ডাকি নাই ঈশ্বর!

: নামডা যে আমার ঈশ্বর! শালার সেডাইতো মুশকিলির কথা। পারিনাকো পলায়ে পলায়ে দায় এড়ায়ে যাতি। জানো কাজীদাদা, আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে, মানুষ কাঁদে.. ....আমিও কাঁদি ক্ষ্যাপা পাগলের বেশে। পলাতি চালিউ পলাতি পারিনাকো তাই...।

: ঈশ্বর। আমার সোময় নাই। তুমি যাও।

: কেডা থাকে কাজীদাদা? থাকে মানুষের ভালবাসা। ভালবাসা-প্রেম যে চিরন্তন। তার মরণ নাই। তার বিনষ্টি নাই। তুমি সেই ভালবাসার রাজা হয়া কনে যাবে?

: যেখানে বাতাসে বিষ নাই।

: বিষ নাই বাতাসে—অ্যামন স্থান তুমি এই পোড়ার স্থাশে খুঁজে পাবা না গো। কও, তুমি জেবন যুদ্ধে এক পরাস্ত সৈনিক। নিজের জেবনডারে আড়াল করতি পলয়া যাতিছো চোরের মতো।

: না। না। আমি কাজী জাফর ইমাম। আমি পলাতি পারি না। যেন আহত বাঘ আচমকা গর্জে উঠতে চায়। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায় নিষ্ঠুর শিকারীর সন্ধানে। ঈশ্বরের মুখে সেই এক হাসির ছায়া নেচে নেচে কোমল পরশ ছড়ায়। সে হাত ধরে টেনে তোলে কাজীকে: চলো দিঘির পাড়ে বসি গিয়া হিজল গাছটার নিচি। বড় খিদে পায়ছে আমার। ও ভাবী, চারডে মুড়ি দিও গো-প্যাজ কাঁচা-লঙ্কায় এট্টু সরষের ত্যাল মাইখে।

কাজী হাত ছাড়িয়ে মাথা নাড়েন—তুমি খাওগে। আমার গোছ-গাছ আছে।

এবার ক্রোধ প্রকাশ করে ঈশ্বর—ভীরু, দুর্বল-কাপুরুষের মতো কথা কও ক্যা কাজীদাদা? আমার কাছে এ তুমার কি রকম কথা গো? তুমারে আমি হাঁড়িতে-নাড়িতে চিনি। আমারও সব কিছুই তুমি জানো। কি, জানো না? জানো না? কও, আমার কথার কুনো দাম নাই?

কাজী মাথা নত করেন।

তার বুক ভেঙে হু হু ক'রে কান্নার জোয়ার ছুটে আসে।

সেই থর থর কাঁপন তার চিবুকে। ফুলে ওঠা চোয়ালে। দ্রুত নিঃশ্বাস প্রক্ষেপণে।

: ঈশ্বর।

: এই তিমিরপুর ছাড়া কি আর কুনোখানে হারু মণ্ডল—সান্যাল—রঙ্গলাল দাগারা নাই? উগারে গ্যাশ জোড়া হাঁ। হালুম হালুম কৈরে সবখানে গরীবের হাড়-মাস্ চিবায়া খাতিছে। নিস্তার নাইগো পলায়া যায়া। তার থিকে এই আলো-হাওয়া-জলে-মানুষে-বেক্ষ-লতায় তুমার যে পরিচয়, তারে শক্ত কৈরে ধরো......যত উথাল পাতাল হৈক বিপদের জোয়ার, আইসো-শ্যাষবারের মতো বদর বদর কৈরে নাও ভাসাই···। আমি যে আজন্ম তারই দুঃখের গান গাতিছি। নাউ আছে, আমার খেওয়ানী নাই....খেওয়ানী নাই....। ও জাফর দাদা, তুমি তো মুসলমান না। তুমি তো হিন্দুও ন'। তুমিও তো সেই কবে শোনাইছিলে তুমি মানুষ। তো সেই মানুষ তুমি পলাতি চাও? হারু মণ্ডলগরে খাবার মদ্যি তুমার হাজার ভুকা মানুষকে ঠেইলা দিয়া .. তুমি যদি পলাতি চাও তো পলাও। কিন্তু তার আগে একবার ভাইবা দেইখো—ওই মদন, ওই গাজিয়ুল, রহিমুদ্দি, কলিমুল্লাহরা, ওই কুঞ্জ বাগ্‌দিরা তুমার আদর্শের টানে জোয়ারের বান হয়া আইজ খালি ভুকা প্যাট না, মাথার উপরে নৃমুণ্ডু হওয়ার খড়্গ নিয়্যা ফেরারী জেবন বাইছা নিছে। তারা কনে যাবি? তাগরে কি হবি? তুমার ছেলে মদনের কপালে তুমার হাতের আঘাতের ঘা কুনোদিন কি মুছে যাবি? কি কবি মদন? ঘেন্নায় মুখ ফিরায়া অস্বীকার কৈরবে তুমার পরিচয়। পিতৃত্বহারা বৃদ্ধ জাফর কাজীর নাম শুনলি একদিন তিমিরপুরের মানুষ ধিক্কার দিবি। কাজীদাদা, ইতিহাস ক্ষমাহীন। কারো পাপ সে রেহাই দ্যায় না।

ক্রোধ—৯

: ঈশ্বর। ওরে ঈশ্বর।

কাজী সবেগে তার প্রসারিত বাহুতে ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরেন

তারও একমাস পরে পঞ্চায়েতে পুনর্নির্বাচিত হারু মণ্ডল তার ভক্তবৃন্দের জড়াজড়িতে হাসতে হাসতে বিরক্ত হয়ে যায়। কারণ তার ধ্যানস্থ মূর্তি মন্দিরকে অলৌকিক করছিলো তখন।

চারদিকে হারুভক্তের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগলো : হায় হায় করিলো, লালঝাণ্ডা হারিলো।

হোচিমীন—মাও মাও—লালঝাণ্ডা চীনে যাও।

শ্যামা মায়ের শ্যামা ছেলে—হারুমণ্ডল যুযুগ জিও।

যুযুগ জিও। যুযুগ জিও।

ধেনো মদের মাতম। জিকির। বাবড়ি চুল, হিপি চুল—ডান-বাম-ডান বাম।

আর শ্লোগান। শ্লোগান। শ্লোগান।

যুযুগ জিও। যুযুগ জিও। যুযুগ জিও। যুযুগ জিও।

তোমার আমার ঠিকানা—মণ্ডলের নিশানা।

মণ্ডলের নিশানা—তোমার আমার ঠিকানা।

পাঁঠা কাটা রক্তে ভেসে যায় শ্যামামায়ের বিগ্রহের সামনের যূপকাষ্ঠ।

পচিশটে পাঁঠা।

কাঁশর-ঘণ্টা....

ধেনো মদ...

হা-হা উল্লাস।

যে যার মতো উৎকট চিৎকারে নেহরুপরিবারের সাংস্কৃতিক বিজয় নিশান উড়িয়ে উড়িয়ে হিজড়ে হয়ে যায়—মেরে আঙ্গিনামে-তুমহারা কিয়া কাম হ্যায়। জিস্‌কো বিবি মোটি...

এক কামরে বন্দ হো ··

নাচে অনাদি খাসকেল। চিৎকার করে—ওয়াক ওভার পাইছি আমরা।

লালঝাণ্ডা শুয়ারকি বাচ্চারা তো মাঠেই আসে নাই।

খালি মাঠে গোল।

হুই—এক কাম্‌রে মে বন্দ হো···হুম্‌-তুম্‌...

জিকির জিকির জিকির জিকির...

তালে তালে কোমর দুলিয়ে নাচের নামে তাণ্ডব।

এক দেবী এক দেশ...

জিকির জিকির জিকির জিকির।

শ্যামা মা কি আমার কালোরে...।

জিকির জিকির জিকির জিকির...

ধাই-হাঁ, ইয়া-হাঁ-হিঁসি হিঁসি হিঁসি হিঁসি

ঝুক্‌ ঝুক ঝুকুর ঝুক্‌...

জিকির জিকির জিকির জিকির....

নাচ মেরে বুলবুল কা পয়সা মিলে গা...

বন্দে মাতরম...

বন্দে-এ-এ-এ-এ মাতরম্‌...

জিকির জিকির জিকির জিকির...।

মান্নদারে মান্নদা—আমাদের মান্নদা। গরীবের মান্নদা। সর্বহারার মান্নদা। জিকির জিকির জিকির জিকির।

হারু মণ্ডলের মুদিত নয়ন। আনন্দে জলধারা বহে যায় মন্দিরের লালরং শানের ওপরে বসে। তার গরদের বসন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্ত চন্দন। মাঝে মাঝে মুদিত নয়নে ঠোঁট নড়ছে। কখনো হাসি হাসি ভাবের আবেশ। কখনো অঝোর কান্নার আবেগ। কাঁপছে। নড়ছে। মাথাটা দুলছে একটু একটু।

ভক্তেরা আসছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে। পুরোহিত তাদের হাতে চরণামৃত দিচ্ছে। জবাফুল বেলপাতা দিচ্ছে।

ভিড় ভিড়।

সন্ধ্যাকালীন উৎসব মুখর শ্যামাভক্ত মণ্ডলের মন্দির আঙিনা।

বিড় বিড় ক'রে শ্যামাসঙ্গীত গাইছে মণ্ডল—শ্যামা মা কি আমার কালোরে....। আর কাঁদছে। অঝোর ধারায় কাঁদছে।

আহা। সাইক্ষ্যাৎ পরমহংসরে। কলিকালের পাপবিমোচন ঠাকুর আমাগরে। ও ঠাকুর, ঠাকুর, তুমার চরণে ঠাঁই দিওগো...

জিকির জিকির জিকির জিকির।

হুইস্কির নেশায় টাল-মাটাল দীপক সান্যাল তখন হারু মণ্ডলের শয়ন শয্যায়। 'ফিলিম ইস্‌টারের মতো দেখতি বিউটিরানী।' মণ্ডলের ছোট বউ। তার পায়ে মল। সে মল বাজিয়ে হাঁটে। গায়ের গহনায় আলো ছড়িয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে হাসে। ল্যাকমের প্রসাধন সামগ্রী সব সান্যালের দেওয়া। ঠোঁট রাঙিয়ে তাতে আবার ঝক্‌ঝকে দ্যুতি ছড়ানোর জন্যে লিফগ্লোস লাগিয়ে রাখে, সময় নেই অসময় নেই। হাতকাটা জামা ছাড়া তার চলে না। হাঁটে বুক চিতিয়ে। উদ্ধত ভঙ্গিতে। কচি কলাপাতার রং তার শরীরে। চোখের তারায় রাজ্যের আলস্য। হাই তোলে।

আলস্য। বড় আলস্য তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

সান্যালের বুকে খুব নরম ওম্‌। শীত সকালের কুসুম কুসুম রোদের উত্তাপ! এখন সান্যালের বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে সে কুঁই কুঁই বেড়াল ছানার মতো আদরের হাতছানি দেয়।

এই বিউটি সান্যালের গরীব বউয়ের দূর সম্পর্কের ততোধিক গরীব বোন। সাতকুলে নাকি কেউ নেই বিউটির। সে না থাক। মাথা ব্যথা নেই সান্যালের। বিউটিকে একনজর দেখেই তার বুকের ভেতরে জখমী হয়ে যায়। আহা। কী জিনিস। কুমোরটুলির রমেশ পালের পিরতিমে যেন। প্রথমে স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলো সান্যাল—হবে না বাপু। আমার কি রাজার ভাণ্ডার? যখন খুশি দান খয়রাত করতি হবে? অন্যত্র যাতি কও।

সান্যালের বউ উর্মিলা কেঁদে কেটে একাকার। দুপুরের ভাত খাওয়া শেষে ঘরে পান দিতে এসে স্বামীকে অনুনয় করে—তুমার কিসে ঘাটতি আছে কও? রাজার ভাণ্ডারই তো তুমার।

সান্যাল উর্মিলাকে আরো রাগ দেখায়—আমি ঘুমাবো এখন। ভিখিরি টিকিরির জন্যি সরকারি অথিতিশালা আছে। সেখেনে যাতি কও। বলে শুয়ে পড়ে সান্যাল।

উর্মিলা তখন কাঁদে। স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে অনুনয় করতে থাকে—দেখিছো তো, কী রূপ যৈবন আবাগির। কনে যাবি? শেয়াল শকুনে খাম্‌চে খুবলে খাবি গো। দোহাই তুমার, তুমি অমত কৈরো না আর।

: রূপ যৈবন আছে তো আছেই। আমার কি তাতে।

: সে কথা না।

: তো কি কথা।

: বড় আশা নিয়্যা আইছে।

মনে মনে হেসে খুন হয়ে যায় সান্যাল। ওরে কুত্তি মাগী। আমার কি চোক্ষুর মাথা গিছে? আমি কি দেখি নাই? রাধেরে তোর শ্যামের বাঁশী বাজে আমার বুকে। আহা-আহ। তুই কি দেখাবি আমারে কুত্তি। তুই তো শালী ভাতের হাঁড়ির উল্টা মুখ। আমাবৈশ্যার মিশমিশে আঁধার। খালি একপাল জন্মালি তোর কালা কুচ্ছিৎ গভ্যো থিকে। ওই শিপকটা শুধু চাঁদের আলো। বাকি পাঁচজন খেদি-বুঁচি-টেপি-ক্ষেন্তি-পাওমুছি। একপাল শুয়ারের বাচ্চি। নিজেরই শালা ঘেন্না করে। কোনোদিন বিয়া-শাদি হবিনে। আর তুই? পুরান-পচা-গন্ধ। ওয়াক্-থু। পাঁচ পাঁচটা কুত্তির মা বুড়ানি।

বিউটি মানে চাঁদ। আশমান নইলা নইলা রং। আমার ইহকাল, পরোকাল, জেবন-ধম্মো কম্মো সাথ্যক হবি আইজ। প্রকাশ্যে বলে—মাথা ধৈরছে আমার।

রাধেরে তোর শ্যামের বাঁশী বাজে যমুনায়...। উর্মিলা বলে, বিউটিরে পাঠায়ে দেই। টিপ্যা দিবানে!

অবশেষে রাজি হয়ে যায় সান্যাল। আর পাঁচ-পাঁচটা কুত্তির মা বুড়ানি—শালী চৈদ্দ বছরের কালা কুচ্ছিৎ মাগী দৌড়ে যায় আনন্দে তাক্ ধিনাধিন নেচে।

সে আসে নইলা নইলা রং ছড়িয়ে। ভীরু হরিণীর মতো চোখ। সেই চোখে সেদিনও গভীর আলস্যের ছায়া দেখেছিলো সান্যাল। দ্রুতবেগে ওর বুক নিঃশ্বাস টানছিলো...।

মাথায় চঞ্চল আঙুলের ছোঁয়ায় শিহরিত সা[illegible] ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকে। থাকতে থাকতে নিজেকে একসময় মীরজাফরের ভূমিকায় শিশির কুমার ভাদুড়িতে পরিবর্তিত করে।

কি ঘুম সান্যালের। নাক ডাকার শব্দ হতে থাকে। নাক ডাকতে ডাকতেই সান্যাল হিসেব করে, উর্মিলা এখন রান্নাঘরে। সেই পাঁচটা পিঠোপিঠি কুত্তিকে খাওয়াচ্ছে। ওদের খাওয়া হলে নিজে গিলতে বসবে। খায়তো শালী এক-কিলো চালের ভাত।

সে নাকের গর্জন বাড়িয়ে ঘরে একটা নিশ্চিন্ততার হাওয়া ছড়িয়ে—অঘোরেই পাশ ফিরে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বিউটিকে। যেন স্বপ্ন দেখছে, তেমনি নিখুঁত অভিনয়ে বিড়বিড় ক'রে বলে—ও উর্মিলা, শোও দেখি।

বিউটি তখন একটু শক্তি খাটিয়েছিলো। হয়তো বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলো একটু। কিন্তু মুখে কোনোরকম শব্দ করেনি। সান্যালের মাথায় দাউ দাউ আগুন। বুকের ভেতরে দপদপানি। চোখে তার গভীর ঘুম। হ্যাচকা টানে মাথার কাছ থেকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো বিউটিকে। এনে তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলো। একটু ছট্‌ফট ক'রে উঠেছিলো বিউটি। তার বেশি না।

সান্যাল ওর বুকের সঙ্গে মুখ ঘষতে ঘষতে যেন উর্মিলাকেই সে আদর করছে বুঝিয়েছিলো বিউটিকে—উর্মিলা, তুমি এখনো খুব তাজা আছো... ।

আশ্চর্য, আর এগোয়নি সেদিন। তার হাত-পা যেন ঘুমের মধ্যে ডুবে গিয়ে শিথিল আলগা হয়ে গিয়েছিলো। বিউটিকে ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পডার ভান করেছিলো। তার মনে হয়েছিলো বিউটি যেন একটু সময় নিয়েছিলো উঠে যাবার।

সেই একটা নিয়মিত রুটিন হয়ে গেলো। রোজই মাথা ধরা নিয়ে বাড়ি আসতে শুরু করেছিলো সান্যাল। বিউটিও মাথা টিপতে চলে আসতো।

একদিন বিউটিকে সে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো অকূল সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ভেঙে। কোনো প্রতিবাদ করেনি বিউটিরানী। শুধু ফিস্‌ফিসিয়ে বলেছিলো, আমার ভয় করতিছে।

: ভয় নাই।

: দিদি যদি জানতি পারে ?

: না সে এখন গোগ্রাসে ভাত গিলতিছে। চক্ষুশূল আমার কুত্তি মাগীডা। তুমারে আমি রাজরানী বানাবো-গো-বিউটিরানী।

কিন্তু উর্মিলা একদিন টের পেয়ে গেলো। যত হাবাগোবাই হোক, মেয়েমানুষের আলাদা একটা চোখ আছে হয়তো। সে খুব অশান্তি করলো। কান্নাকাটি-চিৎকার চেঁচামেচি। উলটে সেদিন সান্যালই উর্মিলার কাছে জোড় হাত হয়ে বললো—ইজ্জৎ যাবি তুমার বৈনের। চুপ কৈরে থাকো।

: না। কিছুতেই চুপ করবো না আমি। হা ভগবানরে, আমি দুধ কলা দিয়্যা নিজির ঘরে কালসাপ পুষতিছি।

বলতে বলতে উর্মিলার কান্না। কান্নার সাথে চেঁচানো। সে জানিয়ে দিলো—কুত্তিরে কুত্তি, বেইশ্যের বেইশ্যে, তোরে আমি আইজ খ্যাদামু।

সান্যালের একবার মনে হয়েছিলো উর্মিলার চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘরময় টেনে হেঁচ্‌ড়ে খুব ক'রে পেটাবে। কিন্তু লোক জানাজানির ভয়ে সে পথে না গিয়ে শুধু বলেছিলো: সাতদিনের মধ্যে বিউটির বিয়ার ব্যবস্থা করতিছি আমি।

: না। ওই বেইশ্যের জন্যি তুমারে টাকা খরচা করতি হবিনে।

বউকে আশ্বস্ত করেছিলো সান্যাল—পয়সা লাগবিনে। একপয়সাও লাগবিনে।

উর্মিলা তখন শান্ত হয়েছিলো। কিন্তু অশান্ত হয়েছিলো সান্যাল নিজেই। বিউটিকে হারানোর আশঙ্কায় তখন তার ঘুম নেই। খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই। গদিতে বসে হিসেব কষতে ভুল করে। আর নানারকম প্ল্যান আঁটে। কোনোটাই নিজের মনঃপুত হয় না। শেষে এই প্ল্যান।

শালা হারু মণ্ডল! প্যাকাটি মার্কা বউ। বারো মাসে তেরোটা অসুখ। বুক পিঠ সমান। গলায় একগুচ্ছ তাবিজ-মাদুলি। হাতে কোমরেও। এক কথা বলতে তিনবার কাশে, ঠোঁট হাঁ ক'রে হাঁপায়। টান উঠে মাঝে মাঝেই যায় যায় অবস্থা। তার দিন যায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে। রাত কাটে ঘুমহীন ককানিতে—কাশিতে। ছেলে পুলে নেই। খিটমিটে মেজাজ নিয়ে ন্যাকা ন্যাকা সুর ক'রে কাঁদে আর অদৃষ্টকে দোষ দেয়।

বেচারা হারুর মনে সুখ নেই। রাত হলেই সে বাড়ির ঝি-আয়ার সন্ধান করে। ওতে কি আর তার সাধ মেটে। রসন' তৃপ্ত হয়? হয় না। সান্যাল এ নিয়ে প্রায়ই বলতো—তুই শালা হারামির হাড্ডি। ঝি-আয়া নিয়্যা ফষ্টি-নষ্টি কিসির। বিয়া কর আরাকটা।

হারুর বিয়েতে আপত্তি নেই। সেরকম মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সান্যাল ভাবলো, হারুকে গছিয়ে দিলে বিউটি তার হাতের মধ্যে থাকবে। লোকে জানে—দীপক সান্যাল প্রায়ই হারু মণ্ডলে. বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে মদ খেয়ে। কোনো কোনোদিন বাড়িতেও ফেরে না। বিউটি এলে—তখনো কেউ টু শব্দ করবে না, এবাড়িতে রাত কাটালে বা দিন কাটালে।

প্ল্যানটা মাথায় আসতেই সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। রাতে সেই প্রথম নিজের পয়সায় বাজার থেকে হুইস্কি কিনে নিয়ে মণ্ডলের খাস কামরায় গিয়ে বসে।—আজ মনডা ভাল নাইরে হারু।

হারু তখন মদে চুর।

সান্যাল টোপ ফেলে সেই সময়—তুই খুব দুঃখীরে হারু। বউটার ওই অবস্থা।

হারু বুক চাপড়ে কাঁদে— আমি ইবার গলায় দড়ি দেবো।

: দড়ি দিবি ক্যারে বুকা ছেলে। তোরে হুরপরী দেবো।

: কনে পাবো পরী?

: আমার ঘরে আছে। আমি তোরে পরী দেবো। বিউটিরে দেখিছিস তো? একেবারে ডানাকাটা পরীরে। আকাশ থিকে উইড়ে আইছে।

হারু নেশার ঘোরে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে সান্যালের হাত জড়িয়ে ধরে পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে প্রণাম করতে থাকে—দিবি, বিউটিরে দিবি তুই?

দেবো।

: তোর কষ্ট হবিনে?

: নারে। আমার তো দূর সম্পর্কের শালী। আমার কষ্ট হবি ক্যা?

: মিছা কথা কৈস্ না দীপু। তুইও বিউটিরে ভালবাসিস।

: বাসলি কি হবি ভাই?

: ভালবাসলি—তারে ছাড়তি কষ্ট হয়।

: তুই শালা আমার বন্ধু। তোর জন্যি সেক্রিফাইস করতি পারবো না?

: আমি একলা মজা করবো?

: আমারে ভাগ দিতি চাইস তালি?

: চাই। খুব চাই।

বলে আবার প্রণাম করতে শুরু করে হারু মণ্ডল। তারপর নেশার ঘোরে দুই হাত দিয়ে দমাদম নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমি কি বেইমান? বিয়া করবো তো কি হইছে? দুই জনেই ভাগ কৈরে মজা করবো আমরা।

: আচ্ছা। আচ্ছা। তালি বিয়া শাদির ঝামিলা কৈরে লাভ নাই। মায়ের মন্দিরের সামনে 'মালা-চন্দন' কৈরে নে কাল।

: কাইল-ই?

: হুঁ। শুভস্য শীঘ্রম।

শুনে আনন্দে বিগলিত হারু মণ্ডল সান্যালের পায়ে ঢিপ ক'রে প্রণাম ঠুকে বলে—

: তুই ব্যবস্থা করেক দীপু।

তো ব্যবস্থা হয়ে গেলো। চারদিকে খবরটা ছড়িয়ে দিলো দীপক সান্যালই। বড় বউ-এর তো ছেলে পুলে হলো না। হবেও না। মণ্ডলের বংশটাই যে লোপ পেতে বসেছে। এ হলো মহাপাপ। বাড়িতে শ্যামা মায়ের বিগ্রহ। মা স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন—মণ্ডলকে বংশরক্ষার জন্যে বিয়ে করতে। শ্যামা মা নাকি কেঁদে কেঁদে বলেছে, ওরে ছেলে, তুই মরে গেলে কে আমার ওই বিগ্রহ রক্ষা করবে? সন্ধে বেলা কেউ বাতি দেওয়ারও থাকবে না।

হারু মণ্ডলের ভক্তরা সায় দেয়—খুব সঠিক কথা হে ইভা। মায়ের আদেশ অমাইন্য করা মহা—মহাপাপ।

বিউটিরানীর সঙ্গে মণ্ডলের 'মালা চন্দন' হয়ে গেলো।

সেও আজ তিন বছর।

বিউটির পায়ের মল ঝম্ ঝম্ ক'রে ঘুরে বেড়ায় মণ্ডলের সংসারময়। খিলি করা পান খেয়ে, আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে অজন্তা-ইলোরার চিত্র-কল্পের ভঙ্গিমায় সে হাঁটে। লোকে তাকিয়ে থাকে পলকহীন। আর রোগশয্যায় বড বউ চেঁচায় তার ঘরে শুয়ে শুযে—ওলো সোয়াগী, সোলোকগুলি রূপবতী মাগী, মরণ তোরে চোক্ষুতে দ্যাহে না? সারাদিন মল পায়ে ভাতার সোয়াগী আমার হাড্ডিসার বুকির উপুর দিয়া ঝম্‌ঝম্ কৈরে হাঁইটা যায়। আমার পোডা কপালের কষ্ট দেইখে খিল্‌খিলায়া হাসে। কলেরা-বসন্ত তোরে চোক্ষুতে দ্যাহে না ক্যা? হে মা শ্যামা, তুই দেখিস না ওই ডাকিনীরে...।

শুনে খিল্ খিল্ ক'রে হাসে বিউটিরানী। হাসতে হাসতে তার ঢলো ঢলো নিটোল বুকে ছন্দের দে দোল দোল। চোখে চোখে অহঙ্কারের কটাক্ষরা তুড়ি মেরে উড়িযে দেয় বড বউ-এর অভিশম্পাৎ। তার তো সম্রাজ্ঞীর আসন। কে টলায় সে আসন থেকে? দু'পায়ে দলে পিষে ফেলে মানুষের অপবাদ। ঈর্ষা। জ্বালা। সবকিছুকে।

তিমিরপুরের দুই কুবের তার পদযুগলে রোজ নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয়। একটুখানি ছোঁয়ার জন্যে, স্পর্শের জন্যে, তার চারু বুকের ভাঁজে ঠোঁট রাখার জন্যে কি ব্যাকুলতা। মনে মনে ভেবে ভেবে পুলকিত বিউটিরানী অহঙ্কারে ঝি-চাকরদের কুকুর মনে করে। নুন থেকে চুন খসলে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

: মর। মর। নরকের পোকা। মাথার উকুন।

জিকির জিকির জিকির জিকির....

মুদিত নয়নে শ্যামা মায়ের বিগ্রহের সামনে বসে বসে হারু মণ্ডল ভাবছিলো ...হারামীর বাচ্চা, বেজন্মা দীপক সান্যাল এই মহা সমারোহের ডামাডোলের মধ্যে তাকে ঋষি বানিয়ে—বিউটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুয়ে আছে তারই বিছানায়। ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা খুব দপ্‌দপ্‌ করে। একসময় তার খুব যৌন তৃষ্ণা পায়। কিন্তু উপায় নেই। তার আজ উপবাসব্রত। রাত বারোটা পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকতে হবে। শালা—শুয়ারকি বাচ্চা—সান্যাল দুপুরের ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে সবাইকে এইকথা জানিয়ে দিয়েছে।

এ হলো তাকে ফাঁদে আটকে রাখা। আর ওদিকে নিজে বিউটিকে নিয়ে মজা লুঠছে। তার একবার ইচ্ছে হলো উঠে চলে যায়। বেইমানটাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে বের ক'রে দেয় তার বাড়ি থেকে। কিন্তু হায়, সে উপায় তার নেই। বুকটা মুচড়ে পাক খেয়ে ওঠে। শালী কুত্তিটাকেই খুন ক'রে ফেলবে একদিন।

কিন্তু ভাবাটাই সার। নিরুপায়। অসহায় সে এক্ষেত্রে। সান্যাল ক্ষেপে যাবে। রুষ্ট হবে। প্রতিশোধ নেবে। তার হাতে পায়ে শেকল। একটুও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। আজ সকালেই সে ভেবে রেখেছিলো, তাকে যখন অফিসিয়ালী নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে, তখন তো সে রাজা। তিমিরপুরের রাজা-মহারাজাধিরাজ। সেই আনন্দে বিউটি তার গলায় বিজয়-মাল্য পরিয়ে খুব আদর করবে। কিন্তু আদর তো দূরের কথা, দেখাও করলো না বিউটি। বলে দিলো তার শরীর খারাপ। কিন্তু এখন শরীর খারাপ হয় না শালী কুত্তির ?

দুঃখে, অপমানে সে কাঁদতে লাগলো।

জিকির জিকির জিকির জিকির।

কান্‌তিছে। আমাগরে পরমহংস কান্‌তিছে।

উলুজোকার ছ্যাও কিভা কনে আছো।

ভাব আইছে। ভাব আইছে মণ্ডল মহারাজের। না হলি কিভা ধ্যানে বৈসে অমন কৈরে অঝোরে কান্‌তি পারে ?

আহারে...শ্যামা মা তোর লীলে বুঝা দায়।

মণ্ডলের তখন চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো। সবকিছু ভেঙে চুরে চুরমার ক'রে ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো বিউটির কাছে। ওরে শালা গাণ্ডু ভক্ত ভণ্ডের

দল, তুরা ভাবিস মণ্ডল মায়ের ভাবে কাঁদে? আমি কাঁদি আমার ভাবের জ্বালায়। তুরা দেখতি পাইস না রে শালারা, আমার কচি বউডারে স্যাংটো কৈরে দীপক সান্যাল কেষ্টলীলে করতিছে? যা না দল বাইধে শালা খোচরডারে গিয়্যা মাইরে ফ্যালা। আমি তালি পরম নিশ্চিন্তি হই। সে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে মনে মনে বলে, কি হবি আমার এই স্রিছে রাজ্যপ'টে? বিউটিরে যদি আমার একলার কৈরে না পাই তো এই সবের কি মূইল্য আমার? সঙ্গে সঙ্গে সে আপন মনে মাথা নাড়ে।

না না। এসব কি আবোল-তাবোল ভাবতিছি। কি অস্তি ভাবতিছি এসব? ধন-সম্পদ না থাকলি কুকুরও পিচ্ছাপ্‌ করতি আসপিনে। ধন আছে তো আমার সব আছে। হাজার বিউটি আমার পায়ের নিচি মাথা ঠুকপি। অনাদির বউডাতো খারাপ না। বিউটির রূপের টান বেশি। অনাদির বউ সাবিত্রীর যৈবনের মাতাল হাতছানিডা আরো মারাত্মক।

সাবিত্রী তারাহার চাইছে। দেবো। তারাহার তুমারে দেবো। খালি তারাহার ক্যা। কানপাশা দেবো। নাকের নথ দেবো। হাতের বালা দেবো। পায়ের মল দেবো। বুকে দেবো নিজির হাতে কাঁচুলি পরায়ে। আহারে। রি রি করে মণ্ডলের দাঁত। তারপর একদিন সুযোগমত দীপক সান্যাল....তোরে...।

চমকে যায় মণ্ডল। সান্যালের নামটা কি সে জোরে ক'রে বলে ফেলেছে! যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে? নিজেকে আরো বেশি ক'রে সাবধান করে সে। সান্যালটা তো মানুষ না। ও হলো বুদ্ধির দেবতা। কে পারে ওর সাথে বুদ্ধির খেলায়? ষড়যন্ত্রের খেলায়?

সেই সেদিনের ভয়ানক দৃশ্যপট।

টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি।

অন্ধকার রাত্রি। আমবাগানের শিউরে ওঠা মুহূর্তটা। ভাবতে গেলে এখনো আঁতকে ওঠে সে। সান্যালের কাছে ওটা যে তার আজীবন দাসত্ববরণের দিন, এখন অনায়াসে সে বুঝতে পারছে। এই উপলব্ধিটা যদি ঘটনা ঘটাবার আগে তার মাথায় আসতো....তাহলে ভৈরব মণ্ডলের ছেলে হারু মণ্ডলের বউকে নিয়ে তারই ঘরে ফুর্তি করার কি সাহস পেতো দীপক সান্যাল? সমিরুদ্দিকে দিয়ে ওকে সাত টুকরো ক'রে কেটে ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দিতো। কি হতো? থানায় ভেট পাঠিয়ে দিলে

কাক পক্ষীও টের পেতো না। বরং সে নিজেই আগ্ বাড়িয়ে লালঝাণ্ডা-অলাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে পারতো।

এখনও কি ইচ্ছে করলে পারা যায় না?

না। বিপদ হবে তারই। সান্যালের আয়রন সেফে সযত্নে সেই ছবিটা এখনো রয়ে গেছে। খুন হলেই এটা-ওটা নাড়াচাড়ার সময় ছবিটা বেরিয়ে আসবেই।

সেদিন সান্যালের একটা কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলো হারু মণ্ডল। যদিও সে বলেছিলো কাজটা সে করতে মোটেও ভয় পায় না! তবু লোক দিয়ে করালে ক্ষতি কি। সান্যাল সে কথা শোনেনি। বুঝিয়েছিলো, এসব কাজ লোক দিয়্যা করালি হিতে বিপরীত হয়। নিজিরা করাই নিরাপদ। তাছাড়া আমি তো থাকপোই। এমন সুযোগ জেবনে পবিনে হারু। টিয়ার সম্পত্তি, তার চেয়াও লোভনীয় উয়ার ঢেউ ছড়াইনা শরীল। কি শরীল। কি বুক। কি মুখখানা রে।

হারু উত্তেজিত হয়ে দীপকের হাত ধরেছিলো—আইজই হয়া যাবে। সৈন্ধের পর রোজ বাজার কৈরে ফেরে সাইকেলে। আমবাগানের ধার ঘেঁইষে।

সব ঠিক ঠাক।

সারাদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। হাওয়ায় শীত।

ঝিল্লিমুখর প্রকৃতির নৈঃশব্দ্যে গা ছম্‌ছম্ আঁধার তখন কেবলই নেমে এসেছে।

ছিট্‌কে একদলা কাদামাটি লেগে গেলো পার্বতী ডাক্তারের চোখে মুখে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ঘুরে গেলো একটা মোচড় খেয়ে। আর তার ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন পার্বতী ডাক্তার। প্রথমটায় তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু যখন বুঝতে পেরে অন্ধকার চোখে দু'হাত চেপে চিৎকার ক'রে ছুটতে শুরু করেছিলেন, সেই সময় হারু মণ্ডল লাফিয়ে পড়েছিলো। এলোপাথারি জাপট্টা জাপটি দু'জনের।

সান্যাল একটা রেশমের রুমাল ছুঁড়ে দিয়েছিলো আর চাপা স্বরে বলেছিলো—গলায় জড়ায়ে প্যাঁচ দে। প্যাঁচ দে।

প্যাঁচ দিয়েছিলো প্রায় অন্ধ পার্বতী ডাক্তারের গলায় রেশমের রুমাল দিয়ে হারু মণ্ডল। তারপর শ্বাসরোধ ক'রে মেরে তার দেহটা টানতে টানতে

নিয়ে গিয়েছিলো আমবাগানের গভীরে। মণ্ডল তখন শক্তিহীন, ধুকছিলো। সান্যালের সেই বুদ্ধির খেলাটার শেষ অধ্যায় তখনই সংঘটিত হলো। বলে উঠলো—হারু, শালার বুকির উপুর কান পাইতা ছাখ। মৈরছে নাকি। না 'মরলি পরে কিন্তুক বিপদ হবি। ছাখ্ তাড়াতাড়ি....

হারু ডাক্তারের বুকে কান ছোঁয়ালো।

চোখের পলক। চারব্যাটারীর টর্চটা ধা ক'রে জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার ক্লিক। খরখর একটা শব্দ। ক্যামেরাটা ঢুকে গেল সান্যালের কাঁধের ঝোলায়।

আর প্রাণের ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো হারু মণ্ডল—দীপু, তুই ছবি উঠালি ?

: হ।

: ক্যান, ছবি উঠালি ক্যান ?

সান্যালের চোখে মুখে জয়ের আনন্দ তখন হিংস্র হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে সে ফিস্ ফিস্ ক'রে উঠলো—রাবণের মৃত্যুবাণ।

: তার মানে ?

: তুই আমার চিরদিনের সেবক হয়া থাকপি।

: না। চিৎকার ক'রে উঠলো দিশেহারা হারু মণ্ডল—তুই শয়তান। তোরে আমি....বোধহয় পরিস্থিতিটা আগে থেকেই অনুমান ক'রে নিয়েছিলো দীপক সান্যাল। না হলে অন্ধকারে সে তার ওপ:র ঝাঁপিয়ে পডতে পড়তেই ওরকম গদাম ক'রে একটা কিক্ করতে পারতো না সান্যাল। প্রচণ্ড শক্তি হারামজাদাটার। ছিটকে পড়ে গিয়েছিলো সে। অনেকদিন প্রস্রাব করতে তার কষ্ট হযেছে। জ্বালা করেছে। বসে বসে একদম প্রস্রাব করতে পারতো না বছর তিনেক। মনে হতো—তলপেটটা ভেতর থেকে কে যেন খাম্চে ধরে।

সান্যাল চলে যাবার সময় শান্তভাবে বলে গিয়েছিলো, ডাক্তারের গলা থিকে রুমালডা নিয়্যা যাইস হারু। পোড়ায়া দিস। না হলি মরবি।

সেই থেকে, সেই ভয়ানক সন্ধের পর থেকে শালা সান্যাল হারামির বাচ্চার গোলাম হয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। কোনো উপায় নেই। আমৃত্যু গোলামী ক'রে যেতে হবে। ওই একটা ছবি। একটা ক্লিক্ শব্দ, কে জানে অন্ধকারে টর্চের আলোয় ছবি-টবি কি উঠেছিলো। কিন্তু আর কোনো

দিন সান্যালকে এ কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেনি। সাহস হয়নি। জিভে এলেও ঠোঁটে আসেনি। একটা ভয়তাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অথচ খুন তো অনেক করিয়েছে জীবনে। সমিরুদ্দি-নবীন-ভোমারা ধান ক্ষেতে, বিলের কিনারায়, নদীর খাঁদে বহুজনের কলজে ছিঁড়ে লাশ গুম ক'রে দিয়েছে।

দু'একবার হাওয়াটা গরম হওয়ার মুখেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তবু একদিন দামী মদের খুশমেজাজ আর দেহাতি মেয়েমানুষের বুনো গন্ধে মাতাল—সান্যালকে টুক ক'রে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলো—অতো আঁধারে ছবি ওঠে ?

অত বছর পরে সামান্য একটা আধখানা কথায়—কোথায় গেলো দেহাতি মেয়েমানুষের বুনো গন্ধের মাতলামো, কোথায় গেলো শালপাতার লেবু-পেঁয়াজ-লঙ্কায় মাখা মুরগির ঝোলের ধোঁয়া ওঠা মেজাজ। মুহূর্তে ও শালা গম্ভীর। চোখের চাহনিতে বর্শা নিক্ষেপের তীক্ষ্নতা। একেবারে পালটে গেলো।

দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো এখান থেকে সোজা বেরিয়ে সান্যাল হয়তো টিয়ার কাছে গিয়ে হাজির হবে। বলবে—এই যে এই হারু মণ্ডল, শালা শ্যামা মার নকল ভক্ত, চায়া ছাখো—ডাক্তার কাকারে কিরকম পিচাশের মতো খুন করতিছে...। চলো, কৈলকাতায় চলো। খবর কাগজের অফিসে এই ছবি দিয়্যা কিচ্ছাডা বাইর কৈরে দেইগে...।

যদি এরকম হয় ? সান্যাল সোজাপথের মানুষ না। যদিও সে নিশ্চিন্ত, টিয়া এখন আধপাগলী। যোগিনী। মাথায় জট। সারাদিন বাড়ির চৌহদ্দিতেই থাকে। কোনো-জন-মনিষ্যির সাথে তার সম্পর্ক নেই। হয়তো কথাও বলতে ভুলে গেছে সে।

সান্যাল চোখ পাকিয়ে ডান ভুরুটা কপালে তুলে এনে বললো—কায়দা করতি চাইস ?

সে তখন থতমত খাওয়া ধরাপড়া চোর—না। না। এ অন্য ছবির কথা।

: হারু মণ্ডল !

উঃ। কি ভয়ানক। সান্যালের দাঁতে কড়মড় শব্দ....যেন তার অস্থি-মজ্জা চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে। সে মাথা নেড়েছিলো। মুখে হাসি ফুটিয়েছিলো—রাগ করিসনে। মাল খা।

: ভ্যাট্, শালা মালের গুষ্টি কিলাই।

গেলাস, বোতল, শালপাতার মাংস....স্যুট্ স্যুট্ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো হারামজাদাটা। যেন রাজা-মহারাজাধিরাজ।—তোর কৈলজেডা আমি

পরীক্ষে ফৈরে দেখুম হারু। চৈল্‌লেম…। সে অসহায়ভাবে হুমড়ি খেয়ে সান্যালের পা জড়িয়ে ধরেছিলো—তুই আমারে ভুল বুঝিসনে দীপু। আমরা একাত্মা—একপিরাণরে। আমারে ভয় দেখায়া কি লাভ হবি তোর ?

হায়েনার হাসিতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে তার চুলের মুঠি ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে ঠাস্‌ ক'রে একটা চড় মেরে দিয়েছিলো বাঁ গালটায় দীপক—ছবিডা পষ্ট উঠেছিলো। আমার জেবন গেলিউ ছবিডা নষ্ট হবিনে—। তোরে আমি কুত্তা দিয়্যা খাওয়াতি পারি জানিস ?

মার খেয়ে মার হজম করেছিলো রিরংসায় মত্ত বন্ধুর কাছে। ঘাড় নেড়ে স্বীকারও করেছিলো—তুই আই-এ পাস। আমি মুখ্যু। তুই যা খুশি করতি পারিস জানি।

হেসেছিলো ক্রুদ্ধ সান্যাল। হেঁচ্‌কি তুলেছিলো বাঁ হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে—সেই জন্যি তোরে চড় মারছি।

সে বলেছিলো—দরকার হলি আরো মারিস।

বলে অসহায় ক্রোধে হাউমাউ ক'রে খুব কেঁদেছিলো সে।

এরপর সান্যালের স্বেচ্ছাচারিতা চরমে উঠে গেলো। যখন তখন তার শোবার ঘরে ঢুকে পড়তো। তার জন্যে আলমারিতে দামী মদ রাখতে হয়। পেছনের বাগানে অ্যাসবেস্টের ঘরে আমদানী করতে হয় বুনো মেয়েমানুষ।

তার হুকুম। তার অঙ্গুলি নির্দেশে তাকে কাজ করতে হয়। মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু তা প্রকাশ্যে না। নিজের মনের ভেতর গুমরে গুমরে বিদ্রোহের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরা ছাড়া তার আর কিছু করার ছিলো না। শুধু ভাবতো, যদি একদিন সুযোগ আসে, তাহলে এর প্রতিশোধ নেবে মনের সাধ মিটিয়ে…।

প্রথম যেদিন সে দেখলো বিউটিকে জড়িয়ে ধরে সান্যাল অঘোরে ঘুমিয়ে আছে—সেই সময় তার হুম্‌ ক'রে মাথায় রক্ত চড়ে গেলো।

তারই ঘর। তারই বউ। তারই বিছানা। তার কেনা পয়সায় বিলিতি মদ…। ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে ওরা। দুটোই যে উদ্দাম মাতাল….বোঝা যায়। সে হাত বাড়িয়ে রাম দাটা টেনে নিয়েছিলো।

শ্যামা মাকি আমার কালোরে…।

এগিয়ে গিয়েছিলো বিছানার কাছে। দু'হাতে বিশাল রামদাটা উচু ক'রে ধাই ক'রে কোপ দেবার সময় তার মনে হয়েছিলো…

না সে ভৈরব মণ্ডলের ছেলে। তিমিরপুরের ভাগ্যবিধাতা। নিজের হাতে খুন ক'রে সে এই বিশাল সাম্রাজ্য হারিয়ে জেলখানার নরকে পচে মরতে যাবে কেন? সেই ছবিটা...সাক্ষী হিসাবে বেরিয়ে আসবে সান্যালের আয়রন সেফ থেকে...।

রামদাটা যথাস্থানে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে। তিমিরপুর তখন নিস্তব্ধ। রাতের পাখিরা জাগরিত শিকারের অনুসন্ধানে।

তার তখন মেয়েমানুষের আকাঙ্ক্ষা। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় দপ্ দপ্ রক্ত মাথায় সে ছুটে গেলো পার্বতী ডাক্তারের বাড়িতে।

তখনো টিয়ার বুকে সুধার ভাণ্ড। তেজদীপ্ত শরীর।

দরোজায় টোকা দেয় সে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

টিয়া দরোজা খোলে না! সাড়া দেয় না।

তার মাথায় আগুনের ঝড়। সে দরোজায় ধাকা দিতে থাকে। গর্জাতে থাকে চাপা স্বরে—দরোজা খোলো। না খুললি ভাইঙে ফ্যালাবো। খোলো...

থরথর ক'রে কাঁপছে দরোজা। সেই সময় বাইরের উঠোনে লাল রঙের একটা কুকুর প্রচণ্ড শব্দে ডাকতে থাকে। ডাকতে ডাকতে উঠে আসতে চাইছে বারান্দায়।

ঘর থেকে টিয়ার কণ্ঠ শোনা যায়—তোর বাপ মুখে রক্ত উঠে মরিছে। তুইও তাই মরবি হারু মণ্ডল। ভালো চালি চৈলে যা ....। না হলি টাঙ্গির কোপে মাথাডা ধর থিকে খসায়া দেবো। যা....। শেয়াল-শকুনির ছাঁ-ঘরে তো বউ আছে...।

: দরোজা খোলো। তুমার পায় ধরি টিয়া। আমার ঘরে জ্বালা, বুকের ভিতরে জ্বালা...আমারে বাঁচাও টিয়ারানী। ভিক্ষে চাই তুমার কাছে।

কুকুরটা তখন ক্ষেপে উঠেছে ...। টিয়াও হাঁক দেয়, লালু, লালু, ধর, হারামজাদাডারে ধর।

: জাফর নেড়ে তোর লাং হয়রে মাগী? মোসলমানের ছোঁয়াডা আরামের?

: লালু। লালু, ধর....। ছিঁড়া ফ্যালা ধৈরে....ছিঁড়া ফ্যালা...।

লালু সেই সময় বিকট চিৎকার ক'রে লাফিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ে। আর সে ভয়ে অনুনয় করে টিয়াকে...লালুরে ঠ্যাকাও, লালুরে ঠ্যাকাও....

: কও, আর কুনোদিন আসপে না?

: শ্যামা মায়ের কিড়ে, আসপো না...

: লালু, চুপ কর, চুপ কর লালু।

লালু একবার হালুম শব্দ ক'রে চুপ ক'রে যায়। কিন্তু তার জামা ধরে টানতে থাকে। ভয়ে আতঙ্কে সে ছুটে পালায়। উর্ধ্বশ্বাসে....ছুটতে থাকে। লালুও ঘেউ ঘেউ ক'রে তাকে তাড়া করে।

ছুটতে ছুটতে খিড়কি দিয়ে ঢুকে নিজের শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। জানালার পর্দা তুলে দেখে, বিছানায় দীপক নেই। হারামজাদী কুত্তিটা ন্যাংটো হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ লালুর হালুম শব্দে সে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে—সাক্ষাৎ যমের মতো লালুর চোখ দু'টি অন্ধকারে ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে।

হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দেয় সে...

জিকির জিকির জিকির জিকির...

ধুন্ধুমারটা এখন ক্লান্ত। ঝিমিয়ে এসেছে নির্বাচনী বিজয়োল্লাস। মন্দিরের বারান্দায় ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে থাকতে প্রস্রাবের বেগ আসে তার। এই সময় সমিরুদ্দিকে অর্ধনিমিলিত চোখে সে দেখতে পেলো মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে ভেতরের দিক থেকে কাছারি বাড়ির দিকে চলে গেলো। ছাত্র নেতা ভোমা মুখুজ্যে....উঠোনে দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় মাংস খাচ্ছে। টল্‌ছে একটু একটু।

মণ্ডল মনে মনে বললো—বামুনরা শালা কুত্তার জন্মা। পরের জিনিস খাত্তি শালাগোরে জিভে পায়খানা ঝৈরে পড়ে। কলেরায় মর শালা বাইন-চোৎরা। মর।

মন্দির থেকে পুরোহিত এসে নতজানু হয়ে বলে: ঠাকুরকত্তা, ইবার ধ্যান সমাপ্ত হৈক। মায়ের শয়ম হৈছে। ভক্তবিন্দেরা খায়ে-দায়ে ফিরি গিছে।

মণ্ডল উঁচুগ্রামে কণ্ঠ তুলে ধ্বনি দিয়ে উঠলো—জয়—কালী করালিনী, অসুর বিনাশিনী, নৃমুণ্ড মালিনী মা-শ্যামা—মাইকি জয়।

জয়। জয় মা-তারা।

ভোমার মাংসভরা মুখের ধ্বনি বিটকেল শোনায়—জয় ঠাকুর হারুমণ্ডলকি জয়। হারুমণ্ডল যুযুগ জিও।

হারু মণ্ডল পূর্ণ চোখে তাকালো ভোমার দিকে। ভোমা হেসে চোখ

ক্রোধ—১০

মারলো। দেখে একটু ভড়্কে গেল মণ্ডল। ভোমা আবারও চোখ মারলো।

: কি? জিজ্ঞেস করলো মণ্ডল।

ভোমা হেসে আবারও শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে, মাংসের হাঁড় চিবোতে চিবোতে চোখ মারলো। তারপর বললো—শ পাঁচেক টাকা ছাড়ুন।

: টাকা?

ঃ সেকি মোশায়, টাকার নাম শোনেননি? বসিরহাট থেকে হায়ারে এসেছি। শূন্যহাতে ফিরে যাবো? মাল খেলুম, মাংস খেলুম, এবার মাগীর খচ্চাটা ছাড়ুন।

খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলো মণ্ডল—মা শ্যামা...।

ভোমা হাঁড়ের ছিব্ড়ে থু থু ক'রে ছিটিয়ে ফেললো উঠোনে। তারপর বিদ্ঘুটেভাবে কোমর দুলিয়ে বললো—ও সব দু'নাম্বারি ছাড়ুন মোশায়। মাল ছাড়ুন। বলে বেশ বড়ধরনের একটা মাংসের টুকরো মুখে পুড়ে দিয়ে বললো—ভোমা মুকুজ্যে চব্বিশ পরগণার ইস্টুডেন্ সিক্রেটারি। বেশি কথার দরকার নেই মোশায়। অন্য জায়গায় হায়ারে গেলে মোশ:য় তিনরঙের কাগজ দিয়ে গেট সাজায়। সম্বোধনা দেয়। এ শালা এখানে ফেকলু পার্টি সেজে গেলুম। মোশায় আপনি শালা হারামীর হাতবাক্সো একখানা। অ্যাক্টো মেরে যাচ্ছেন মন্তিং থেকে—। শ্যামা মায়ের পুর্কি মেরে যাচ্ছেন পাবলিককে।

ঘড়ি দেখলো ভোমা।

মণ্ডল প্রায় হতবাক। সে তখন অন্দর মহলে যেতে পারলে বাঁচে। প্রস্রাবের বেগে কাপড় নষ্টের অবস্থা। কিন্তু সামনে জলজ্যান্ত ভোমা নামের ভীমসেন। মনে মনে সে খুব খিস্তি দিলো-শালা বেজন্মা। জন্মের মতো টেঁসে দিমু তরে। শালা, আজাইরে গেলোস আর গজাইড়া ত্যাল খাটাস যেখেনে-সেখেনে!

প্রকাশ্যে বললো—আমি এখন টায়ার...।

ভোমা হো হো ক'রে হেসে বললো—টায়ার কিরে? ওতো শালা লরির পোঁদে ঘোরে!

: ছিঃ ছিঃ। আমি তুমাগরে লিডার।

: ফুৎ ফুৎ। শালা লিডার। আরে বান্চোৎ, মাহুদা, সকল কথার সার কথা। মাহুদা না থাকলে শালা লালঝাণ্ডার গ্যাটিসে পোঁদখানা সিল মেরে যেতো...।

: আমি পেচ্ছাপ কৈরে আসি।

: কেটে পোচ্ছো? মাগীর মাল ছাড়ো....বলে থু থু ক'রে ছিবড়ে ফেললো ভোমা। তার সবটা এসে ছড়িয়ে পড়লো মণ্ডলের গায়ে-মুখে....।

: ছিঃ ছিঃ। রাম রাম। অ্যাঃ। থুঃ। মণ্ডল ছিবড়ে ঝাড়তে লাগলো। তাই দেখে হাহা ক'রে কোমর দুলিয়ে হাসতে লাগলো ভোমা। সেই সময় কাছারি বাড়ির দিক থেকে—রাধে লো তোর প্রেমের মড়া লেগেছে ঘাটের পাড়ে···গাইতে গাইতে ভোমার সাঁকরেদরা আবির্ভূত হলো এসে।

আর তখুনি বেদম প্রস্রাবের বেগে হারু মণ্ডল দ্রুত বেগে ছুটতে আরম্ভ করলো অন্দরের দিকে।

পেছনে ভোমার চিৎকার—আবে শ্যামা মা, দেখিস্ বে, কাপড়ে হিসি করিসনে।

সাঁকরেদরা হাসির তুফান ছুটিয়ে দিলো।

সকাল থেকে বৃষ্টি। কখনো অঝোরে। কখনো কিছুক্ষণের বিরতি। কিসের একটা আওয়াজ হচ্ছিলো। আওয়াজটা প্রথমে মনেহয়েছিলো গোঙানির। কেউ অসুস্থ। কাছেই কোথাও আওয়াজটা হচ্ছে। এত রাত্রিতে কোত্থেকে আওয়াজ আসছে বুঝতে পারছিলেন না নসিরণ। আজকাল তার ঘুম বড় একটা গাঢ় হয় না। সবসময় আতঙ্ক। হারু মণ্ডলের একতরফা জয়ের সপ্তাহ দুয়েক পরে মদনকে ওরা ধরেছিলো হাসনাবাদের ফেরী ঘাটে। রাত্রিতে লুকিয়ে নদী পার হতে গিয়ে ওদের চোখে পড়ে গিয়েছিলো ও। ভোমার দলের একজন চায়ের দোকান থেকে ছুটে এসে জাপ্‌টে ধরেছিলো মদনকে। ফেরী নৌকায় দু'জনে জড়াজাপটি করতে করতে ভোমার দলের একজন মদনের পিঠে ছুরি মেরেছিলো। ছুরি খেয়ে মদন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নদীর জলে...।

খবরটা হাওয়ায় হেঁটে পরের দিন সকালেই পৌঁছে গেলো তিমিরপুরে। মদনকে মেরে ফেলেছে ভোমারা। মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। লাশের কোনো হদিস নেই। হয়তো ডুবে গেছে অতল গভীরে।

নসিরণ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন ঘরের মধ্যে।

ভেঙে পড়েছিলো কাজীপাড়ার মানুষ। নসিরণকে ঘিরে তাদের কান্নার কোরাশ হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলো অন্তহীন ক্রোধের আগুন।

কাঁদতে কাঁদতে তিনি বিলাপ করেছিলেন—দ্যাশে মানুষ নাই। আইন নাই। বিচার নাই। রাজনীতি করা যদি অপরাধ হয়, তালি ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতি করে ক্যা? তার অপরাধ হয় না ক্যা? তার দলের জানোয়াররা যে মার বুক খালি করতিছে জল্লাদের মত্তোন, তাগরে বিচার করবি কেডা?

কাজী সেইযে বলে গেলেন, মদনের মা, শক্ত হও। মনের জ্বালাডারে জিয়ায়া রাখো, আমি মদনের লাশের খোঁজে যাতিছি। শ্যাষ পর্যন্ত খোঁজ করবো, যদি পাই....

চিৎকার ক'রে কাজীর পা জড়িয়ে ধরে নসিরণ কেঁদেছিলেন—কি কওগো তুমি পাষাণের মতো, আমি কি প্যাট থিকে লাশের জম্মো দিছিলাম? আমার সোনার টুকরো মানিক, আমার বুকের একটাই ধন, সেতো জ্যান্ত ছেলো। হাইসতো, হই চই কৈরতো, গরিবির জন্যি সর্বেস্ব ত্যাগ কৈরে দিন-রাইত ছুটাছুটি কৈরতো....সেই তাজা ছেলে চাই আমার। আমি লাশ নেবো ক্যা? আমারে তুমি লাশ দিতি চাও ক্যা?

কাজীপাড়ার হাজার মানুষ হতবাক হয়ে দেখেছে কাজীকে। হিমালয়ের চূড়ার মতো দৃঢ়, অবিচল। ছায়াহীন মুখ। তিনি নসিরণকে ধরতে বলেছিলেন কলিমুল্লাহর স্ত্রী খোদেজা বিবিকে।—চাচি, মদনের মারে সামলাও। আমি নদীর ভাঁটিতে যায়া দেখি...।

নসিরণ আছাড়ি বিছাড়ি করছিলেন। উগ্র, রুদ্র মূর্তি তার—যদি জেবন্ত আমার ছেলেরে ফিরায়ে দিতি পারো দিও, না হলি লাশ য্যানি আমার উঠানে না আসে। তুমরা-কাপুরুষের মতো লাশের খোঁজে যাতিছো। লজ্জা নাই তুমাগরে। সরম নাই তুমাগরে। যারা আমার মদনরে লাশ বানাইছে—তাগরে খোঁজে যাতি পারো না? কাজীপাড়ায়, দাসেগরে পাড়ায় মদনের তো বন্ধুর অভাব নাই। কারো কি মনে পড়ে না তার কথা? রক্তের ভিতরে কি কারো ছট-ফটানি নাই! দোহাই তুমাগরে, তুমরা লাশের খোঁজে যায়ো না। তুমরা খুনীগরে তালাশে যাও। যিখানেই তারা লুকায়া থাকুক, হাজার হাজার মানুষ যদি একসাথে গিয়্যা ধরো তো কি করতি পারে খুনী জানোয়ারের দল।

সেই সময় উত্তেজনায় শিস্ বাজিয়ে সন্ন্যাসিনী-বেশী টিয়া ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে নসিরণের সামনে। তার সাদা থান। মাথায় জটা। চোখে আগুনের ছোঁয়া।

কাজীর বুকের ভেতরে সেই সময় আলোড়ন, ভাঙচুর শুরু হয়ে তাকে বিহ্বল ক'রে দেয়। তিনি যেন শুনতে পান—ভালবাসা তোর জনতা দিলেম নাম / তুই ভালবাসা কৃষ্ণচূড়ার মুখ/মিছিলে মিছিলে আমি হই উদ্দাম/ভালবাসা তোর বুলেটের মুখে সুখ।

দু'চোখ ভিজে ওঠে। কেন, ভেজে কেন ?

তিনি আর একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারেন না। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসেন বাইরে। পেছনে পেছনে বেরিয়ে আসে এক মিছিল মানুষ। তারাও যাবে।

কোথায় যাবে তারা ?

লাশের সন্ধানে, নাকি খুনীদের সন্ধানে।

তারা চলে যায়। চলে যায় মাঝিদের জাল নিয়ে। ইছামতীর কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে।

নদীতে জালের ঝপাঝপ্ শব্দ।

মাছ ওঠে সে জালে। ছোট ছোট রুপোলী মাছের থল্‌বল্ নাচন।

দূরে, যতদূর চোখ যায় দেখে...। খা-খা রোদ্দুর।

একটা লাশ চায় সবাই।

ডোমাদের ছেলেরা প্রকাশ্যেই দাঁত বের ক'রে হাসে। ঠাট্টা করে। এই ভাবে সাতদিন, আটদিন দশদিন পার হয়ে যায়।

আসে টিয়া। রোজ। সকাল-সন্ধে।

নসিরণকে বোঝায়। নানা প্রসঙ্গ তুলে পুত্রশোকাতুরা মাকে শান্ত করতে চায়।

কিন্তু মদনের কোনো সন্ধান গত দুইমাসে পাওয়া যায়নি।

আজও কাজী ঘুরে এসেছেন। দূরের কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেছেন। কোন দূর গ্রামে পরিচয়হীন ভাসমান লাশের কথা শুনে সেখানেই ছুটে গেছেন। কিন্তু গিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফিরে আসা।

শেষ পর্যন্ত লাশের জন্যেই উন্মুখ হয়েছিলেন নসিরণ। এ জীবনে শেষবারের

মতো যদি মৃত ছেলের মুখটাও দেখতে পেতেন। ছেলে তো শুধু ছেলে নয়। একটা গোটা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ভালবাসায় গড়া-রক্তের কারুকাজ। ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম শিল্প।

ঘুম ভাঙতেই এখন প্রথমেই মনে পড়ে গেলো মদনের কথা। অসীম বেদনার হাহাকারে তিনি পাশ ফিরে দেখলেন দু'মাস পরে মদনের বাবা আজ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার গভীর ঘুমে নিঃশ্বাসের শব্দ....। তারপরই মনে হলো কে যেন বাইরের ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি বা-াস ছাপিয়ে গোঙাচ্ছে।

কে গোঙায়? কে? কি রকম একটা অশরীরি ভার অনুভব করলেন তিনি নিজের শরীরে। গা-ছম্‌ছম্ ক'রে উঠলো। টিনের চালে জামগাছের একটা ডাল জোর হাওয়া উঠলেই ঝাপটা খায়। তাতে নানারকম শব্দ বাজে। কখনো মনে হয়—দূরে বোধহয় চৈত্রের গাজনে ঢাকে কাঠি পড়ছে অনবরত। ঢ্যাডাং-ঢ্যাডাং-নাক চ্যাণ্ডা ঢ্যাঙ-ঢ্যাডাং-ঢ্যাঙ। আর ঢাকের বাজনার তালে -ালে যেন অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরা নাচ্‌ছে।

আবার মনে হয় বটি দায়ে কেউ সজনে ডাঁটার গা চাঁছছে একটানা। চেঁছেই চলেছে। তার কোনো বিরাম-বিশ্রাম নেই।

এখন অনেক রকম শব্দ হতে লাগলো। কিন্তু সেই শব্দ ছাপিয়ে গোঙানির একটানা আওয়াজে অন্তরাত্মা আতঙ্কে শিউরে উঠলো। কাজীপাড়ায় ভোমা বা সমিরুদ্দিরা ঢুকে কোনো জোয়ান ছেলেকে তো কুপিয়ে রেখে যায়নি?

আওয়াজটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগলো। এতক্ষণ যেটা গোঙানির শব্দ বলে মনে হয়েছিলো—তা আসলে অনেক মানুষের কোরাশ। নসিরণ খুব ভয় পেয়ে গেলেন। এ হয়তো হারু মণ্ডলের দলবল। না জানি কি ভয়ানক মতলব নিয়ে ঢুকেছে। কাজীর মুখেই তিনি শুনেছেন অনেক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। শুনলে যে কোনো সুস্থ মানুষ আঁৎকে উঠবে। রাতে ঘুম হবে না। অন্তত নিজের বেলায় তাই হয়েছিলো তার। শুধু অনিদ্রা না, ভাতও খেতে পারেননি কয়েকদিন। চোখ বুজলেই চারদিক থেকে কালো মুখোশধারী দস্যুরা বোমা-ছুরি-পিস্তল আর পাইপগান নিয়ে ছেঁকে ধরতো তাকে। অনেক শহরে নাকি এক-একটা এলাকা প্রথমে পুলিস দিয়ে ঘিরে ফেলে তারপর প্রতিটি লম্বাগলির এমাথা ওমাথা ইন্দিরা গান্ধীর 'গরিবী হঠাও' বাহিনীর ছেলেরা সিল ক'রে দিয়েছিলো। সশস্ত্র ছিলো তারা। এরপর

প্রতিটি ঘরে ঘরে—যেসব বাড়িতে খড়িমাটি দিয়ে চিহ্ন আঁকা ছিলো আগে থেকেই, সেইসব বাড়ির দরোজার কড়া বেজে উঠেছে আচমকা।

দরোজা খুলে দিলে-ওরা ঝড়ের মতো ঢুকে পড়েছে। না খুললে দরোজা ভেঙে ঢুকেছে ভেতরে। তারপর একধার থেকে হত্যালীলা। কি সব সোনার টুকরো ছেলে। কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে। মরেছে, কি মরেনি, ইন্দিরা মাতার সন্তান আর মামুদাদার চেলারা তাতে দৃকপাত করেনি। হত্যালীলা চালিয়ে লাশের স্তূপ জমিয়ে তুলেছে। চারদিকে অন্তিম ভয়ার্ত আর্তনাদ। সেদিকে কে নজর দেবে। আনো ঠেলা। ওঠাও। ঠেলার ভেতরেও অর্ধমৃতদের গোঙানি…।

ত্রিপল ঢাকা দাও। পাবলিক দেখবে। দেখলে ভয় পাবে। ইমেজ নষ্ট হবে মামুদাদার।

ভোরের আলোতেও শহরের মানুষ দেখেছে মানুষের লাশ বোঝাই ঠেলা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। যে-ভাবে-গরু-মোষ জবাই ক'রে নিয়ে যায় কসাইরা, ঠিক সেইভাবে 'অহিংসবাদের' কসাইরা লাশ বোঝাই ঠেলা গাড়ি বয়ে নিয়ে গেছে খরস্রোতা গঙ্গার বুকে। সেসময়ও দু একজন জীবিত ছিলো লাশের স্তূপে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েও মৃতের অভিনয় ক'রে লাশের স্তূপে তারা পড়ে ছিলো। গঙ্গায় পড়তেই হাত পা চালিয়ে সাঁতার কেটে এসে উঠতে চেয়েছে সেই অর্ধমৃত হতভাগ্যরা।

পাড় থেকে মামুদাদার চেলারা খোন্তা দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে তাদেরকে মেরে ডুবিয়ে দিয়েছে গঙ্গায়। আর পৈশাচিক উল্লাসে হেসেছে। রসিকতা করেছে।

সেই কথা মনে হতেই বুকে ভয়ের হিম প্রবাহ বয়ে যায় নসিরণের। তিনি স্বামীকে ঠেলা দেন—ওঠো গো, ওঠো….

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বসলেন কাজী—কি হৈচে ?

নসিরণ ফিস্‌ফিসিয়ে বলেন—বাইরে কিসির শব্দ ?

কাজী উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললেন—মানুষের।

: কারা ?

: কি কৈরে কবো ?

: তোমার দল নাতো ?

: বুঝতি পারতিছি না।

হারিকেনের আলোটা আরো কমিয়ে দিয়ে কাজীর হাত ধরে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন নসিরণ। কাজী নসিরণকে বুকে টেনে নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললেন—কোনো একটা অঘটন ঘটতিছে এ পাড়ায়। তবু ভয় পায়ো না। চলো-খিড়কির দরোজা দিয়্যা আমরা বাড়ায়া যাই।

নসিরণ সভয়ে মাথা নাড়েন—না। না। কনে যাব অ্যাতো রাত্তি, এই দুর্যোগে।

: যদি হারু মণ্ডলগরে লোকেরা আইসা থাকে-তালি খুবই বিপদের কথা মদনের মা।

: না-গো। তুমি আর মদনের মা কৈও না। আমার বুকের মধ্যি খা-খা করে।

: নসু।

নসিরণ কথা বললেন না। স্বামীকে আরো শক্ত ক'রে আকড়ে ধরলেন।

: আমার বিশ্বাস মদন আছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। কোনো খবর না পালি মনে করতি হবি....শুভ খবর

: মিছ্যা আশা দিয়্যা কি লাভ আর। টিয়াদিদিও তো কত কথা কইছে। আমার সাথে বাজি ধৈরছে। মদনের নাকি অ্যাতো সস্তা মরণ হতিই পারে না।

: টিয়ার কথা আমিও মানি। মদন কি একটা ছুরির ঘায় জীবন দেওয়ার ছেলে আমার ?

দরোজায় টোকা।

ঠক্‌ ঠক্‌। ঠক্‌ ঠক্‌।

নসিরণ শিউরে ওঠেন : তুমি খিড়কি দিয়্যা বাড়ায়া যাও।

: না। যা হয় হবি। পালাবো না আমি।

ঠক্‌ ঠক্‌। ঠক্‌ ঠক্‌।

দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকেন ঘরের ভেতরে দু'জন শোকাচ্ছন্ন মানুষ। নসিরণ বলেন—কথা কৈও না। তুমারে উরা মাইরে ফ্যালাবে...। দরজা যদি খুলতি হয়, আমি খোলবো। তুমি খিড়কির দুয়ার ঘুচায়ে রেডি থাকোগে। তবু কাজীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নসিরণ তাকে ঠেলে সরিয়ে দেন—তুমার দুইখান পায় ধরছি, যাও। না গেলি আমি থামের সাথে মাথা ঠোক্‌পো কিন্তু।

কাজী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—আমিতো বুড়া হয়া গিছি। রোজই তো উরা জোয়ান-তাজা ছেলেগুলারে ধৈরে মারতিছে। খবরের কাগজ খুললিই মরার খবর। তো কুকুর-বিড়ালের মতো পলায়া পলায়া মরা ক্যা? লড়াই কৈরে মরা উচিত। বিষয়ডা এক তরফা হতি থাকলি খুনীগরে মনোবল অটুট থাকে। পালটা রুইখে দাঁড়াতি পারলি উরা পিছু হৈটে যাবি। উরা ভাড়াটে খুনী, আমরা সমাজটারে বদলাতি চাই। কি জন্যি জীবনভর ভাইগে যাবো? পলায়া যাবো? আমার ফালাডা কনে?

বলেই লাফ দিয়ে মাচার দেয়াল থেকে ফালাটা খুলে নিয়ে আসেন কাজী। সেই সময় দরোজার বাইরে থেকে গাজিয়ুলের ডাক শোনা গেলো—চাচা, আমি গাজিয়ুল।

চোখের পলকে ছুটে গিয়ে দরোজা খুললেন কাজী। নসিরণও হারিকেনের আলোটা উস্‌কে দিয়ে এগিয়ে গেলেন দরোজার দিকে।

সারা শরীর ভিজে জব্‌জবে গাজিয়ুলের। হাতে পাইপগান। দাড়ি-গোঁফে মুখটা ঢাকা। হঠাৎ দেখলে চেনা মানুষেরও ভুল হবে গাজিয়ুলকে চিনতে। শুধু ওর তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল চোখ দুটি বলে দেয়—আমি গাজিয়ুল হে। তামাম তিমিরপুরের ভোমাগরে সামনাসামনি একাই সাবাড় কৈরে দিতে পারি।

অনেকদিন পরে ফেরারী গাজিয়ুলকে পেয়ে তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলেন কাজী—ঘরে আইসে কাপড় বদলাও আগে। পরে কথা বার্তা কই।

গাজিয়ুল নসিরণের পায়ে হাত দিয়ে সেলাম করে। নসিরণের বুকে তখন হু হু ক'রে শোকের ঢল উথ্‌লে ওঠে। তিনি কী একটা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গাজিয়ুল সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার ঠোঁটে হাসি। বাঁ হাতে মাথার বাবড়ি চুলের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলে—মানেরা অ্যাতো সহজে মরে না চাচি।

: কি? কি কৈলে গাজিয়ুল? কি কৈলে; আবার কও। আবার কও। বলতে বলতে নসিরণ গাজিয়ুলের পাইপগান টেনে ধরেন।

গাজিয়ুল তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় নসিরণের দিকে। তারপর দীর্ঘ সময়ের শূন্যতার বৃত্তে বৃশ্চিক দংশনে দংশিত, নীল বিষক্রিয়ায় জর্জরিত নসিরণের সামনে মেলে ধরে অভাবনীয় সুখের পয়গাম—মদন আছে। ভাল আছে।

খুশিরে তোর সাদর সম্ভাষণ....

বৃষ্টির উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়ায় বহুদূর থেকে কে যেন এই মুহূর্তে শোকাচ্ছন্ন

দুটি যুগল মূর্তিকে ডাক দিয়ে ওঠে—আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয়/ওহো বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয়…।

কাঁপছিলেন নসিরণ। কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন চিবুক-বুক। একটু একটু টলছিলেন। হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন তিনি। গাজিয়ুল তার হাত ধরে। টেনে নিয়ে বসায় বিছানায়। সে কেয়ার করে না তার ভিজে শরীরের। পাইপগা'নটা নামিয়ে রাখে মাচায়।

: চাচি। তুম্ কৈরে খবরডা দিতি চাইনি। সৈকতও কয়া দিছিলো তাই। আমি য্যানি কিরম মুখ আটকাতি পাইরলাম না। পায়চারি করে গাজিয়ুল। তাকে উত্তেজিত দেখায়। চৌকাঠে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাজীকে দেখে একবার। তিনি সে মুহূর্তে নির্বাক। দেখতে দেখতে আবার ঘরময় হেঁটে বেড়ায়। তারপর থম্কে দাঁড়িয়ে বলে—খুব খারাপ পরিস্থিতি হৈছিলো মদনের। বাঁচার কুনো কথা ছিলো না। ছুরিতে বিষ টিষ ছিলো। সেপটিক হয়া গিছিলো। অতবড় ঘা-খায়াও মদনডা তিন মাইল সাঁতরায়া ভাটিতে গিয়্যা উঠছিলো আমাগরে এক সমর্থক চাষীর বাড়ি। সেখান থিকে কৈলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা কৈরে দিছিলো তারাই। পেরায় দুই মাস বিছানায় শুয়ে ছিলো ও। এখন সুস্থ। হাঁটা চলা করে।

নসিরণ সেই সময় হৃদয়ের ভেতরে বললেন—তুরা আমার সোনার টুকরা ছেলে। একদিন তুরা তুগারে ভালবাসার মূইল্য পাবি।

কাজী এগিয়ে এসে গামছা দিলেন। সেলাই করা একখানা লুঙ্গি দিলেন। বললেন—জামা কাপড় ছাড়ো। তারপর নসিরণকে বললেন—এট্টু চা করো মদনের মা। চারডে মুড়ি মাথায়া দ্যাও বেশ কৈরে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়্যা। শীতে কাঁপতিছে গাজী।

গাজিয়ুল জামা কাপড় ছাড়ে। মাথা শরীর মোছে আয়েস ক'রে। এক সময় বলে—পাড়ায় ঢুকতিই একটা কুত্তা পেছু নিয়্যা ঘেউ ঘেউ করিতিছিলো। কিছুতিই যায় না। বাধ্য হয়া চাকু মারছি হারামজাদারে। অ্যাহনো গোঙাতিছে সামনের মাঠটায়।

কাজী মাথা নাড়লেন—আমরাও শুনিছি গোঙানি। মনে করিছিলাম কি না কি! তুমার চাচি তো খুব ভয় পায়া গিছিলো।

নসিরণের তখন গান গাইতে ইচ্ছে করছিলো। ইচ্ছে করছিলো ছুটে গিয়ে

কাজীর গলা জড়িয়ে ধরে হা-হা ক'রে হাসেন। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে সামলাতে তিনি চা করলেন। মুড়ি মাখলেন।

কাজী দরোজাটা আটকে দিয়ে বসলেন এসে মোড়া টেনে গাজিয়ুলের সামনা সামনি। মনের মধ্যে তার হাজার প্রশ্ন। নানা আশা-নিরাশার দোলা। ভাবলেন খুটিয়ে খুটিয়ে সব কিছু জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেবেন গাজিয়ুলের কাছ থেকে।

সবেমাত্র গাজিয়ুল চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে—সেই সময় দূর থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো। উৎকর্ণ হতে গিয়ে চায়ের কাপটা ছল্‌কে পড়ে গেলো মেঝেতে। ভেঙে গেলো কাপটা। ছুটে এলেন নসিরণ—কিসির শব্দ ?

গাজিয়ুল ততক্ষণে পাইপগানটা হাতে নিয়েছে। সে বললো—গুলির শব্দ। রাইফেলের।

কাজী বললেন—ডাকাইত পড়িছে মনে হয় দাস পাড়ায়।

নসিরণের বহুদিন পরে মুহূর্তের জন্যে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখটা আবার ফ্যাকাসে হয়ে যায় ভয়ে। তিনি বিচলিত হয়ে বললেন—কি হবি ?

হঠাৎ দরোজায় করাঘাত।

ঘরের ভেতরে বজ্রপাতের আলোড়ন। নসিরণ একবার কাজীর দিকে একবার গাজিয়ুলের দিকে তাকান। গাজিয়ুল চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাকে দরোজার দিকে এগুতে দেখে কাজী পেছন থেকে তার হাত ধরে বলেন – না। তুমি খিড়কির কাছে যাও। আগে দেখি কেডা...। যাও....

গাজিয়ুল একবার ইতস্তত করে। তারপর ছুটে চলে যায় খিড়কির দরোজায়।

দরোজায় ধাক্কা দিতে দিতে কলিমুল্লাহর গলা শুনে আশ্বস্ত হলেন সকলে – আমি কলিমুল্লা। কুঞ্জ বাগ্‌দিগরে পাড়ায় পুলিস ঢুকিছে। ঘরে ঘরে তালাশি চৈলছে।

খুব জোরে বৃষ্টি আসে। শম্ শম্ শব্দে ছেয়ে যায় চারদিক।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া।

কাজী ব্যস্তভাবে বললেন—গুলির আওয়াজ হৈলো যে ?

কলিমুল্লাহ চেঁচিয়ে বললেন – বুঝতি পারতিছি না তয় আমি খানিক আগে বড় রাস্তার পর মোটরগাড়ির আওয়াজ পাইছি। গাজিয়ুল আড়ি পেতে

শুনছিলো। সে এগিয়ে এলো পোশাকের নিচে পাইপগান লুকিয়ে—ও নানা, কি করা যায় তালি ?

গাজিয়ুলকে দেখে চম্‌কে ওঠেন বৃদ্ধ কলিমুল্লাহ। খানিকটা থতমত খেয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন...এইসোময় কিডা তুমারে এহানে আসতি কয়ছে ?

গাজিয়ুল সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে—আমরা খানিক আগায়ে যাই চলো।

কাজী বললেন—তাই চলো।

কলিমুল্লাহ বললেন—মসজিদের বারান্দায় অপেক্ষা করতিছে মজনুরা। চলো।

নসিরণ সভয়ে বলে উঠলেন—তুমাগরে মাথা খারাপ হইছে নাকি! এই দুর্যোগে যাও কনে ?

কাজী একবার নসিরণকে দেখলেন। তার সারামুখে উত্তেজনা—তুমি খিল আটকাও। আমরা আগায়ে যাবো।

কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন নসিরণ। কাকে কি বলবেন। সকলে তখন মসজিদের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।

সেই সময় আবারও হাওয়ায় গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। সাথে সাথে অনেক নারী পুরুষের ভয়ার্ত কোলাহল। একটু পরেই কোলাহল থেমে গেলো। বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ। পর পর তিনবার গুলির আওয়াজ। গাজিয়ুল মসজিদের আগে পুকুরের দক্ষিণপাড়ে একটা ঘন লেবুর ঝাড় ছিলো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখাদেখি কাজী ও কলিমুল্লাহও দাঁড়ালেন।—অ্যাতো ফায়ার করতিছে....!

গাজিয়ুলই বললো—আমি ওদিক যাবো না। এখেনেই দাঁড়াই।

কাজী তাকে সমর্থন করলেন—সকলের সামনে যাওয়া ঠিক না তুমার। চাচা, আপনে উদিক যায়ে কন, সবাই য্যানি মস্‌জিদেই অপেক্ষা করে।

কলিমুল্লাহ চলে গেলে গাজিয়ুল বলে—আসলে আমি একটা দায়িত্ব নিয়্যা আইছি চাচা।

: কি ?

: পরে কবোনে।

: একলাই ?

: হু।

: তালি তুমি ঘরে যাও।

ক্যা!

: কারো জানার দরকার নাই যে, তুমি গিরামে ফিরিছো।

: তা ঠিক।

: যাও।

: খানিক দেখি না, ওদিক কি হতিছে।

: অপারেশন।

: ঠিক।

: ভোরের আগে জানা যাবিনে গুলিতি কেউ মারা গিছে কিনা।

: মারা তো যাবিই। মারার জন্যিই তো গুলি।

কাজী মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—তাইতো। গুলি করে খুন করার জন্যি। সারা দ্যাশ জুড়ে এই তাণ্ডব, এই হৈত্যালীলা চলতিছে। কাগজে দেইখলাম ফ্রান্সের অ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্যাশনালের তরফ থিকে ভারত সরকারের কাছে এই রাজনৈতিক হৈত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান হইছে।

গাজিয়ুল ওয়াক শব্দ ক'রে থু থু ফেললো—কি হবি তাতে?

: কিছু না হৈক। বিশ্ববাসী তো জানতিছে এইসব।

: তাতে আমাগরে মরণ বন্ধ হবিনে চাচা। পার্টি কইছে—এখন আচম্কা হামলার মুখি আমরা টিকে থাকার জন্যি পিছু হট্‌তিছি। এসময় উগারে আক্রমণের ধার বেশি, জোর বেশি। প্রতিরোধ করতি সামনাসামনি হতি গেলে আমরা ধ্বংস হয়া যাবো। তাই পিছাও, পিছায়ে যাও, তারপর উরা যখন ক্লান্ত হয়া যাবে, মনে কৈরবে আমরা ধ্বংস হয়া গিছি সেই সোময় পালটা আঘাত করতি করতি আগায়া যাতি হবে। আর থামাথামি নাই। তখন জনগণও আমাগরে সাথে সাথে আগায়ে আসপে। তো ইয়ার মাঝেও যেথানে যেথানে সম্ভব, দুই-চাইরবার হানা দিতি হবেই।

শুনলেন কাজী। কোনো উত্তর দিলেন না। গাজিয়ুলের কথা তিনি বুঝতেও পারলেন না। আর কুঞ্জ বাগদিদের পাড়ার দিক থেকে কোনো সাড়া-শব্দও শোনা গেলো না। কাজী মনে মনে হাসলেন। কেন যে হাসলেন তিনি নিজেও তা হয়তো জানেন না।

পরদিন কাক ভোরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু কেউ টু শব্দ করলো না।

ফিসফিস ক'রে চাপাচাপি কণ্ঠে, চারদিক ভাল ক'রে নজর ক'রে একজন

আরেকজনের কাছে খবর পৌছে দিলো। কাঁদছিলো মানুষের হৃদয়। গুমরে গুমরে কাঁদছিলো।

চোখ মুখ লাল। চাপা, ফোলা ফোলা। গম্ভীর। বিষণ্ণ।

মাঝে মাঝে চোয়ালের হাড়ে স্ফীতি।

গাছ-গাছালির ধোয়া পাতায় ঝকমকে রোদেও যেন কিরকম চাপা একটা ক্রোধ।

ক'টা? ক'টা হে?

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচটা না।

ষোলোটা লাশ।

পুলিস ঘিরে আছে তিনটে পাশাপাশি পাড়া। কে যায় লাশের কাছে।

কারা এসেছিলো হানা দিতে কাল রাতে?

পুলিস। পুলিস এসেছিলো রাইফেল হাতে।

না। না। ভোমাদেরকে হায়ার ক'রে নিয়ে এসেছিলো হারু মণ্ডলের উপদেষ্টা দীপক সান্যাল আর রঙ্গলাল দাগা।

পুলিসই এসেছিলো সাদা পোশাকে। মুখে কালো কাপড়ের ঢাকা ছিলো। এ কাজ পুলিসের। ভোমারাও সঙ্গে ছিলো।

না হে না।

পুলিস এসেছে আজ খুব ভোর ভোর। সূর্য ওঠার আগে।

ওদিকে কান্নাকাটির রোল উঠেছে।

কি?

কি কতিছো?

কুঞ্জ বাগ্‌দি নাই?

হ হে।

কুঞ্জ বাগ্‌দির বুকে গুলি, পুরুষাঙ্গের উপুরে বেয়োনেটের খোচা। তার ব্যাটার বউরে কারা জঙ্গলে টাইনে নে ধর্ষণ করিছে। পাঁচ মাসের পোয়াতি বউডা মরো মরো।

হায় ভগোমান।

আল্লা-মাবুদ...।

খালি কুঞ্জ বাগ্‌দির ব্যাটার বউ বেইজ্জৎ হয় নাই। সুরেন দাসের সেয়ানা বিটি, কি নাম তার? একজন ফিস্‌ফিসিয়ে বলে দেয়—পুতুল।

পুতুল। পুতুলও ইজ্জৎ হারাইছে। দশ-বারোজনে তার উপুরে অত্যিচার করিছে। তার এখন জ্ঞান নাই।

শিবু বাগ্‌দি বাধা দিতি গেলি তারে বেয়োনেট দিয়্যা খোচায়া খোচায়' মাইরছে দস্যুরা। মাইরে হের ঘরে আগুন দিছে। তার বউ বিটির কোনো খোঁজ নাই।

ক্যা?

কারণডা কি?

কি করছিলো হেরা?

হাওয়ায় হাওয়ায় কথা ভেসে যায়। ভেসে যায় এক প্রান্ত থেকে জনবসতির অপর প্রান্তে।

প্রত্যন্ত থেকে প্রত্যন্তরে।

খুব বড় অপরাধ ছোটলোকগরে।

মাহুদাদার শিষ্য—হারু মণ্ডল হতিছে একালের পরমহংস। শ্যামামার সাইক্ষ্যাৎ সন্তান। তারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দেয় নাই ওইসব ছোট-লোকেরা।

কাজীপাড়াও তো ভোট দেয় নাই হারু মণ্ডলরে।

তালি কাজীপাড়ায়ও বর্গিগরে হেঙ্গামা হবি। নির্ঘাৎ হবি।

একটা কথা আছে।

কি কথা কও।

কথা এই, ইন্দিরাজী কইছে, মোসলমানগরে খুব বেশি কিছু কওয়া যাবিনে। তালি সারা ভারতের মোসলমানরা ক্ষেপি যাবি। আরব দ্যাশে এ খবর গেলি-ত্যাল বন্ধ কৈরে দিবি তারা। তাই হেগোরে কলে মারো। ছলা-কলায় মারো। ঘুপচিত্-ঘাপ্‌চিত্ খতম কৈরে দ্যাও। কাক পক্ষিতে য্যান্ টের না পায়।

মজার খবর হে।

কি। অ্যাত্তো দুঃখের মধ্যি মজার খবর কি?

হারু মণ্ডল শ্যামা-মার মন্দিরের সামনে অনশন শুরু করিছে সকাল থিকে।

ক্যা? মণ্ডল অনশন করবি কি জন্যি?

এসব উদ্ভট কথা। গুজব।

না—না গুজব না। যায়া দেইখে আসোগে।

লাল ঝাণ্ডারা কাল রাইতের বেলা গিরামে ঢুইকে হৈত্যাকাণ্ড চালাইছে। নারীর সমভরম নষ্ট করিছে...।

দেওয়ালে দেওয়ালে লালঝাণ্ডা অলাগরে বিরুদ্ধি পোস্টার লাগায়া দিছে। সেখানেও এই কথা লিখ্যা দিছে মণ্ডল। হের পরতিবাদে তার এই অনশন।

দেখোগে যায়া কি কাণ্ড।

মন্দিরের সামনে লোকে লোকারণ্য।

হ হ। ঠিক কথা।

এই মাত্তর দেইখে অলাম আমরা। পুলিসের বড়বাবু পায় ধরতিছে মণ্ডলের অনশন ভাঙার জন্নি। মণ্ডল শুনতিছে না।

তার এক কথা, মার মন্দিরির বেদিতে আমি মাথা কুইটে মরবো। কেউ আমারে ঠেকাতি পারবিনে। দীপু, তুই আমার বন্ধু, পা ছাড় তুই। আমি কুনো কথা শুনবো না রে। আমার শ্যামামার মাটিতি নরবলি! নারীর ইজ্যৎ লুঠ...! ওরে, এযে কতবড় পাষণ্ড হলি, খুনী হলি করা যায়, তা ভাবতিউ পারিনেকো।

দীপু বলছে—তুই শান্ত হ হারু। শান্ত হ। লালঝাণ্ডাগরে আমরা দেইখে ছাড়বো ইবার। বাংলাদেশে শ্যাক্ মজিবর রহমান লালঝাণ্ডাগরে ডাণ্ডা মাইরে ঠাণ্ডা করতিছে। আমাগরেও মান্নুদাদা আছে রে। মান্নুদাদাও ছাড়ার পাত্র না। দারোগাবাবুরাও তো সাক্ষী, কারা এই কাণ্ড করতিছে।

মাথা কুটছে হারু মণ্ডল—যে যাই করে করুক। আমি আর এই আত্মা রাখুম না। জয় মা শ্যামা—মা-মাগো......

হারু মণ্ডল মাথা ঠুকতে গেলে দীপক সান্যাল শানের ওপরে দুই করতল পেতে দেয়। সেই করতলে মাথা ঠোকে মণ্ডল। হাউ হাউ ক'রে কাঁদে।

পুরোহিত স্তোত্র পাঠ করে।

মন্দিরের সামনে দিয়েই লরি বোঝাই হয়ে ষোলোটা মানুষ লাশ হয়ে চলে যায় পুলিসের হেফাজতে, হাসপাতালের মর্গে। ময়নাতদন্ত হবে হে।

কাটা ছেঁড়া হবে। কল্‌জে টল্‌জে সব ছিঁড়ে টিঁড়ে নাড়া চাড়া ক'রে দেখা হবে।

তার নাম ময়নাতদন্ত।

তো কুঞ্জ বাগদিদের লাশ সেই ময়নাতদন্তের ভাগাড়ে চলে যায়। হারু মণ্ডল মাথা কুটতে থাকে। কুটতে থাকে।

দীপক সান্যাল তখন কানে কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—ওভার অ্যাকটিং হ'তিছে শুয়ারের বাচ্চা। অজ্ঞান হয়্যা পৈড়ে যা। ধরাধরি কৈরে বাড়ির মধ্যি নিয়্যা যাবো নে।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার ক'রে উঠলো হারু মণ্ডল— আমি আত্মহৈত্যা করবো।

ব্যস্। ধপাস্ ক'রে কলাগাছেব মতো মাটিতে পড়ে গেলো হারু মণ্ডল।

চেঁচিয়ে উঠলো দীপক সান্যালও—হারু, হারুরে। বলে, সমিরুদ্দিকে ইশারা করলো—ওরে ধর, ধর। হারুর জ্ঞান নাই। অন্দরে নিয়্য চল।

অবশেষে তারা দু'জনে মিলে মণ্ডলকে অন্দর মহলে পাচার ক'রে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সাকসেসফুল অ্যাকটিং। ওভার অ্যাকটিংটাও চমৎকারভাবে নিয়ে নিয়েছে পাবলিক।

এ সবই লোকমুখে শুনলেন জাফর কাজী। তারপর পুলিস অবরোধ মুক্ত হলে তিনি লোকজন নিয়ে সোজা চলে গেলেন কুঞ্জ বাগ্‌দিদের পাড়ায়। গিয়ে দেখলেন তুলসিমঞ্চ উপ্‌ড়ে পডে আছে। হাঁড়ি-পাতিল, ভাঙা মাচ-উঠোনময় ছডানো ছিটানো। মাটির উনুন চুবচুর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কলাই-ওঠা-থাল-বাটি-মাটির কলসি দিক্‌হীন। ঠিকানাহীন।

সমস্ত পাডায় স্তব্ধ শোকের ছায়া। কতগুলো দাঁড়কাক ঘরের চালে, উঠোনে কা-কা করছে। কোনো ঘরে হাঁড়ি চড়েনি। শিশুরা পর্যন্ত নির্বাক। মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে গালে জলের দাগ নিয়ে বসে আছে, অথবা ভাঙাবেড়ায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে কোন্‌দিকে যে তাকিয়ে আছে, কি ভাবছে-কে জানে।

কাজীকে দেখে কেউই এগিয়ে এলো না। সবাই দেখলো। চেনে তো সবাই। কিন্তু রা কাড়লো না একজন বৃদ্ধ বা একজন বৃদ্ধা, কিংবা কোনো জোয়ান ছেলে, অথবা তাদের বউ-বিটিরা। কাজীর কাছে এ এক অভাবিত ঘটনা। অভিজ্ঞতাও।

কুঞ্জ বাগ্‌দির বেটার বউটা ঘরের দাওয়ায় পড়ে আছে। তখনো ধুঁকছে। মাঝে মাঝে উ-আ শব্দ ক'রে তার ওপরে পাশবিক অত্যাচারের যন্ত্রণা প্রকাশ করছে। হা করছে বউটা বারবার। কে একজন বিধবা···তার হাতে জল। সে একটু একটু ক'রে ঢেলে দিচ্ছিলো সেই জল ওর মুখে। পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাতেই কাজী চিনতে পারলেন টিয়াকে।

টিয়া তাদেরকে দেখে উঠে অন্যত্র চলে গেলো।

ওদিকটায় শিবুর ঘর। ঘর নেই এখন। পোড়া ভিটেটা পড়ে আছে। শিবুতো মর্গে চালান হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। টিয়াকে সেদিকে এগিয়ে যেতে দেখে কুঞ্জ বাগ্‌দির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ অনুভব করলেন কাজী। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ একবার মাথায়, আর একবার মাথা থেকে পায়ে তরঙ্গায়িত হতে হতে তিনি মজনুর দিকে ফিরলেন। পেছনে কাজীপাড়ার চল্লিশ পঞ্চাশজন পুরুষ।

মজনু দ্রুতবেগে এগিয়ে এলো কাজীর সামনে।

কি ভাবলেন যেন কাজী। বোধহয় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের যৌবন-ধারায় তিনি অবগাহন করতে করতে একসময় বললেন—সবাইকে ডাক এই বড় আঙিনাটায়। সকলের সঙ্গে এইখানে দাঁড়ায়া কথা কই। যা।

মজনু, জয়নাল আরো কয়েকজন প্রতিটি ঘরের সামনে গিয়ে কাজীর কথা জানালো। অনুরোধ করলো কুঞ্জ বাগদির বড় উঠোনের আঙিনায় আসতে।

একটু দেরি হলো। কিন্তু এলো সবাই।

এক এক ক'রে প্রায় অচল পায়ে হেঁটে হেঁটে এসে দাঁড়ালো কেউ কেউ। দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়লো ধুলো-মাটিতেই।

কাজী দেখলেন এক এক ক'রে প্রতিটি অবয়ব। বোবা চাহনি! যুগান্তের শোকাচ্ছন্ন চালচিত্র মাথা অবয়বে চোখ জোড়া বিষণ্ণতার আর্তি।

কাজী মনে মনে বিড় বিড় করলেন। কি জন্যি একটা মানুষও কথা কয় না? কাঁদে না? ক্ষোভ প্রকাশ করে না? ক্রোধে ফেটে পড়ে না? বোবা, অথর্ব, ভাষাহীন মূক-বধির হয়ে গেলো এক রাত্রির পাশবিকতায়?

নিষ্ঠুরতার পরে তো মানুষের বিবেক জাগরিত হয়। যেখানে অত্যাচার মানুষকে পিষতে পিষতে দেয়ালে নিয়ে পিঠ ঠেকায়, সেই তখন থেকেই তো শুরু হয় দেয়াল ভাঙার, অচলায়তনের বৃত্ত ভাঙার যূথবদ্ধ প্রয়াস।

হয় দেয়াল ভাঙো, বৃত্ত ভাঙো, না হয় এগোও। এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে কোরাশ।

যূথবদ্ধ মানুষ তখন স্পার্টাকুসের শক্তি অর্জন করে।

কিন্তু একি !!

কাজী কথা বললেন তার গম্‌গমে গম্ভীর স্বরে সংক্ষুব্ধ জ্বালা নিয়ে—একটা না,

দুইটা না, পাঁচটা না, ষোলো ষোলোটা মানুষ—এখন লাশ হয়া ডোমের হাতে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার অপেক্ষা করতিছে। চরাচর প্রকম্পিত ক'রে গর্জন ক'রে উঠলেন তিনি—কিন্তু কি অপরাধ সেই মাটির মানুষগরে? নিজিগরে বুকে আঙুল ঠুকি যার যার অন্তরের কাছে প্রশ্ন করো—কি জন্যি গরীবগরে ঘরের মা-বৈনগরে ইজ্জৎ হারাতি হৈলো? কোন্ দানবগরে চক্রান্তে? কারা আইছিলো কাইল-বাদলঝরা রাইতের আন্ধারে কালো মুখোশে মুখ ঢইকা. তুমরা সবাই চেনো তাগরে। চিনি আমরা সবাই। অপরাধটা কি? আমরা গরীব। আমাগরে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার কুনো অধিকার নাই। অথচ দানবের দল প্রচার করে, এ দ্যাশে ধনী-গরীবের সমান অধিকার। তার মানে কী? তারও একটা মজার মানে আছে। ধনী গরীবের সমান অধিকার মানে, ধনীর দশ কোটি টাকা আছে, সে তার দশ কোটি—কুড়ি কোটি বানানের অধিকার রাখে। গরীবের দশ টাকাও তো আয় নাই। তার অধিকার না খায়া—অনাহারে বিনা চিকিচ্ছেয় কুত্তার মতো ধুঁইকে ধুঁইকে মরার। এই হৈলো ধনী গরীবের সমান সমান গণতান্ত্রিক অধিকার! যদি ইয়ার উলটাডা আমরা বুঝতি চিন্তা করি, ওমনি—ষোলোজন মানুষ খুন হয়া যায়। আমাগরে মা বৈন্‌রা বেআব্রু বেইজ্জৎ হয়। যা কাইলকের বাদ্‌লা রাইতে হইছে।

তুমরা শোকে-দুঃখে বোবা-পাথর হয়া গিছো জানি। আমি যদি আমার বুকটা ছিঁড়া দেখাতি পাইরতাম, বুঝতি পাইন্‌তে কি কঠিন জ্বালা, কি নিদারুণ ব্যথা...। বলতে বলতে হঠাৎ হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন কাজী।—তুমাগরে পাঁচমাসের পোয়াতী বউডারেও উয়া তো ছাইড়ে দেয় নাই! ভাবতি পারো' কী দোজখ্...। হাবিয়া দোজখের আগুনে আমাগরে জ্বালায়া পুড়ায়া শ্যাষ কৈরে দিলো।

কুঞ্জদা, শিবুভাই-এরা তো কুনোদিন অন্যায় পথে যায় নাই। সৎমানুষের মেজাজডাতো আগুনে পুড়া। গরম তো তার মাথায় থাকপিই। জানি তাগরে লাশগুলাও আমরা ফেরত পাবো না। লাশ কাটা—ছিঁড়া হবি কি হবি না, রাত্তির আঁধারে তা নদীত ফ্যালায়া দিবি কি না—কে কতি পারে সে কথা। তো একটা কথা কিন্তু আমাগরে এই শোক দুঃখের সময়ও মনে রাখতি হবে, এই অত্যিচার চিরদিন চলতি পারে না। ইয়ারও অবসান আছে। শ্যাষ আছে। ধ্বংস আছে। তাই যারা আমরা বাঁইচে আছি, খোড়ায়া খোড়ায়া

হাঁটা চলা করতিছি, জানি না কাইল আবার এই সোময় আমিও কুঞ্জদা বা শিবু ভাইগরে কাছে যাবো কি না, তবুও কই, এরম শোকের বানভাসিতে নিজিগরে ভাসায়া দিলি তো কেউ বাঁচতি পারবো না।

একটু দম নিলেন কাজী। দেখলেন বোবা, মূক, নির্বাক অবয়বে রেখার ছায়া। ভূরুতে কুঞ্চন। চোখের বিষণ্ণতা একটু একটু ক'রে পালটে যাচ্ছে। একটু যেন নড়ে চড়ে বসছে সকলে। গুঞ্জনের মতো শব্দ। ক্ষুধিত ফুটি-ফাটা মাটি যেন চাতকের মতো জলের জন্যে ভাষাহীন গুঞ্জনে চিৎকার করছে, ফুটিক জল, ফুটিক জল।

এদেরকে নজরুল বলতেন মানুষের ভগবান। বলতেন নরনারায়ণ। এদের ভেতরেই তো সুপ্ত হয়ে আছে যুগ-যুগান্তের লাঞ্ছিত ভগবান। হাতুড়ির ঘা পড়লে সেই ভগবান নৃসিংহ মূর্তি নিয়ে গর্জে উঠবে, আত্মপ্রকাশ করবে হিরণ্যকশিপুদের সংহারের জন্যে।

ঘা দাও! আঘাত করো। অনবরত। শেষ পর্যন্ত। যতক্ষণ না সুপ্ত আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। এইভাবেই একদিন নরঘাতক সামন্ত প্রভুদের গিলোটিনে মাথা দিতে দিতে ফ্রান্সে জেগে উঠেছিলো নরনারায়ণেরা। প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলো, আমরা, শুধু আমরা নরনারায়ণরাই মৃত্যুহীন। বাস্তিল দুর্গের গিলোটিন, তার পাথর সাজানো দেয়াল ধসে পড়েছিলো জাগরিত মূক-বধিরদের অনন্ত শক্তির আঘাতে।

কাজী বললেন—শোকাতুর হয়া বৈসে থাকলি পঙ্গু হয়া যাবো আমরা। আর যারা প্রহ্লাদ আছো, হিরণ্যকশিপুরা তাগরে নিশ্চিহ্ন করার জন্যি বারবার আক্রমণ চালাবি। আমরা কি খালি খালি পৈড়ে পৈড়ে মারই খায়া যাবো অনন্তকাল ধৈরে? প্রহ্লাদের মতো যদি গর্জে উঠে কতি পারি—আছে আমাগরে ভগবান ওই কুঁড়ে ঘরের মধ্যিই ঘুমায়ে আছে—তো একদিন সত্যি সত্যিই ভগবানের ঘুম ভাঙবে হে। আমাগরে ভগবান তো চাষা-ভূষো, কামার কুমার, তাঁতি-জেলে-মাঝি-মাল্লা-কুলি মজুরের দল। সৈংখ্যায় কারা বেশি? নিজের বুকে দুম্‌দুম্‌ ক'রে ঘুসি মারতে মারতে কাজী বললেন—আমরা, আমরাই সৈংখ্যায় বেশি। হেরা যদি পাঁচজন হয়, আমরা পাঁচ হাজার হে। কার শক্তি বেশি তালি? হেরা যদি পাঁচ হাজার হয়, আমরা তালি পঁচিশ কোটি হে...।

পঁচিশ কোটি যদি পাঁচ হাজারের স্যামনে খাড়ায়া গর্জন কৈরে ওঠে—হুঁশিয়ার; আমাগরে উপুরে একটা পাটকেল ছুঁইড়ে মারলি আমরা এক লহমায়

তুমাগরে সুখের ইমারত মাটির সাথে মিশায়া দেবো···। তো পারবি হিরণ্যকশিপুরা ?

ও ভাই, মা-চাচি-বৈনেরা, শোক ছাড়ো, মনের মধ্যি কাঁদো, চোখির তারায় আঁজাল সাজায়া রাখো। শোকরে শক্তিতে শান দিয়া উইঠে দাঁড়াও। চলো-যার ঘর পুড়িছে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলায়া তার ঘর তুইলে দেই। যার ঘরে চাল-চুলা নাই, আমরা একসাথে তার চাল-চুলার জোগাড় কৈরে দেই। ওঠো, তৈয়ার হও। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞে করো। হিরণ্যকশিপুরা ফের আমাগরে ইজ্জতের উপুর, প্যাটের উপুর হামলা করে তো—আমরাও হাত পা গুটায়া বৈসে থাকপো না। কুঞ্জদা, শিবু ভাইগরে আত্মা তাতে খুশি হবে।

রোদ্দুরে ঘেমে ওঠা বাগ্‌দিপাড়া তেতে উঠতে উঠতে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়। কাজী বললেন—আইজ থিকে আমরা গরীবরা—কেউ হিন্দু না, কেউ মুসলমান না। আমরা গরীব। আমরা ভাই ভাই কাঁধে কাঁধ মেলাই চলো....।

ঠিক কথা হে।

মেয়াছিলের মতো কাঁদবো ক্যা হাত পা গুটায়া ?

রক্তের বদলে রক্ত নিতি হবে। দাঁতের বদলে দাঁত চাই হে। আর জানের বদলে জান ধৈরে টান চড়াবো ইবার।

হ। হ। কোরবান। জান কোরবান হে।

এই উঠানে কারবালা হয়া যাবে—এজিদের বংশধররা যদি হামলা করতি আসে।

এইভাবে ঘুম ভেঙে দিয়ে, শোকের প্রচ্ছন্ন আলস্য তাড়িয়ে দিয়ে কাজী যখন ঘরে ফেরেন, তখন রাত হয়ে যায়। তবুও নিজের শ্রান্তি-ক্লান্তির কথা মনে থাকে না। তার কেবলই মনে হয়, টিয়াকে এসময় খুব প্রয়োজন। ওর ভেতরে আগুন আছে। ক্রোধ আছে। আছে প্রতিহিংসার জ্বালামুখ ওর দুই চোখের তারায়। ও পারবে এদেরকে সাহায্য করতে। হারাবার তো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ওর। পঞ্চাশোত্তীর্ণ বয়সে কিছুই তো করার নেই। যদি আর্তের পাশে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু ওকে সারাদিনে আর একবারও খুঁজে পাননি তিনি! কুঞ্জ বাগ্‌দির বেটার বউর মুখে জল দিতে-দিতে কোথায় উধাও হয়ে গেলো। কেন? ওর উধাও হবার কোনো কারণ তো তিনি খুঁজে পান না। ও তো নিজেই ছুটে

এসেছিলো। তিমিরপুরের-চাষী বাগ্দি, ভূঁইমালিরা সবাই টিয়াকে চেনে। পার্বতী ডাক্তারের মেয়ে বলে যথেষ্ট সম্মানও দেয়। কারোরই অজানা নয়, হারু মণ্ডলের বাবা ভরু মণ্ডল ফাঁকি দিয়ে ইসকুল গড়ার কথা বলে সত্তর টাকার সাদা স্ট্যাম্পে সই করিয়ে নিয়েছিলো। তারপর একটু একটু ক'রে গ্রাস ক'রে নিয়েছিলো স্থাবর সম্পত্তি।

মদনের খুন হবার গুজব শুনে নিজেই বারবার চলে এসেছে নসিরণের কাছে। কিন্তু কখনো তার দিকে ফিরে তাকায়নি একবারও। কথাও বলেনি। নসিরণই বলেছিলেন, কি মানুষ, কি হয়া গেলো। কষ্ট হয় গো। খাঁটি সৈন্ন্যাসিনী টিয়াদিদি।

কাজী সেকথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি তো জানতেনই, রক্তের যে ধারা তা কখনোই উল্টো মুখে চলে না। টিয়া পার্বতী ডাক্তারের মেয়ে. সেতো তার বাবার মতোই হবে। নিজের দুঃখ কষ্টের ওপরে স্থান দেবে অন্যের দুঃখ কষ্টকে। এ ওদের বংশগত আবেগ। কিন্তু টিয়ার সঙ্গে তার কথা হওয়া দরকার।

এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি উঠোনের পশ্চিম দিকের খেজুর গাছের সারির দিকে তাকালেন। বাবুই পাখির বাসাগুলি দুলছে উঁচু উঁচু খেজুর পাতায়। ওরা খুব চ্যাচাচ্ছিলো। সন্ধে ঘোর হলে চুপ হয়ে যাবে। মাঝে, মাঝে তখন অন্ধকারেও ওদের বাসায় জোনাক জ্বলবে মিট্‌মিট্ ক'রে। বহুদিন আপনমনে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছেন ওদের গরিবানা কায়দাকানুন। কি আশ্চর্য কাণ্ড করে ওরা। ওইতো অতটুকু পাখি। অ্যাতোটুকু। ছটাক-খানেক ওজন। সরু ঠোঁট। তাই দিয়ে খেজুরের অথবা তালের পাতা চিরে চিরে আঁটসাঁট ক'রে বাসা বাঁধে। তার দরোজা থাকে। জানালাও থাকে। জানালার অলিন্দে বসে হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খায়। দিনে গোবর নিয়ে এসে রেখে দেয় ছোট্ট বাসায়। সেই গোবরে জোনাক পোকা গুঁজে রাখে। রাতের আঁধারে আলোর প্রত্যাশায়।

বাবুইও আলোর প্রত্যাশায় তার বুদ্ধি খাটায়। পরিশ্রম করে।

মানুষ হে....।

একদিন একটা খরিশ কেউটের অসহায় অবস্থা দেখেছিলেন রাঙাশালিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে। বড় ঘরের পেছনে—বেশ খানিকটা দূরে, প্রায় দক্ষিণের মাঠের কিনার ঘেঁষে অনেকগুলো কাঁঠাল গাছ। কয়েকটার বয়স

প্রায় পঞ্চাশের ওপরে। মোটা গোড়ালি। নানাস্থানে খোড়ল হয়ে গেছে। ফলও ধরে না। ভাবছিলেন গাছগুলোয় খুব সারি কাঠ হবে। কেটে বিক্রি করলেও টানাটানির সংসারে কিছুটা সাশ্রয় হয়। গাছের কাছেই ফণী মনসা আর শরখড়ির ঝোপ প্রায় জঙ্গল ক'রে রেখেছে। তিনি ঝোপের কছে একদিন সকালে এসে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, বুড়ো একটা কাঁঠাল গাছের খোড়লকে ঘিরে প্রায় সত্তর-আশিটা লাল শালিক ঝাঁকে ঝাঁকে একদল উড়ে এসে খোড়লের ওপরে পাখা ঝাপটে কিছু একটাকে ঠোকরাবার চেষ্টা করছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফের উড়ে যাচ্ছে। অমনি আর একদল ক্রুদ্ধ ছোবল হানতে খোড়লের কাছে নেমে আসছে।

কেন? ওরকম করছে কেন শালিকেরা? এত শালিক তো একসঙ্গে কখনো দেখেননি তিনি। খুব কৌতূহল হলো। দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ ক'রে।

খোড়লটা বোধহয় ছোট ছিলো। ভাল ক'রে নজর ক'রে দেখলেন, ভেতর থেকে একটা লেজ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে শালিকদের আক্রমণ। ওটা খরিশ কেউটে। খুব পাজি জাতের সাপ। চুপি চুপি পাখির ডিম, শাবক চুরি ক'রে খেয়ে ফেলে। লেজটা আবার ঢুকে গেলো। পরক্ষণেই বেরিয়ে এলো। ছোট খোড়লে অতবড় সাপটা আত্মগোপন করার জায়গা পাচ্ছিলো না সম্ভবত। তাই বারবার লেজটাকে বাইরে ঠেলে দিচ্ছিলো।

দেখতে দেখতে লেজটা ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিলো শালিকের ক্রুদ্ধ-সংঘবদ্ধ আক্রমণ। চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত পড়তে লাগলো খোড়লের গা বেয়ে। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা মুখ বেরিয়ে এলো খোড়ল থেকে। খরিশ কেউটে। তার মুখে সদ্য ডিম ভাঙা একটা শালিক শিশু।

কাজীর মনে দারুণ উত্তেজনা তখন। তিনি নিজেই যেন শালিক হয়ে ওদের মতো উড়ে উড়ে ঠোকর দিচ্ছিলেন শত্রুর শরীরে। তেমনি ক'রে অবচেতন মনে হাত-পা-মুখ নাড়ছিলেন। ততক্ষণে খরিশ কেউটের মগজে সংঘবদ্ধ চঞ্চুর আঘাত শুরু হয়ে গেছে। পালানোর কোনো পথই পেলো না। পুরো দেহটাই একসময় বের ক'রে একবার বোধহয় পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু লালশালিকের পাখায় আর চঞ্চুতে তখন সুপারসনিকের গতি। ওরা একটা সেকেণ্ডও ওকে পালাবার সুযোগ দিলো না। ক্ষতবিক্ষত ক'রে প্রায় ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলো খরিশটাকে। একসময় মুখ থেকে টুপ ক'রে মৃত শালিক শিশুটি পড়ে গেলো। নিজেও...।

কি যে সেদিনের সেই শিহরণ। মনে মনে তিনি বিড় বিড় ক'রে বলেছিলেন—পারে। দুর্বলরাও যূথবদ্ধ হলে তাদের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী শত্রুকে পরাভূত করতে পারে।

শুনে নসিরণ হেসেছিলেন রসিকতা ক'রে—তুমি এখনও হামাগুড়ি দিতিছো। কুনোদিন তুমার বয়স হবিনে।

হেসেছিলেন কাজী নিজেও। হাসতে হাসতে হঠাৎ তার মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিলো। সেদিনের সেই রক্তাক্ত খড়িশ কেউটেটাকে মনে হয়েছিলো হারু মণ্ডলের মুখ। আর সেই পাখির শাবকটা? কার সেই ছোট্ট শরীরটা!

কার?

টিয়া টিয়া বলে পেয়ারা গাছে সেই সময় একটা টিয়ার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। আর অবাক হয়ে নসিরণ বলেছিলেন—কি গো, হঠাৎ ওরম যে পাইল্‌টে গেলে?

: কিছুই একরকম থাকে না। খালি পইল্‌টে যায়। বৈদ্‌লে যায়।

হতাশ হয়েছিলেন নসিরণ—কি জানি।

এখন বাবুই পাখিদের দেখলেন। দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ।

ঘরে ঢুকতেই নসিরণ বললেন—গাজিযুল চৈলে গিছে।

কাজী বিস্মিত হলেন—ক্যা?

: তুমারে চিঠি লিখে গিছে।

: শিগ্‌গিরি আনো।

নসিরণ চিঠি দিলেন এনে। সামান্য কয়েকটা কথা: আমার মাথায় খুব বড় দায়িত্ব। পার্টির নির্দেশ। কোনো কোনো স্থানে খানিকটা ত্রাস জাগাতে হবে। যাতে শত্রুরা ভয় পায়। সময়মতো দেখা হবে। আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যাবেন। চিঠিঠা ছিঁড়ে ফেলবেন। ইতি / গণেশ।

ছিঁড়ে ফেললেন চিঠিটা। একটু বিমর্ষ হলেন। অনেক কথা বলার ছিলো। জানবার ছিলো। হলো না। ঈশ্বর বাউল কোথায় জানতে পারলে ভাল হতো। মদনরা যেন এখানে হঠাৎ না এসে যায় তাও বলতে পারেন নি। যদিও ওরা এখানকার সব খবরই রাখে। বসিরহাট, হাসনাবাদ এলাকায় ওরা আত্মগোপন ক'রে কাজ করছে।

রাতে শোবার সময় কাজ কর্ম সেরে নসিরণ এসে কাজীর পায়ের কাছে

বসলেন। আস্তে আস্তে পায়ে হাত রাখলেন। ছুঁয়ে যাওয়াটা তো একেক সময় সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয় বুকের গভীরে। সে সময়টা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। মনের যাতনাকে অনেকটা হাল্‌কা মনে হয়। তবু তিনি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন—কিছু বৈলবে?

নসিরণ যেন জোর করেই স্বামীর পাটা টেনে নিলেন। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নতমুখে। তাকে খুব বিষণ্ণ দেখায়।

কাজী দেখলেন তাকিয়ে। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে বললেন—নসু।

নসিরণ উত্তর দিলেন না।

কাজী আবার ডাকলেন—নসু।

: কও।

: মন খারাপ মদনের জন্যি তো?

: না।

: তালি?

: তখন অত কৈরে কলাম; চাকরি ছাড়ার চিঠিডা পাঠায়ো না।

কাজী মুহূর্তের জন্যে থম্‌কালেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন নসিরণের কথাটা। আজকাল মাথার ভেতরে সবসময় জট পাকিয়ে থাকে। শরখড়ি-হোগলার ঘন ঝোপের মাথায় খল্‌সী আর স্বর্ণল— যেরকম জট পাকিয়ে সূর্যের আলোকেও অন্তস্থলে ঢুকতে দেয় না, ঠিক তেমনি জট তার মাথায়। একই সঙ্গে চার-পাঁচটা চিন্তা, একইসঙ্গে চারপাঁচ রকম ভাবনায় একটার সঙ্গে আর একটা মিলে মিশে জট হয়ে যায়। তিনি তাই নিজে ভাবনায় না ডুবে নসিরণকেই প্রশ্ন করলেন কারণটা জানবার জন্যে।

: হঠাৎ চাকরির কথা কও যে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নসিরণ বলেন—কি কৈরে সং— চৈলবে!

শপাং ক'রে চাবুক খেলেন যেন কাজী। প্রায় লাফিয়ে উঠে বসলেন—কি?

নসিরণের চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে যায় জলে—ঘরের ধান-চাইল-শ্যাষ।

: ও।

: কি কৈরে চৈলবে?

: হু। আপনমনে বিড় বিড় করলেন কাজী—কি কৈরে চৈলবে। ঠিক। তিনি কি এতদিন একটা ঘোরের ভেতরে ঘুরপাক খেয়েছেন!

পৃথিবীর এই নিষ্ঠুর সত্যিটাকে তিনি কি ক'রে বিস্মৃত থাকলেন এতদিন ? প্রায় সাত-আট মাস। ইস্কুলে যান না। সেই অপমানের পর নিজেই পদ-ত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে এই-এতগুলি দিন কিভাবে হাঁড়ি চড়েছে, ভাত জুটেছে, একবারও তা ভাবেননি তিনি।

নসিরণ নীরবে সবকিছু ঠিকমতো চালিয়ে গেছে। ঘুণাক্ষরেও তাকে বুঝতে দেয়নি। সে হয়তো অপেক্ষা করেছে, তিনি নিজে থেকেই একদিন বুঝবেন। কোনো একটা পথ খুঁজে নেবেন। আজ হয়তো ওর সামর্থ্যের শেষ সীমায় এসে তাকে বাধ্য হয়ে বলছে এ কথা। ভেবে খুব বিচলিত হলেন। কিছু একটা করা দরকার। মাত্র আট-দশ বিঘে আবাদী জমি। খরা-বন্যা-মাজরা পোকার আক্রমণ, নানা ঝক্কিতে ফি বছর ফসলও তো ঠিকমতো ঘরে ওঠে না।

খরার মরসুমে সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। মাঠের ফসল মাঠেই শুকিয়ে গরুর খাদ্যেরও অযোগ্য হয়ে আগাছায় পরিণত হয়। আর সার। সেতো মরীচিকায় মরুদ্যান সন্ধানেরই নামান্তর। নাগালের বাইরেই থেকে যায়। কীট-পতঙ্গের, পঙ্গপালের তীক্ষ্ণ দাঁতে ফসলের গাছ যখন পোয়াতি বয়সে ঢল ঢল শরীরে ঝলমল করে—তখন কচি কিশোরী চিবুকে লাগে কামড়। কুরে কুরে শুষে নেয় পঙ্গপালেরা যুবতী হয়ে ওঠার আগেই শরীরের সমস্ত অমৃতের স্বাদ! তার রস, তার অন্তরস্থ মাতৃত্বের সম্ভাবনা এভাবেই নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়।

কার দায়িত্ব মাজরা পোকা বা পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধিকে, তাদের জীবননাশা বিষদাঁতকে ধ্বংস ক'রে দেবে ? একফোঁটা কীটনাশক ওষুধও তো মেলে না।

জমিগুলো এখন বোঝার ওপরে শাঁকের আটি। বেচেই দিতে হবে ও-গুলো। ভাবতেই বুকের ভেতরে একটা টনটন ক'রে ওঠা ব্যথা অনুভব করলেন। কতকালের সম্পর্ক ওই জমির মাটির সঙ্গে। ধান মাটির কবিতা যেন ওগুলো। পিতা পিতামহর স্মৃতিবিজড়িত। একসময় অনেকই ছিলো। এখন ওই ক'বিঘে। ছ'মাসও চলে না। মাস্টারিটা থাকলে কোনোমতে চালিয়ে যেতে পারতেন। কি যে পরিণতি হবে। আর ভাবতে পারছিলেন না তিনি।

কিন্তু তুমি না ভাবো, তোমার পেট, তোমার ক্ষুধা তোমাকে ভাবাবেই। ক্ষুধাটাতো নিজেই এক অক্ষয় সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী।

তুমি ক্ষুধাহরণের জন্যে দুর্গা দুর্গা করো....

সে জানান দেবে, ক্ষুধা। ক্ষুধা। ক্ষুধা।

তুমি আপন ঔরসজাত শিশুকে আদরে-ভালবাসায়-স্নেহ-মমতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তাকে তুমি চুমু খাও। শিশু তোমার অভাবী আদরকে তার ক্ষুধার বিদ্রোহ দিয়ে চিৎকার ক'রে ফিরিয়ে দেবে।

তুমি তখন তোমার স্ত্রীর কাছে অযোগ্য প্রমাণিত হবে। তুমি অক্ষম প্রতিপন্ন হবে তোমার আদরের শিশুর কাছে।

মানুষ তোমাকে ধিক্কার দেবে।

ছোঃ। যে নিজের সংসারের সমস্যা মেটাতে অক্ষম, সে সমাজের সমস্যা সমাধান করার বড় ধড় বুলি কপ্‌চায়!

তোমাকে তারা এড়িয়ে যাবে। করুণা করবে।

হিরণ্যকশিপুরা বলবে—অক্ষম নাপিতের ঝুড়িভরা ক্ষুর। যে সক্ষম, অভিজ্ঞ, একটা ক্ষুরেই সে কামিয়ে দিতে পারে দশজনকে। বলবে, আমাদের দেবতাত্মা গান্ধীজী তো একাই এই বিশাল দেশটা স্বাধীন ক'রে দিলেন। বলবে, ঘরের খেয়ে কারা বনের মোষ তাড়ায় হে? যারা অকেজো। যারা মানব-সমাজের ভার, ঝবৃতিমাল, তারাই এইসব বিপ্লবী বুলি কপ্‌চায়। সে জন্যে তো বায়োডাটা লাগে না। থাকতো ন সায়েন্সে অনার্সের বাধ্যবাধকতা, ফার্স্ট-ক্লাশ্‌ না পেলে 'নো এন্ট্রি' ফলক উৎকীর্ণ থাকতো রাজনীতিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে, তাহলে এইসব হাঁড়ি-মুচি-ডোম-চণ্ডাল, কুলী-কামীন, অসভ্য চাষীদের গতিটা কি হতো হে? নেই বলে রক্ষে। থাকলে?

বাক্যবাণের চেয়েও তীক্ষ্ণতর হবে তোমার নিজের জঠোরজাত হাহাকার।

নসিরণের নতমুখ। সে মুখ মেঘে মেঘে আচ্ছাদিত। তিনি বললেন—টেনে টুনে এক সপ্তাহ চালাতি পারবোনে। তারপর; বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—এমনিতেই তো ইবার ফসলের গতিক ভাল না। সারা বছরে একদিন শুধু বৃষ্টি নামিছে। কি হবি তাতে আর। পড়তি-পড়তি-খা-খা করা মাটি তা শুইষে নিয়্যা নিছে।

বিশ্ব প্রকৃতি জুড়ে যত অন্ধকার, যত আত্মগ্লানি, ঝপ্‌ ক'রে যেন পাহাড় হয়ে নেমে এলো কাজীর মাথার ওপরে। তিনি শুয়ে থাকতে পারছিলেন না। উঠে বসলেন। বুকের বাঁ দিকে ব্যথাটা জানান দিতে শুরু করে। ঠিক ব্যথাটা যে কোথায়, কেন মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এভাবে তাকে কুরে কুরে যন্ত্রণা দেয়,

ঘুণ পোকার মতো, বুঝে উঠতে পারেন না কিছুতেই। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের হাত-ছানির সঙ্গে, অথবা অপমানকর সমস্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে এই যন্ত্রণাটার যেন নিবিড় একটা সম্পর্ক আছে। যখনই সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, ব্যথাটা বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। এটা যেন তার ক্রোধের আত্মপ্রকাশ। পশুর মতো অসহায় হয়ে খড়্গের নিচে নীরবে ঘাড় পেতে দিতে সে রাজি নয়। ব্যথাটা তো তিনি নিজেই। ওটা তারই অস্তিত্বের ক্রোধ।

তিনি জল চাইলেন।

নসিরণ জল এনে দিলে তিনি ধীরে ধীরে সবটুকু নিঃশেষ ক'রে একবার আঃ ক'রে কাতরোক্তি করলেন। নসিরণ তা দেখলেন। বাংলার নারী-কুলের বুকের গভীরে যে সুধাময়ী কোমল মনের আবাস, সেখানে ছায়া পড়ে অন্তরঙ্গ মমত্ববোধের। তিনি স্বামীকে বুকের মায়াময় নিবাসে টেনে নিয়ে শিশুর মতো আদর করেন। চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে শুভ্রজলধারা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় সুদূর যৌবনের সেই সুখের স্মৃতির প্রেক্ষায়। তারপর স্বামীর চুলে সেই কোমল মমতার স্পর্শ-ছড়িয়ে বললেন—

: ঘুমাও। আমি মাথায় হাত বুলায়া দেই।

: নসু।

: না-গো। অতো ভাবনার কি আছে। যা হওয়ার হবি।

: সারাদুনিয়া জোড়া খালি একটাই কথা নসু। অভাব। সব কিছুরই অভাব। খাদ্যের অভাব। ঘরের অভাব। শিক্ষার অভাব। ভালবাসা-মানবতার অভাব। অভাবে অভাবে পৃথিবীর মেরুদণ্ডটাই ঘুণপোকায় খাওয়া-অন্তঃসার শূইন্য। এ অভাব তো আমার একলার না। কাইল রাইতে কুঞ্জ-দাগরে কৈলজে যারা ছিঁড়্যা নিয়্যা গিছে, বউ-বিটিগরে আব্রু জখম কৈরছে, আইজ যদি তাগরে মুখের দিক তাকায়া দেইখ্‌তে···তুমি ভয়ে, ঘেন্নায় সমাজ-পতিগরে মরণ কামনা না কৈরে থাকতি পাইরতা না! কি হবি এই অসহায়, শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষগরে? অত্যাচারের তো কেবল শুরু। কেউ জানে না, কবে ইয়ার শ্যাষ। আমি নিজেও জানিনা। তবু তো কিছু স্তোকবাক্যি শুনাতি হৈলো। শুনায়া আইলাম। ইয়ার বেশি কী করতি'পারি? কি করা যায়?

: কি করার থাকতি পারে আর। মজনু আইসে কয়া গ্যালো, চাচি, কাজী চাচায় আইজ খুব গরম গরম বক্তিমে দিছে। শুইনে তো আনন্দ নাই

আমার। বুকির মন্ডি তখুনি একটা ভয়, ভয় তো সারাক্ষণই। আইজ বক্তিতে দিয়্যা সেই ভয়ডারে বাড়ায়া দিলা। উরা তুমারে ছারখার কৈরে দিবি। সামাল দিতি পাইরবানা তুমি।

: জানি। তৌ একটা আশা জাগে মনে, একদিন মানুষের সুখ হবি।

: সুখের চাবিডাই তো হারায়া গিছে।

: খুঁজতি হবি। য্যামন কৈরে হৈক খুঁজতি হবি। আমি না পারি, আমার ছেলে, ছেলে না পারুক, তার ছেলে, সে না পারুক, তার পরের বংশধররা বুকির ভিতরে এই একটা আশা বাঁচায়া রাইখে চেষ্টা কৈরে যাবি....। না হলি মানুষ কিসির আশায় বাঁচপে নয় ?

: যায় দিন ভাল, আসে দিন খারাপ।

: খারাপ হওয়ার দরকার আছে। আরো, আরো খারাপ, আরো ভয়ানক দিন, চাই। অত্যাচারে-অনাচারে, নিষ্ঠুর অভাবে-সব ঘরে ঘরে হাহাকারের রোল উঠুক। তা না হলি মানুষ জাগরিত হবি নে। মানুষ ভয়কে জয় করতি শিখবিনে। এই ভীরু-[illegible] অসহায়বোধের মানুষগরে জন্তি চাই হিরণ্যকশিপুগরে রক্তের তাণ্ডবলীলে। রক্তের যখন বান ডাকতি থাকপে, দুনিয়াজোড়া যেদিক চোক্ষু মেলা যাবি—খালি অত্যাচার আর নিষ্ঠুর হৈত্যা-যজ্ঞ, তখন জাগরিত হবি মানুষের মনের ভিতরের প্রকিত্ত ভগবান।

নসিরণের আবেগ প্রখর হয়ে ওঠে উত্তাপে। তিনি একটু আগের অভাব-বোধের ক্লান্তিকর ছায়ার বাইরে এসে দাঁড়ান। স্বামীর জন্যে আরো মমতাবোধে কোমল হয়ে ওঠেন। সেই অপরিসীম মমতার ছোঁয়ায় তিনি তার মনের মানুষের মুখটা শক্ত ক'রে আকড়ে ধরেন বুকে। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলেন—একটা কথা তুমারে কই। কিছু মনে কৈরবে না কও ?

স্ত্রীর শক্ত বাঁধনে মুখ রেখে কাজী বলেন—না।

নসিরণের অজান্তেই নিঃশ্বাসটা দীর্ঘ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—টিয়া দিদিরে তুমি খুব ভালবাসো ?

গুণ পরানো টান টান ধনুকের ছিলাটা আচমকা ছিঁড়ে যায়। নসিরণের বুকের অতলে মুখ ঢেকে নিজের ছল্‌কে পড়া আবেগ তাকে দুলিয়ে দেয়। তিনি থরথরিয়ে কাঁপতে থাকেন। কাঁপতেই থাকেন। সে কাঁপনে নসিরণের শরীরেও দোলা লাগে। দোলা লাগে।

শক্ত, দৃঢ় হাতে কাজী একসময় নসিরণকে হৃদয় ছেঁড়া ভালবাসায় জড়িয়ে

ধরেন। কোথায়-ভেসে-হারিয়ে যায় আকাশছেঁড়া অন্ধকার। খুনীর উদ্যত ছুরির তীর্যক উঁকিঝুঁকি। চারদিকের উন্মত্ত বারুদের গন্ধ।

আশ্চর্য। বারুদের গন্ধ কখনো কি গোলাপের সুবাস ছড়ায়?

ছড়ায়। বারুদও গোলাপ হয়ে সুবাস ছড়ায়। ছড়িয়ে দেয় তার আপন মনের মাধুরী মেশানো মানুষের ঘ্রাণে।

তখন কেবল কাকের তারস্বর তিমিরপুরের আঁধার ভাঙার গান গাইতে শুরু করেছে। সূর্য মাথার ওপরে দেখা দেবার আগেই তিমিরপুর গন্‌গনে উত্তাপের জ্বালামুখ খুলে দেয়। এখন কাকপ্রভাতে তেমনিই উত্তাপের হাওয়া…। দারুণ উত্তাপ।

বারুদের গন্ধ।

কাজীর দরজায় করাঘাত। বাইরে অনেক মানুষের অস্তিত্বের জানান।

অনেকদিন পরে ঘুমের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। জানতেও পারেননি কখন ভোর হয়েছে। ঘুম ভাঙতেই আরো অবাক হলেন—পাশে নসিরণকে বিভোরে দুই হাত ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে।

দরোজায় শব্দ। শব্দের উত্তেজনা। তিনি ছুটে যাবার আগে নসিরণকে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিলেন। একটা উত্তপ্ত খবর বাইরে অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

দরোজা খুলতেই কানে এলো—সাইন্যাল খতম।

: কেডা?

: দীপক সাইন্যাল গো। বললেন বৃদ্ধ কলিমুল্লাহ।

মজনু খুব উত্তেজিত। ওর বুকে হাঁপরের টান—ইবার বুঝুক-গা-বাগড ঁাসা আর বাঘ একজিনিস না।

কাজী ওকে থামতে বললেন। কলিমুল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন সমস্ত ঘটনাটা।—চাচা কন।

: হারু মণ্ডল কৈলকাতায়। সাইন্যাল ছেলো মণ্ডলের শোয়ার ঘরে। মাঝ রাইতে বাইরে আইছিলো হয়তো পিচ্ছাপ-টিচ্ছাপ্‌ করতি। কেডা যানি ঝোপের মদ্যি ওৎ পাইতা আছিলো। গুলি কৈরে দিছে। একটা চিক্কির

দিয়্যাই থতম। মণ্ডলের বাড়ী-ঘর লোকে লোকারণ্য। আর মণ্ডলের হেই বেবুশ্যে বউডা নাকি জামাইবাবুর জন্যি খুব কান্নাকাটি করত্তিছে। নিলাজ-বেহায়া জেনানা। আসলে বড়লোকগরে ইজ্জতের কুনো বালাই-ই নাই গো। কলকাতায় যেমুন হটেলে-মটেলে বড়লোকগরে কাইণ্ড-মাইণ্ড শুনতি পাই। ইয়ারা আমাগরে এই অজগাঁয়ে হেইসব আরম্ভ করিছে।'

কাজী কোনো উত্তর দিলেন না। তার মনে তখন গাজিয়ুলের আবির্ভাবের কারণ নিয়ে তোলপাড়। ওর ছোট্ট চিঠিটাই কি কাল মাঝরাতে হঠাৎ বারুদের গোলাপ হয়ে তিমিরপুরের হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে সুগন্ধি? বসন্তের খর-প্রবাহের আকাশ দিয়ে দূরের পাখিরা উড়ে চলেছে সেই সুগন্ধি তাদের ডানায় মেখে সুন্দরবনের-শাল হেতালের ছায়ায়।

একেরপর এক খবর আসতে থাকে। বেলা যত বাড়ে, খবর তত ছড়ায়। ছড়িয়ে যায়।

সমস্ত বাজারে, গাছের শরীর জুড়ে পোস্টার ছাওয়া।

গরম গরম কথা।

হিরণ্যকশিপুদের অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হওয়ার খবর লেখা তাতে।

হারু মণ্ডলের মন্দিরের দেওয়ালে খুব বড় একটা পোস্টার। তাতে লেখা আছে, হত্যার একচেটিয়া অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছি আমরাও।

একজন মানুষের রক্তের বদলায় দশজন পশুকে রক্ত দিতে হবে।

আমরাও রক্তের ঋণ রক্তে শুধতে প্রস্তুত।

কুত্তারা হুঁশিয়ার।

তিমিরপুরের ষোলোজন মানুষকে হত্যা করার শাস্তি হিসেবে একশোজন পশুকে আমরাও যূপকাষ্ঠে চড়াবো।

বন্ধুগণ! দিন বদলের পালা শুরু।

আগে নিজের ভেতরে প্রতিহিংসার চেতনাকে শাণিত করুন। প্রতিরোধ ছাড়া অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ রোখা যাবে না।

আমরা জানি, জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ থাই পাহাড়ের মতো ভারী।

এ সব খবরের সঙ্গে শেষ খবর আসে…

দীপক সান্যাল মরেনি। মারাত্মকভাবে জখম হয়ে এখন সে বসিরহাট হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

পুলিস কোথাও এখনো পর্যন্ত হানা দেয়নি। কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

থানায় বসে বড় দারোগা নাকি শুধু টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত আছে।

রামেশ্বরপুর বাজারে চাপা উত্তেজনা। দোকানপাট বন্ধ।

হরতালের ডাক দিয়েছে যুব পরিষদ।

ভোমা ছুটে এসেছে মোটর বাইক নিয়ে। সঙ্গে দলবল।

কাজী বুঝতে পারলেন, হয়তো আজ থেকেই ভোমারা পাল্টা তাণ্ডব চালাবে, না হলে বেশ কিছুদিন থমকে থাকবে জাল বিস্তার ক'রে। তবু তিনি বেরিয়ে পড়লেন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। তিন-চার ঘণ্টায় সমস্ত অঞ্চলটা চষে ফেললেন। সজাগ ক'রে দিলেন প্রত্যেককে। বলে দিলেন, রাত জাগার পালার শুরু। জোয়ান ছেলেরা কেউ ঘুমাতে পাইরবে না। কামান বন্দুক নাই আমাগরে। কিন্তু ঝাড়ে অ্যাখনো বাঁশ আছে। লাঠি বানাও। চ্যাঙা বানাও। বর্শা বানাও। এক গিরাম থিকে আরেক গিরামের মাঝে যে ফাঁক, তাও রাত্তির আঁধারে 'জোয়ান পাহারায়' ভরাট কৈরে রাখতি হবে। য্যান্ কুনোরকম হামলা হলি—চার-পাঁচটা গিরাম একসাথে চাইরদিক থিকে হামলাবাজগরে ঘিরা ফ্যালাতি পারে। কঠিন হাতে ঠ্যাঙানি দিতে পারে রক্তচোষাগরে। এ ছাড়া বাঁচার উপায় নাই। হামলা হবিই। তারই প্রস্তুতি চালাও সকলে মিলা।

শুরু হয়ে যায় পালা ক'রে পাহারার প্রস্তুতি। হাতে হাতে লাঠি। চ্যাঙা। বর্শা। দু'চোখে আগ্নেয়গিরি। সেখানে প্রতিহিংসা জ্বলে সারারাত ভোর ক'রে।

আর পনেরোদিন পরে ঘরে ফিরে আসে দীপক সান্যাল। গুলি লেগেছিলো একটাই। পাঁজরের খানিকটা মাংস সমেত গুলিটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলো পাশ দিয়ে। পেটটা নাকি অল্পের জন্যে ফুটো হয়নি।

যুব পরিষদের নেতা ভোমা ফুলের মালা পরায় সান্যালের গলায়। তারা শ্লোগান ওঠায়—দীপক সান্যাল যুযুগ জিও। যুযুগ জিও।

মজনু ওদের সেই কাণ্ড দেখে এসে হাসতে হাসতে বলে—হুযুগ তোলো, হুজুগ তোলো।

জাফর কাজী গরুর খড় কাটছিলেন উঠোনে বসে। তিনি মজনুকে ডাকলেন—কিরে ?

মজনু কাছে এসে বললো—হারু মণ্ডল খুব গম্ভীর হয়া আছে।

: ক্যা ? সান্যালের সাথে কথা কয় নাই ?

তা কইছে। তয় আগের মতো না। মুখটা কালা কৈরে বৈসা আছে। সান্যালই উল্টা-পাল্টা প্যাচাল পাইরলো। সে নাকি মণ্ডলরে বুঝাইছে, সেদিন রাত্তির বেলা-তার নিজির বাড়িতি ঘুমায়া ছিলো সে। রাত্তির বেলা পিচ্ছাপ করতি বাড়ায়া ছাখে-কারা য্যানি বড় রাস্তা দিয়্যা বন্দুক হাতে মণ্ডলের বাড়ির দিক যাতিছে। দেইখে তার সন্দ হয়। চুপি চুপি তাগরে পিছু নিতি নিতি ছাবে মণ্ডলের শোয়ার ঘরের দিক যাতি দেইখে তার ভয় হয়, উরা ডাকাতি করতি আয়ছে। যেই দৌড় দিয়্যা লোক ডাকতি যাবি-ওমনি একটা গুলি আইসে তার পাঁজরায় লাগে....।

কাজী খুব হাসলেন মজনুর বর্ণনায়। কথায়। খড় কাটতে কাটতে বললেন : আচ্ছা কিচ্ছা ফাঁদিছে সান্যাল। দুর্জনের তো ছলের অভাব নাই। ওগরে জীবনভাই ছলা-কলার। তো এসব নিয়্যা বাইরে হই-চই করিসনে কৈল্।

মাথা দুলিয়ে মজনু সম্মতি জানায়। না, কিছু করবে না সে।

নসিরণ ঘাট থেকে কাপড়-চোপড় ধুয়ে কেবল উঠোনে এসে মেলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় মস্‌জিদের ইমাম সাহেব এলেন লাঠি হাতে। তার কালো রঙের শরীর। সরু দাড়ি। চোখে সুরমা। বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ নাক। চোখে মুখে সব সময় একটা উন্নাসিক ভাব ফুটে থাকে। ইদানীং তিনি ঘড়ি পরছেন। হারু ˜ণ্ডলের উপহার ওটা। পায়ে নতুন চক্‌চকে পাম্প সু। বয়স পঁয়ষট্টি—ছেষট্টি....।

নসিরণ মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন. মজনুকে ডেকে বললেন—ক'তো ইমাম সায়েব আয়ছেন। মজনু ভ্রূকুটি করলো ইমামের মুখের দিকে তাকিয়ে। দেখে ইমাম সাহেব খুব রেগে গেলেন—গাদ্দার! বেওকুফের মতো কি দেখতিছিস!

মজনুর চোয়ালের হাড় ফুলে ওঠে রাগে - ·এই যে, গাইল ছান ক্যা?

ইমাম সাহেব চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলেন—এই নাদান, 'এই যে' কতিছিস কারে? আমি হুজুর। তোরা সব কাফের হয়া যাতিছিস। আল্লা রসুলের উপুর ঈমান নাই।

মজনু চিৎকার ক'রে ওঠে—তুমি তো হারু মণ্ডলের দালাল। পয়লা নম্বরের মুনাফেক।!

ব্যস্। আগুনে ঘি।

ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ইমাম সাহেব একবার এদিকে, আরেকবার ওদিকে

পায়চারি করতে করতে লাঠি উঁচিয়ে চেঁচাতে লাগলেন—কী। আমি মুনাফেক্? অ্যাই বেত্তমিজ। হুজুররে মুনাফেক কৈলি? তর কল্লাডা ছিঁড়্যা কুত্তা দিয়্যা খাওয়ামু আমি।

: আস্সালামওয়ালায়কুম্।

কপালে হাত ছুঁইয়ে কাজী সামনে এসে দাঁড়ালেন! ইমাম সাহেব সঘৃণায় তার দিকে তাকিয়ে একবার প্রত্যুত্তর দিলেন 'ওয়াকুম্' বলে। তারপর লাঠিটা মজনুর দিকে বর্শা নিক্ষেপের ভঙ্গিতে উঁচিয়ে তিনি বললেন—ওই আপনের চ্যালা, হারামজাদ্, আমারে মুনাফেক কয়।

: ঠিকই কইছে। কাজী ঘাড় টান ক'রে বললেন।

: তার মানে? তার মানে কী? এই যে কাজী সাহেব। আপনি কী পাইছেন! ছোটলোক হিন্দুগরে মাথাডা তো খাইছেন। তা খান। বিধর্মীর মাথা খালি আমার কিছু বলার নাই। কিন্তুক মুসলমানের মাথা খালি আমি তো আর চুপ কৈরে বৈসে থাকতি পারিনে।

কাজী গামছার খুটে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে উত্তপ্ত হয়ে বললেন— কি কতি চান আপনে?

ইমাম সাহেব ঝংকার দিয়ে ওঠেন—ন্যাকা। বুঝতি পারতিছেন না? আপনের জন্যি মুসলমানের জোয়ান ছেলেরা মস্জিদে নমাজ পড়তি আসে না। রোজা রাখে না।

: কেডা কইছে একথা?

: সবাই কয়।

: ইমাম সাহেব, আপনে যদি মনে করেন যে ইমামতি করার জন্যি আপনেই আল্লার পেয়ারা বান্দা-তো ভুল কৈরছেন। ধর্ম কারো হুকুমে কেউ পালনও করে না, বিমুখও হয় না। আর আমার বিরুদ্ধে যদি একটাও প্রমাণ দিতি পারেন তো নিজির শাস্তি নিজির হাতে নেবো। কিন্তু প্রমাণ যদি না দিতি পারেন—তালি আপনার কি হবি?

লাফ দিয়ে উঠলেন ইমাম—কি কতি চান?

: মিছা ইল্জাম দিতিছেন, আর আমি কি কতি চাই বোঝেন না?

: কাজী সাহেব! আপনে আগুন নিয়্যা খেলতিছেন।

: চিরকালই আগুন নিয়্যা খেলি আমি। বলে হাসলেন কাজী।

: সেই হাসি দেখে গর্জে উঠলেন ইমাম সাহেব। হাতের লাঠির খোচায়

উঠোনের মাটি তুলতে তুলতে বললেন, এর পরিণতি খুব খারাপ হবি। ইসলামের জানী-দুশমন আপনে। হাবিয়া দোজখ্ নাজেল হবি এই গুনাহের কারণে।

কাজী তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন ইমাম সাহেবের মুখের দিকে। তার পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে। দেখে বিদ্রূপ ফোটালেন ঠোঁটের কোণে। মাথা নেড়ে বললেন—কেডা আপনারে চাবি দিয়্যা পুতুলনাচ নাচতি পাঠাইছে? হারু মণ্ডল!

: তওবা। তওবা আসতাক্ ফেরুল্লা। মণ্ডল কি জন্যি ইসলামের দুশমনকে হুঁশিয়ার করতি পাঠাবি আমারে? আমি নিজিই আইছি। চোক্ষু বন্ধ কৈরে তো মুসলমানগরে কমুনিস্ট হয়্যা যাতি দিতি পারি না।

: ও। আপনের আসল রাগ কমুনিস্টগরে উপুর?

: মুসলমানরা আল্লার বান্দা। তারা কমুনিস্ট হতি পারে না।

: এই যে ইমাম সাহেব, দুনিয়ার কতডা জানেন আপনে?

: আপনের থিকে বেশি জানি।

: আমার থিকে যেডা বেশি জানেন—সেডা মজনুই আপনেরে কয়্যা দিছে।

: তার মানে আমি হারু মণ্ডলের দালাল?

: বুঝতি পাইরছেন দেখি। তা বোঝা যায়, যদি নিজির ভিতরে দুর্বলতা থাকে। আমার সেরকম কোনো দুর্বলতা নাই। আমি কারো হুকুমে চলি না। নিজির বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়্যা যেডা অন্যায় বুঝি, তার প্রতিবাদ করি। যেডা ন্যায় মনে করি, তার সমর্থন করি। ধর্মের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্পর্ক। সমাজাচারণের দৃষ্টিভঙ্গিডা কিন্তু আলাদা চোক্ষু দিয়্যা যাচাই করতি হয়। চোক্ষু যার আছে, সে যাচাই করে। যার নাই, সে কেবল তরপায়, আর দালালি করে। তারা কিন্তু মুসলমানের বন্ধু না। দুশমন তারাই।

চিৎকার ক'রে উঠলেন ইমাম সাহেব—আপনে কাফেরেরও অধম।

: ইমাম সাহেব! আপনে একদিন আমারে মস্‌জিদে ঈদের নমাজ পড়তি স্থান নাই। মনে আছে?

: আছে।

: সেদিন প্রতিবাদ করি নাই খালি গরীবের একটা সুখের পরবের দিন মাটি হয়্যা যাবি—সেই জন্যি। না হলি—আমিও সেদিন কালাপাহাড়ের মত গর্জন কৈরে উঠতাম। আপনের হৃৎকম্প উঠায়্যা ছাইড়তাম।

: ওহ্ ভারী বাহাদুর আপনে।

কাজী ক্রোধে ফেটে পড়েন : ভণ্ড, জোচ্চোরের দল আইজ ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নিছে। গিরামে মানুষ খাতি পায় না, পরতি পায় না, মাথা গোঁজার ঘর পায় না, আর আপনে চোক্ষুতে সুরমা লাগায়া, নতুন পাম্প সু পইরে, সেরওয়ানী আচকানে যুবক সাইজে আমারে ধর্মের বাখান শুনাতি আইছেন? চোক্ষু রাঙাতি আইছেন? এই সাহস কন্ থিকে পান, জানি না ইমাম সাহেব?

ইমাম সাহেবের চোখে হিংস্রতা। তিনি হাঁপাতে থাকেন উত্তেজনায়। হয়তো মনে মনে ঠিক ক'রে নিলেন—একবার হারু মণ্ডলের কাছে যাবেন আজই। যাবেনই। তারপর এই বেআদপ লোকটাকে টিট করবেন, যাতে আজীবন সে মনে রাখে। যেন তার পায়ের ওপরে এসে মাফি মাঙতে বাধ্য হয়। সে সময় তিনি দাড়িতে তোফা কায়দায় সুড়সুড়ি খেতে খেতে ভ্রু নাচিয়ে আকাশ দেখবেন। হাওয়ায় ফুলের গন্ধ খুঁজবেন। কে দেখে এই ইসলাম বিরোধী লোকটার মুখ। কে শোনে তার ঘ্যানঘ্যানানি। প্যানপ্যানানি। দূর হটো। কাফের! বেল্লিক! হারামজাদ্। কমবখ্‌ৎ।

তিনি সেইরকম পরিকল্পনাটা মাথায় রেখে—খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকালেন কাজীর দিকে। অবশ্য একবার মজনুকে আড়চোখে দেখে নিলেন। কমুনিস্টরা খুব সণ্ডা হয়। একলাফে বাঘের মতো থাবা মেরে ঘাড়টাও ভেঙে দিতে পারে। দেখলেন মজনু কোমরের দুইপাশে হাত রেখে, ঘাড়টা বাঁকা ক'রে ফুঁসছে। দেখে মনে মনে সঙ্কিত হলেও প্রকাশ্যে যেন সব ধমককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন—কাজী সাহেব, দুইদিন পরে তো ভিক্যে মেঙে খাতি হবি। তাই কই, সোময় আছে হাতে, জান—পিরান দিয়্যা ইস্‌লামের খিদমৎ করেন অ্যাখন থিকে।

কাজী মজনুকে বললেন, ইমাম সাহেবকে চৈলি যাতি ক। আমার তো মেহনত কৈরে খাতি পরতি হয়। উনার মতোন ভিক্যের ঝুলি তো জন্ম থিকে কাঁধে নাই আমার। দেখিস, কোনো অসম্মানি না হয় রে। মানী লোক। বলে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন কাজী।

ইমাম সাহেব চিৎকার ক'রে উঠলেন লাঠি উঁচিয়ে—কাফের। পয়লা নম্বর কাফের। তারপর আকাশের দিকে মুনাজাত করতে লাগলেন দুই করতল জোড় ক'রে। অ্যায় মাবুদ, এই কাফেররে তুমি য্যানি—হাবিয়া দোজখ্ নাজেল করো···

মজনু একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো।—এই!

ভয়ে ছিট্‌কে দু'পা পিছিয়ে গেলেন ইমাম সাহেব। তারপর চলে যেতে যেতে অভিশাপ দিতে লাগলেন—আল্লাহ্‌, এই কাফেরের ভিটায় য্যান ঘুঘু চড়ে মাবুদ। বায়গুনের চাষ হয়। পশু-পক্ষির আস্তানা হয়...।

মজনু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ইমাম সাহেবের চলে যাওয়া দেখলো। তার মনে হলো, লোকটার যদি মস্‌জিদের ইমামতী না থাইকতো তো—না খায়া মৈরে য্যাতো। কি যে করে সারা দিনমান। লোকজনের ডায়রিয়া—কলেরা হলি জলপড়া দেয়। তাবিজ-কবজ-মাদুলি এ গাঁয়ে যতজনের শরীরে আছে, তার সব এই ইমাম সাহেবের দেওয়া। কয়, আমার কাছে ফিরেশতা আসে গভীর রাত্তিরি। আলোয় ভৈরে যায় চাইরদিক। তুমাগরে জন্যি আমার যে কি দিলডা বিষায় গো, জানো না তুমরা। না, না, আমারে ট্যাকা পয়সা দিতি হবিনে। খালি হিন্দু হলি পূজা দিও। মুসলমান হলি-আল্লার ঘরে—সুয়া সের চাইল, আড়াইশো ডাইল, আর পাঁচ সিকি পয়সা দিয়্যা যায়ো শুক্কুরবার জুম্মার আগে। ফকির মিশ্‌কিনগরে শিরনী বানায়া দেবো। তাতেই বালা-মুসিবৎ দূর হয়া যাবি। বিমারী অভাব থাকপিনে গিরামে।

শোনা শুনতি মজনুরা জানে, কলকাতায় ইমাম সাহেবের একছেলের মস্তবড় ওষুধের দোকান পার্কসার্কাসে। আর এক ছেলের ইলেকট্রিক পার্টসের কারখানা। তিন মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন বড়লোকের ঘরে। স্ত্রী অনেক-কাল বিগত। তিনি একা থাকেন তিমিরপুরে। ফজরের নামাজ শেষ ক'রে এখনো রোজ মাসে মাসে পাঁচ টাকার বিনিময়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আরবী শেখান।

কত রোজগার মাসে মাসে, তাও কারো অজানা না। মজনুর মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। কাজীর সামনে কেউ কথনো মাথা তুলে কথা বলেনি, তাই অনেক কষ্টে মনের রাগটাকে চেপে যেতে হলো মজনুকে। কাজী টের পেলেন মজনুর মনের অবস্থা। হেসে হেসে -গরুর চাড়িতে খড়-বিচালি-মাখিয়ে দিয়ে মাথাটা কাত ক'রেই বললেন—মজনু, হাদিস শরীফে রসুলের খুব দামী একটা কথা আছে, 'আদ্দিনুন নসিহাতু।' কি মানে জানিস? ভালবাসা সম্প্রীতিই হৈলো ধর্মের মূল কথা। ইমাম সাহেব তো চিরকালই তার উল্টা। কি আর করা যাবি ক। বয়স্ক মানুষটাকে খুব কি কটু কথা কওয়া যায়? তবু তো আমি ম্যালা শক্ত কথা কইছি। এখন মনে হতিছে অতডা না কলিও পাইরতেম।

: বাড়ি বয়া আইসে পিরাই তো ইমাম সাহেব যা-তা কয়া যায়। কি দরকার তার? আমরা তো কেউ তার বাড়া ভাতে ছাই দিতি যাই নাই!

গরু দু'টোর গলার ফাঁস ঢিলে ক'রে দিয়ে কাজী দক্ষিণের মাঠের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—চল, বড় মাজারের জঙ্গলে যদি বন আলুটালু পাই-এট্টু খুঁইজে দেখিগে।

শুনে চমকে ওঠে মজনু—কি? কি কতিছেন?

কাজী নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিলেন ভুল বুঝতে পেরে। কিন্তু মজনু যা বোঝার ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে। ও তাকিয়ে আছে হতবাক হয়ে তার প্রিয় মানুষটির মুখের দিকে। কি জন্যি বুনো আলুর সন্ধান করে কাজী চাচায়? ও আলুর যারা খোঁজ করে, শাবল-খোন্তা নিয়্যা গহীন জঙ্গলের আনাচে-কানাচে মাটি খুঁইড়ে খুঁইড়ে ক্লান্ত হয়, কুনোদিন পায়, কুনোদিন পায় না, খোঁজ পালি আনন্দে চোখ-মুখ ঝকমক করে, না পালি প্যাটের ক্ষিদ্যায় চোখির পানিত্ বুক ভাসায়....সেই জিনিসের খোঁজে যাতি চায় ক্যা কাজী চাচা?

কাজী হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু জীবনে তিনি কখনো কারো সঙ্গে ছলনা করতে পারেন নি। সেই কায়দা কানুন রকমারী কৌশলও তার আয়ত্তের বাইরে। তাই হাসতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসের বিষাদে তিনি মজনুর পিঠে হাত রেখে বললেন—সমিতির জন্যি একখানা ঘর করতি হবি। সোময় তো কাটে না। ঘর হৈলে ছেলে-পুলেগরে নিয়্যা বৈসতে পারি। ল্যাখ্যা-পড়ার চর্চাডাও হবি, দশজনের বসার জাগাও থাকপে।

মজনু এ কথায় কোনো উৎসাহ দেখায় না। তার মুখে কালো মেঘের ছায়া কাঁপতে থাকে। শুধু আপনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে, অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে চলে যায় কাজীকে কিছু না বলে। কাজী দেখেন, দস্যিপনায় মাতিয়ে রাখা কুড়ি একুশের মজনু, দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে যে লেখা পড়া ছেড়ে দিয়েছে সেই ছেলেটা কিরকম নিস্তেজ হয়ে, মাথাটা নত ক'রে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

ভালবাসা কখনো আবেগের জোয়ারে মানুষকে পাগলের মতো নাচিয়ে-মাতিয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আবার তাই কখনো মুহ্যমান, বিষণ্ণ-বিধুরতায় ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যায়। যায়। চলে যায়। কেন যায়? কেন?

বুকটা ভারী হয়ে আসে। একটা দলা পাকানো বাতাস গলার কাছে ঠেকে থাকে এসে। যতদূর চোখ যায় তাকান।

একসময় নসিরণ এসে পাশে দাঁড়ান। টেরও পান না তিনি। মাঝে

মাঝে তার এরকম হয়। তখন এই জাগতিক বিষয়গুলির বিষম জটিলতার-জাল খুলতে খুলতে তিনি জাগতিকতার বাইরে চলে যান। নিজের কথাও তার মনে থাকে না। কি সব যে তখন ভাবেন, তার বিন্দু বিসর্গও তিনি মনে করতে পারেন না। এমন কি নিজের শারীরিক ওজনটাও, অবশেষে অস্তিত্বটাও তার ধারণার বাইরে ডানা মেলে চলে যায়। অথচ- তিনি তো নির্দিষ্ট একটা কারণকে সামনে রেখে সচেতনভাবে তাই নিয়ে আপনমনে গবেষণা করতে শুরু করেছিলেন।

মনস্তত্ত্বে এর কি ব্যাখ্যা। আদৌ এরকম কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না। এসবও তিনি জানেন না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার টুকরো-টুকরো, ছেঁড়া-ছেঁড়া-অনুপুঙ্খ ঘটনা তাকে পথ চলতে শিখিয়েছে। তার ব্যাখ্যাও তিনি সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষায় সারাজীবন ক'রে এসেছেন।

ভাববাদ, অদৃষ্টবাদ, বস্তুবাদের সঙ্গে কখনো মেলেনি। চিরকালই তাদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। তো তিনি যখন ভাবেন, আমি মানুষ, তখন মানুষের একটা ব্যাখ্যা করেন। সৃজিত জীবন-বলতে বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞাত যেসব প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে, মানুষ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ নিজেই প্রকৃতির গতির বাইরেও নিজস্বতা দিয়ে সৃজনের নির্মাণযন্ত্রদ্বারা সৃষ্টির গতি-ধারাকে সচল-সক্রিয় ক'রে রেখেছে। সেই অর্থে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব যেমন পেয়েছে তেমনি সে আয়ত্ত করেছে মানবিক শ্রেষ্ঠত্বও। মানুষ বলতে 'সৎমানুষ' বোঝায়। অমানুষ নয়। অমানুষের সংজ্ঞাটাই তো ভিন্ন। সেই ভিন্নতায় তার ব্যাখ্যা।

আর তিনি যখন মনে করেন আমি মুসলমান, তখন তিনি মানুষ থেকে আলাদা সংজ্ঞায় চলে যান কি? যদি তাই হয় তো সেই আলাদা সত্তাটা কি? তার বিশেষ কোনো প্রক্রিয়া আছে কি? মানুষ, মানে 'সংমানুষ' থেকে হিন্দু হওয়া, মুসলমান হওয়া, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান হওয়ার পরে আদিমকালের বিশেষ কোনো ধর্ম চিহ্নিত না হওয়া মানুষের সঙ্গে মূলগত তারতম্যটা কি, এই বিশশতকের অন্তবেলার মানুষের সঙ্গে?

একদিন বহু আলোকবর্ষ পূর্বে পৃথিবীর নির্মাণ নিশ্চয়ই আজকের প্রয়োজনের কথা ভেবেই। তো যার সৃষ্টি আছে, তার ধ্বংসও আছে। মানুষ সৃজিত হচ্ছে। ধ্বংসও হচ্ছে। পৃথিবীরও কি ধ্বংসটা বহু আলোকবর্ষব্যাপী বেঁচে থেকে সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলার জন্যেই? মানুষ তো মানুষে পৌছুতে পাঁচলক্ষ বছর লড়াই করেছে। এখন মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করছে।

পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলো সৌরজগতের মিলিত প্রয়াস। এই যে এসব....মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করার পরে...যে বিভক্তি নিয়ে এসেছে—তার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাটা কী? বিভক্তি, বৈষম্য, শ্রেণী-বিন্যাস...শোষণ-পীড়ন, আত্মকেন্দ্রিকতার প্রায়োগিক বিপর্যয়...

নসিরণ বললেন তার সমস্ত চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে সেই অমোঘ সত্যের সংলাপ—জয়নাল টাকা চায়। তিন মাসের টাকা পাওনা। জমিতে খাটতিছে, নিজির ঘরের পয়সায় সার কিনিছে, বীজতলা কৈরছে। ফসল উঠপি কিনা, কেডা জানে। টাকা না দিলি ও চৈলবেই বা কি কৈরে? তয় আমি কৈ কি, ...ঘরে আমার শাশুড়ির দেওয়া সোনার হার, বিক্যিরি কৈরে ছ্যাও গে।

চাবুক খেয়ে যেন ঘুরে দাঁড়ালেন কাজী—কী?

নসিরণ হাত ধরলেন স্বামীর—না-গো, কিছু মনে কৈরো না। কি হবি সোনা দিয়্যা?

কাজী ভ্রু কুচকে তাকিয়ে থাকেন।

নসিরণ খুব ঘাবড়ে যান। ভয় হয়, স্বামী তার হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে কি না। মাথার ওপর দিয়ে একটা চিল চিঁহিহি-ই ক'রে উড়ে গেলো।

দক্ষিণের মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চাষীরা কাজ করছে।

খরা।

খরার কীর্তন প্রকৃতি জুড়ে।

সেই সময় কাজী একবার আকাশ দেখলেন। রাত নামার এখনো অনেক দেরী। তিনি ঘর থেকে দা-আর কুড়োল বের করলেন। ভয়ে ভয়ে নসিরণ দেখলেন, কাজী বাঁশছোপের দিকে চলে গেলেন। দূরে বসে জয়নালও ভয়ে ভয়ে নসিরণের মুখের দিকে তাকালো....। কিন্তু কেউ আর এগুতে সাহস পেলো না।

একটু পরেই তারা শুনতে পেলো বাঁশছোপে ঠক্ ঠক্ ঠকাস্ দায়ের আওয়াজ বিরামহীনভাবে একটার পর একটা বাঁশকে শুইয়ে দিচ্ছে।

দু'দিন আগেই নসিরণ গুণে দেখেছিলেন, বড় আকারের মাত্র গোটা কুড়ি বাঁশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। পেকে পেকে হল্‌দেটে রং ধরেছে। আর দশ বারোটা কচি চারা। এখনো মাথা তুলে হলুদ হতে ঢের দেরী আছে! ওই ক'টা বাঁশের টাকায় কি হবে! শ'দেড়েক টাকা খুব যদি দাম পাওয়া যায়।

উনি তো খুব দাম পাওয়ার মানুষ নন। যা ন্যায্য বুঝবেন, তাই নেবেন। একটা পয়সাও বাড়তি নিতে চাইবেন না।

জয়নাল কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে বললো—চাচি আম্মা, আমি একবার জমিনে যাতিছি। সন্ধের পর আসপোনে।

নসিরণ মাথা নেড়ে সায় দিলেন—আচ্ছা। জয়নালের ত্রস্তপায়ে চলে যাওয়া দেখে নসিরণের ঠোঁটে হাসি ফোটে। তিনি বুঝতে পারলেন, ও আসলে পালিয়ে গেলো। তারপর এগিয়ে গেলেন বাঁশছোঁপের দিকে। তখনো শব্দ উঠছে ঠক্ ঠক্ ঠকাস্।

ঝাঁঝালো রোদ্দুর। গরম হাওয়ার ছাট্ গায়ে লাগলে ফোস্কা পড়ার মতো চামড়ায় স্যাঁকা লাগে। সেই সঙ্গে ধুলোর ধুন্ধুমার। জোর হাওয়া দিলে কিছু চোখে দেখা যায় না। নিজেকেও না।

খরার আতঙ্কে গরীবের হাড়ে কাঁপন। চাষীরা গালে হাত দিয়ে ভাবে। বোশেখ মাসের সীমানা পার। বৃষ্টির সাক্ষাৎ নেই। সে যে কোন্ তেপান্তরের মেঘ হয়ে পালিয়েছে। কেউ তার মতিগতি বোঝে না, তবুও মাঠে মাঠে কৃষ্ণচূড়ার বাহার। ধূসর ধুলোয় গহীন রাতে আগুনের রং হয়ে জ্বলে। জ্বলে যায় মাঠ-মাঠের পথ। দূর গাঁয়ের মাস্তলের মতো ন্যাড়া তাল গাছের চুড়োয় চিলপুরুষের বাসা। সেখান থেকে চিৎকার ভেসে আসে। তারপর ছায়ার খোঁজে উড়াল দেয় দূর গাঁয়ে।

মধ্যাহ্নের এই সময়টা যেন দাবদাহ। মানুষ পথে নামে না। নামতে সাহস পায় না। চাষীরা মাঠের দিকে তাকিয়ে চোখের জল মোছে। সে জলে মাটি ভেজে না। ছাই হয়ে গেলো রবিশস্য। আউস-আমনের খন্দও হয়ত খরায় মাঠে মারা যাবে। রোয়া হবে না। বীজতলা হবে না। মাটি এখন চৌচির হয়ে কাঁকড়া বিছে। এমন ক'রে ফেটে-হাঁ হয়ে আছে। দেখে আতঙ্কিত ইঁদুরেরা গৃহস্থের ঘরে এসে ঢোকে। খাদ্যের সন্ধানে মাঠ ছাড়া ধাড়ি ইঁদুরের দল চাষীর শূন্য হাঁড়িতে বৃথাই সারারাত দাঁত কাটে। কুট্ কুট্ ক'রে শব্দ করে সারারাত।

এমন সময়ে খবর আসে দিল্লি থেকে পরিত্রাত্রী এসেছেন। দমদম বিমান বন্দর থেকে পৌনে শতবর্ষের অলোকোজ্জ্বল সভায় মহীয়সীকে অশ্বশকটে নিয়ে যাওয়া হবে রোশনাই করা সভাস্থলে। মানুষ শোনে। কান পেতে শোনে তিমির-পুরের অনাহারপেট চাষীরা। খুব তর্ক কলকাতায় নেতাদের নিজেদের মধ্যে। তর্কের বিষয় দুর্ভিক্ষ বিতাডন নয়। খরায় জলের বৈজ্ঞানিক সংকট মোচনের উপায় উদ্ভাবন নয়।

ইন্দিরা গান্ধীকে বিমান বন্দর থেকে কেমন ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন তো কলকাতায় পঁয়ত্রিশটা কংগ্রেস। একটা ঘরোয়া পনেরজন শ্রমিকের কার-খানার ইউনিয়নের লিডারও নিজের নামে গ্রুপ কংগ্রেস করেছে। তার এলাকায় তারই নামে শ্লোগান। জনহিতকর নয়। নিজের দীর্ঘজীবন কামনার শ্লোগান। শ্রমিক আন্দোলনের মহান নেতা—যুগস্রষ্টা পেটো মুখুজ্জে যুযুগ জিও, যুযুগ জিও।

এই সব গ্রুপ কংগ্রেস প্রধানরা বিমান বন্দরে তুলকালাম কাণ্ড করেছে। পরামর্শ, দাবি, এইসব শতাধিক পালটাপাল্টি। একজন বলছে, মাকে চৌদোলায় বসানো হোক। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সময় যেরকম রাজছত্র ধারণ করে-ছিলেন, সেই রকম কারুকার্যশোভিত ছত্র রাখা হোক। তাতে কলকাতার মানুষ বিগলিত হবে। নতুন চমক্! কলকাতার বিগলিত ঢেউটা মফস্বলেও ছড়িয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। ভোটে একচেটিয়া হাওয়া আমাদের অনুকূলে থাকবে। অন্যগ্রুপ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে। না। হবে না। মাকে সাইকেলে চড়ানো হবে। সামনে পেছনে পঁচিশ হাজার সাইকেল মার্চ করবে। এটা আরো অভিনব। আর সেই সাইকেলের দুই সারির মাঝখানে রাখা হোক গরুর গাড়ি। সারি সারি গরুর গাড়ির ওপরে নাচতে থাকবে কলসি কাঁখে, হলুদ শাড়ি, লাল পাড়, লাল জামা, বাসন্তি টিপ পরা কুমারীরা! তার সামনে বিশাল একটা হনুমানের সিম্বল।

কেল্লা আমাদের দখলে।

তখন প্রশ্ন ওঠে। হচ্ছে না। গতির সঙ্গে গরমিল হচ্ছে।

কি রকম?

সাইকেল আর গরুর গাড়ি…।

প্রস্তাবটা আধুনিক অভিনব, কিন্তু রাজসিক হওয়া দরকার।

কিরকম?

মহাভারতের রথ।

কিরকম ?

চার চাকার রথ। দুই জোড়া তেজি ঘোড়া। ওই রাজাবাজারের নসু-মিঞার কংকালসার ঘোড়া না। আমাদের মাউণ্ট পুলিসের চারখানা ঘোড়া আনতে হবে। মা থাকবেন রথে। আশীর্বাদের দণ্ড হাতে। সঙ্গে সেনাপতিরা। সামনে লেটেস্ট মডেলের মোটর বাইক। অন্ততঃ দু'হাজার।

বাঃ চমৎকার।

পৌরাণিক আর আধুনিকের হরিহর মিলন হে।

কিন্তু অসুবিধে এখানেও।

কিরকম ?

লেটেস্ট মডেলের দু'হাজার মোটর বাইক কোথায় মিলবে ?

ধুস্।

সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। দরকার হলে—আরো এককোটি লাগবে। অল ইণ্ডিয়া বেসিসে সমস্ত ডিলারদের কাছে রিকুইজিশন নোটিশ পাঠিয়ে দাও। ওরা বাপ বাপ ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাবে। পরে পিছে—আমরা ইন্দিরা স্মারক হিসেবে ওগুলো নাইন্টি পার্সেণ্ট রিবেটে নিজেরাই নিয়ে নেব।

গ্র্যাণ্ড আইডিয়া।

ফ্যানটাসটিক।

আনপ্যারালাল।

এই নিয়ে গ্রুপ লিডাররা তখন যে যার দীর্ঘজীবন কামনার শ্লোগানে কর্মীদের কৃতার্থ হতে দেখে-বিল পাস ক'রে দিলেন ধেনো, হেরোইন, গাঁজা, আর চরোসের.... ।

তিমিরপুর থেকে অনাদি খাসকেলকে লিডার ক'রে ভোমারা চলে গেলো সেই অভূতপূর্ব মহাসম্মেলনে যোগদিতে। মণ্ডল চুপ ক'রে খাসকেলের পকেটে দু'শো টাকা গুঁজে দিলো।

হারু মণ্ডলের মাথায় ছাতা। গা থেকে সেণ্টের ফোয়ারা ঝরছে খরাতপ্ত হাওয়ায়। মুর্শিদাবাদী মুগা সিল্কের পাঞ্জাবি। বিদ্যেসাগরী নাগরাই।

কেউ দেখলেই বলবে, কোথায়, ? আরেকটা বিয়ের বর নাকি ?

অনাদির বাড়িখানাও বেশ পাড়া ছুট্। ফাঁকায়। কিন্তু চারদিকে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল। হারামজাদা বাঙালরা দেশ ছেড়েছে, কিন্তু বিচিকলাটা,

ছাড়তে পারেনি। বাড়ির সামনে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা টাউস ভীম এঁটো কলার গাছ। জঙ্গলে জঙ্গলাকার। আর আছে নারকোল, সুপারি, আম কাঁঠালের গাছ। এসব অনাদির মায়ের হাতের। সারাদিন বুড়ি এই সব নিয়ে থাকেন। বাড়িতে একটাই ব্যাটার বউ। মহারানী সাবিত্রী। বউ'র সাথে তো বুড়ির আদায়-কাঁচকলায়। বনিবনা নেই। পেট ভরে খেতেও দেয় না। সারা সময় মুখ ঝামটা। খারাপ খারাপ কথাগুলি অনায়াসে বলে দেয় তার বউ।

সৈকত একদিন সাবিত্রীকে ধরেছিলো। হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিলো। তাতে কিছুদিন খিস্তি-খেউড়টা কম চালিয়েছিলো বউ।

এখন সৈকতও নেই।

বউ'র তো এখন লাগামছাড়া দিন কাটে। আর অনাদিটাও হয়েছে! নিত্যিদিন বউ-এর চন্নামৃত খায়। বউ বলে—কান ধরো। অমনি নিজের কান ধরে বসে থাকে অনাদি। বউ যদি বলে—এক ঠ্যাং উঁচু করো। অমনি উঁচু। মাথাটা ঢোকাও ঠ্যাঙের নিচে। ঢুকে গেলো তিরিং-তিরিং করতে করতে।

বুড়ি মাঝে মাঝে বলতে চাইতেন, এ সব ঠিক না। সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর রণহুঙ্কার—ওলো ভাতারখাগী বুড়ি মাগী, তোর ভ্যাতা পোলারে দেখেক গিয়ে, মুসলমানগরে সান্‌কিতে মড়া গরুর মাংস খাতিছে।

বুড়ি বিস্ময়ে বিমূঢ়। কি কথার, কি উত্তর। ধান বানতি শিবের গীত। তিনি অনুনয় ক'রে বলেন—অ বউমা, কি কও গো, এ বড় পাপের কথা। গরু যে দেব্‌তা।

সাবিত্রীর একসঙ্গে দুই পাখি শিকারের আনন্দ। তার ছেলে-পুলে নেই। ঘরে কথা বলার মানুষ নেই, সময় কাটে না তার। বুড়িকে নিয়ে তার সময় কাটে—তাকে জ্বালিয়ে, খোঁচা মেরে, ঝগড়া ক'রে, কাঁদিয়ে কাটিয়ে। একদিকে মনের জ্বালা মেটে, আর মজাও অনুভব করে। সে ঠোঁট উল্‌টে ভুরু নাচিয়ে খল্‌খল্‌ ক'রে হেসে বলে— ছেলে তুমার দেব্‌তা খায়ে ছাপ করতিছে।

বুড়ি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—কোয়ো না গো। বড়ই পাপের কথা। ও সব মুখি আনাও পাপ।

: ছেলে তোর পুণ্য করতিছে।

: দোহাই তুমার বউমা, ক্ষ্যান্ত ছ্যাও।

: ছেলে তোর ম্যাকেগরে ঘরেই বিয়্যা করবি দেখিস।

: অ বউমা। তুমার দেখি মুখির কুনো ভান্তি নাই গো। যা খুশি মুখি

আসে কও। আমি না তুমার গুরুজন? তারে তুমি য্যাখন-ত্যাখন-তুই-তুকারি করো। এসব লোকে শুনলি কী কবে?

শুনে সাবিত্রীর নাচতে ইচ্ছে করে। সে দুই হাতে ঢেউ খেলিয়ে, জিভ ভেঙচে, নাক কুঁচকে বলে—ওলো—বুড়ি শোলকওলি, লোকের আমি খাই-না পরি? ঝাঁটা মারি তোর লোকের মুখে।

: মারো। আমি গুরুজন হই, আমার মুখেও মারো।

খল্‌খলিয়ে বুকে তরঙ্গ তুলে হেসে সাবিত্রী বলে—তুই আমার গরুজন লো।

বুড়ি কপাল চাপড়ে, ধানের কুলোয় জোরে জোরে টোকার শব্দ তুলে ঝাঁঝিয়ে ওঠে—গরু কও, মৈষ কও, কি কবো আমি। বড়জোনতো দাসের দাস। ছোটোডা মানুষ হলি আমার কপালে ক্যা এই দুঃখ হবি!

বলতে বলতে কুলোয় ধান ঝাড়তে ঝাড়তে বুড়ি কাঁদে। তারপর বস্তায় ধান তুলে-ঢেঁকি ঘরে বোঝা ক'রে রেখে দিয়ে, আমগাছের নিচে—জলে যাওয়া ঘাসে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে কাঁদে। আর ভাগ্যের দোষ দেয়।

এই সময় ছাতা মাথায়, মুখ আড়াল ক'রে হারু মণ্ডল বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায়। বুড়ি ভেবেছিলো অনাদি। হারু মণ্ডলকে দেখে তার বুকের ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আঁচলে মুখ ঢেকে ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকে সে। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পায়, হারু মণ্ডল তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে থেকেই সে বিড় বিড় ক'রে খিস্তি দিলো—শুয়ারের বাচ্চা।

বুড়ির তখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। কেঁদে বুকের ভার হালকা করতে চাইলো। এযে কেষ্টলীলের গুরু তার বাড়িতে। হাঁ ভগমান, বাঁইচা থাইকা এও তারে দেখতি হৈল? কনে গেলো অনাদিডা মরতি রে ভগমান।

একটু পরেই মণ্ডল বড়ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ায়। তার গলা শোনা যায়—অনাদি ঘরে আছো?

প্রত্যুত্তরে কি হাসি, কি হাসি। মধুর বৃন্দাবনে যেন মোহনবাঁশী বাজে।

সাবিত্রী ঘুম চোখে দরোজায় এসে দাঁড়ায়। চোখের তারা নাচিয়ে বলে—আপনে তারে কৈলকাতায় পাঠায়ে আমার কাছে খোঁজ নিতি আইছেন?

বলেই দাঁতের ফাঁকে আঁচল কামড়ে ড্যাবডেবে চোখে পরিপূর্ণ ক'রে মণ্ডলের মুখের দিকে তাকায় সাবিত্রী। সে চোখে গহীন জলের নিটোল আলস্যের ছায়া।

মণ্ডল একবার থতমত খায়। তারপর হেসে ফেলে—যাই তালি।

সে যাওয়ার জন্তে ঘুরে দাঁড়ায়।

পেছন থেকে টিপ্‌পুনি কাটে সাবিত্রী—আ মরণ আমার।

হারু মণ্ডলের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে আসে—কেডা মরে বউমা?

সাবিত্রী খল্‌খল্‌ ক'রে হাসে—এক মরণে ছুইজন মরে, সেই মরণের কথা কইগো বাবু। তা কেডা আপনের বউমা!

ঠকে গিয়ে এবার প্রসঙ্গান্তরে যায় মণ্ডল—ঘুমাও নাই! কি করতিছো?

: বৈসে বৈসে সোময় গুনি। বুড়ি মাগীডা জ্বালায়া মারে।

: তাডায়া দিতি পারো না?

: মুশকিল তো সিখানেই। ছাওয়াল যে লিডার। রাত-বিরাতে গুলি কৈরে দিবি আমারে।

মণ্ডল সে কথার জবাব দেয় না। তার শরীর দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছিলো। আকণ্ঠ তেষ্টা। একটু ছায়ায় গিয়ে বসা দরকার।

সাবিত্রী ঠোঁট টিপে, মুচকি হেসে বলে—রাজা মানুষের ঘরে ঢুকতি ঘিন্না বুঝি?

: না। না। আমি তো নিজির মানুষ তুমাগরে। বলে স্থট্‌ ক'রে ছাতাটা বন্ধ ক'রে ভেতরে চলে আসে মণ্ডল—শত্তুরের তো অভাব নাই। দেখলেই যা তা রটায়ে দেবেনে।

তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বিছানার চাদর পরিপাটি করতে করতে ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রুকুটি করে সাবিত্রী—ও মশাই, রাজামশাই, একটা সত্যি কথা কবো?

হারু মণ্ডলের বুকে ধক্‌ ধক্‌ আওয়াজ। সে তার শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নেয়—কি?

সাবিত্রী স্পষ্ট ক'রে তাকায়—অনাদিরে কৈলকাতায় পাঠায়া, এই আগুনপোড়া ছুপুরে কি জন্তি তার খোঁজে আয়ছেন?

হারু মণ্ডলের সর্বশরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বহে যায়। ধরা পড়া চোরের মতো আম্‌তা আম্‌তা করতে থাকে। ঢোক গেলে। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

শেষে সাবিত্রীই তাকে উদ্ধার করে—রাজামানুষের আবার ভয় কী গো?

হাঁপ ছেড়ে বাঁচে হারু মণ্ডল। ছাতাটা ঘরের এক কোণায় রেখে দিয়ে সে বলে—তুমি বাঁচালে।

সাবিত্রী থম্‌কে বলে—রাজারে আমি বাঁচাতি পারি ?

ধপ্‌ ক'রে বিছানায় বসে পড়ে হারু মণ্ডল জবাব দেয় পরম নিশ্চিন্তে—পারো। তুমিই বাঁচাতি পারো এই হতভাগা রাজারে।

: রাজাও হতভাগা হয় ?

: হয়। হয়গো। রাজার বাইরির এই চেকনাই দেইখে মনে হয়, রাজার কোনো দুঃখু নাই। শোক-তাপ নাই।

: তাই তো মনে হয়।

: ভুল গো। খুব ভুল। বলে শুকনো ঠোঁটে জিভ ছোঁয়ায় মণ্ডল—আমারে একটু জল খাওয়াও গো। আইঢাই করে বুকটা।

: খালি জলে তেষ্টা মেটে ?

হারু মণ্ডল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে থাকে সাবিত্রীর দিকে। সাবিত্রী জল দিলে ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে নিঃশেষ ক'রে, দামী রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। তারপর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে হাসতে হাসতে বলে—মেটে না। বুকটা খা খা ক'রে জলে। ছট্‌ফটাই।

: ঠাণ্ডা করার মানুষ নাই ?

: নাই। নাই।

: বিউটি রানী তো সিনিমার নায়িকা গো ! অত রূপ ! মানুষ কয় অপরূপা।

: আমার কাছে তা অপদেব্‌তা গো। ও জিনিস আমার না।

সাবিত্রী ঠোঁট উলটে, ঘরের থামে ঠেস্‌ দিয়ে মাথা নাড়ে—মিছে কথা।

হারু মণ্ডল অস্থির হয়ে ওঠে। আর বসে থাকতে না পেরে উঠে আসে সাবিত্রীর কাছে। সাবিত্রী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি হাসি মুখ। চোখ ফেরায় না। তার পাথরে খোদাই বুকে ঝড়ের নিঃশ্বাস। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ঠোঁট।

হারু মণ্ডল ঘামতে থাকে। ঘামতে ঘামতে তার মনে হয় ঝাঁপ দেবে সে মরণ যমুনায়। ভাবতে ভাবতে খপ্‌ ক'রে সে সাবিত্রীর হাত ধরে।

সাবিত্রী সেই তেমনি দাঁতে ঠোঁট কেটে দাঁড়িয়ে থাকে। মণ্ডল তাকে কাছে টানে। সাবিত্রী জোর খাটায় না। কাছে আসে। মণ্ডলের মাথায় ঝাঁ ঝাঁ আগুন। টেনে বিছানায় নিয়ে আসে সাবিত্রীকে—বিউটি রানী আমার হলি—তুমার কাছে আসি ক্যা ?

সাবিত্রী আলস্য ভাঙতে ভাঙতে ফিক্‌ ক'রে হাসে। বিছানায় একটা

গড়ান খেয়ে কোণের দিকে সরে গিয়ে উপুড় হয়ে শোয় করতলে চিবুক রেখে। দু'চোখে অতল রহস্যের আহ্বান। সেই রহস্যময় চোখের পাতায় ছন্দ ছড়িয়ে বলে—বিউটি রানী কার গো রাজা মশাই ?

হারু মণ্ডল ঘাবড়ে যায়। সে নিজের ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে যায়। মুখ ফস্কে ঘরের গোপন কথা বলে ফেলেছে। সাবিত্রী এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। সে প্রসঙ্গ ফেরাতে চায় নিঃশব্দ থেকে।

এই সময় চোখে পড়ে সাবিত্রীর বুকের সখাত ভাঁজ। বুকের আঁচল বিছানায় উদাস হয়ে লুটিয়ে পড়া। মাংসল বুকের সমস্ত পরিমণ্ডলে ধব্‌ধবে একটা জ্যোতি নিঃশ্বাসের টানে উথাল-পাথাল জ্বলছে।

প্রকৃতির আগুন—তার মাথা ঝাঁ-ঝাঁ। নিঃশ্বাস দাপায়।

সাবিত্রী ঠোঁট ফুলিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলে—ও মশাই, কি দেখতিছেন ?

হারু মণ্ডল তখন সাহসী হয়ে উঠেছে। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে জবাব দেয়—দেখি অনাদির সুখ।

: কিসের সুখগো রাজামশাই ?

: তুমারে পাওয়ার সুখ।

হঠাৎ মাথা দুলিয়ে কাৎ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাবিত্রী—সে তো তার সুখগো। আমি কি পালেম ?

হারু মণ্ডল বলে—ঘর পাইছো। সংসার পাইছো।

: না গো না। ইয়ারে পাওয়া কয় না। ওই তো ভারি ইস্কুলের চাকরি ; তাও তো আপনেরই দয়ায়। ওই দিয়্যা সংসার চালায়া মনের সাধ মেটে না।

সাবিত্রীকে এখন খুব বিষণ্ণ দেখায়। আড়মোড়া ভেঙে হাই তোলে সে। তারপর মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বলে—ঘুম পাতিছে আমার।

হারু মণ্ডলের মনের ভেতরে তখন আকুলি বিকুলি। অস্থির উন্মাদনা। সাবিত্রীর কাছে উঠে যাওয়ার জন্যে বিছানায় পা তুলতেই সে তীর্যক চোখে তাকায়। দেখে হারু মণ্ডলের উৎসাহ দমে যায়। পা নামিয়ে নেয় সে।

সাবিত্রী কথা বলে না। মুখটা কনুইতে গুঁজে দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। মণ্ডলের লোভাতুর হাত নিশপিশ করে। হাতটা বাড়িয়ে একসময় সাবিত্রীর মাথার চুল ছোঁয়।

মুখ তুলতেই সাবিত্রীর সেই তীর্যক দৃষ্টি।—কি ?

: ঘুম পায় ?

: হু।

: আমি ভালি যাই।

: বিউটি রানীর কথা মনে পৈড়ছে ?

: না। তুমারে বিরক্ত কৈরলেম।

: ক্যা ?

: ঘুম পারত্তি দিলেম না।

: আমার জন্তি অ্যাতো দরদ ?

সেকথার কোনো উত্তর না দিয়ে চতুর হারু মণ্ডল তার সারা মুখে কষ্টের ছায়া ফেলে বলে—তুমারে দেইখে মনে করছিলাম, কত সুখ তুমার। এ জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ তুমার পূর্ণ হৈছে।

মাথা নাড়ে মণ্ডল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সাবিত্রী বলে—রাজা মশাই, গরীবের ভাত জোটে না। সাধ মেটে কিসে ? দিত্তি পাইরছে এই তিন বছরে একখানা গয়না ? কত সখ তারাহারের। ঝুম্‌কা পাশার। কয়, হবি, হবি। হবি কবে ? মৈরে গেলি ?

দরদে তখন ভরাট গলা হারু মণ্ডলের—সাবিত্রী।

সাবিত্রী যেন মণ্ডলের ডাক শুনতে পায় না। সে তার দুঃখের পাঁচালি গেয়ে যেতে থাকে—একখানা ঢাকাই জামদানী চেয়িছি সেই কবে। কৈত্তি কৈত্তি একখানা গামছাদানী আইনা দিয়্যা কয় -আধুনিক ডিজেনের কাপুড় গো। চলমল বাহার। সব মিছ্যা কথা। গামছা আবার শাড়ি নাকি ? তিরিশ টাকা দাম। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাই গো আমি।

হারু মণ্ডল যেন সাবিত্রীর মন পেতে উপমা দেয়—বিউটি রানীরে তো কিছু না চাত্তিই দিছি। কিন্তুক তার মনের নাগাল তো মিললো না।

সাবিত্রী বিরক্ত হয়ে দুম্‌ ক'রে বলে দেয়—কি কৈরে পাবেন গো। আপনের ঘরে সান্যালবাবুরে কেষ্ট সাজায়ে রাখিছেন যে।

শুনে চমকে ওঠে হারু মণ্ডল। খুব আহত হয় তার পৌরুষ। মাথায় যেন খুনের নেশা চেপে যায়। লাফ দিয়ে উঠে যায় সাবিত্রীর কাছে। তপ্ত গ্রীষ্মের মাঠ-চৌচির গরমকে তার ঠোঁট নিয়ে পাগলের মতো সাবিত্রীর পরিপুষ্ট কাঁধে, ঠোঁটে চুমু খায়। টেনে-হেঁচড়ে বুকের মধ্যে এনে খুব জোরে চেপে ধরে বলে—সান্যালের কথা তুমি জানো ?

সাবিত্রী তখন মণ্ডলের বুকের ভেতরে কুই কুই ক'রে বলে, জানি।

মণ্ডল বলে—আমি তুমারে তারাহার দেবো। ঝুম্‌কা পাশা দেবো। জামদানী দেবো ঢাকাই। আর টিয়া রঙের লাল পেড়ে বেনারসী দেবো। খুব মানাবি তুমারে।

সাবিত্রীকে ফের চুমু খায় মণ্ডল। শুইয়ে দিয়ে শাড়িতে হাত দিতে যায়। কিন্তু এতক্ষণে জোর খাটায় সাবিত্রী। বিদ্যুৎবেগে উঠে যায় বিছানা থেকে। তারপর সোজা গিয়ে চৌকাঠে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতে বলে—খাসকেলও এইসব কয়া মন ভিজায় আমার। কাজ ফুরোলি ক্যাঁচকলা। সুদা মুখের কাম নাইগো। যখন তুমি তারাহার আইনবে, ঝুম্‌কা পাশা আইনবে, ঢাকাই জামদানী, আমি সেদিন নিজিই তুমারে উপহার দেবো।

হতাশ হারু মণ্ডল চাবুক খায়। চাবুক খেয়েও অনুনয় করে—শ্যামা মার দি'ব্যি। দেবো আমি যা তুমি চাও। ফিরায়া দিওনা। দোহাই তুমার।

সাবিত্রী কঠিন মুখে মাথা নাড়ে—বাকিতে ফাঁকি। নগদে লাভ। আর নগদ না হলি ভালবাসা আসে না আমার। তুমি তো টিয়ারানীরে ভালবাসতি যায়া তার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ-পাঠ কৈরে নিছো। সেতো ভিকিরি এখন।

মণ্ডল কিন্তু রেগে যায় না। মার খেয়ে নীরবে হজম ক'রে যায়। সাবিত্রীকে তার চাই। সে যেভাবেই হোক। চাই। নাহলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে না কিছুতেই। ভেবে সে কৌশল পাল্টায় অনুপুঙ্খ। যেন দয়ার অবতার সে। বিগলিত হৃদয় তার। সে দেখাতে চায় সাবিত্রী নামের চতুরা যুবতী নারীকে তার ঐশ্বর্যের চোখ ধাঁধানো ঝিলিক। তাই বিছানা থেকে নেমে এসে হাত ধরে আবার সাবিত্রীর।—শ্যামা মার কিড়ে কাটতিছি। বিশ্যাস করো। এই তুমার পাও ধরছি। বলে সত্যি সত্যিই সাবিত্রীর পায়ের কাছে বসে পড়ে মণ্ডল।

সাবিত্রী দু'পা পিছিয়ে সবেগে মাথা নাড়ে—উহু। আমার এককথা। তোমার বিউটি রানীর থিকে শরীলডা কি আমার কম? চেকনাইডাকি খস্‌খেসে? যাও আইজ।

: সাবিত্রী। পাও ধৈরলাম।

: পাও ধৈরতি তো কৈ নাই তুমারে। ভয়া হাতে আইসো। তুমার পাও আমিই ধরবো নে।

ফোঁস্ ক'রে অপমানের ঝাঝালো শ্বাস ফেলে মণ্ডল। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এই কথা?

: নগদ ছাড়া দুনিয়ায় যারা মুখের কথায় ভুইলা যায়, তারা ঠকে।

: আমিও সেই দলের ?

: রাগ কৈরবে না রাজামশাই। তুমি তো তাগরে দলপতি।

হারু মণ্ডল গর্জে উঠতে চাইলো। থাবা মেরে সাবিত্রীর বুক থেকে স্বপ্নের হাতছানি দেওয়া যুগল মাংসপিণ্ড খামচে-খুবলে কুকুরের মুখে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করলো। আর দুই পায়ে ওকে পিষ্ট করতে করতে···। কিন্তু না। নিজেকে সংযত করলো। মনকে বোঝালো, ধৈর্য ধরতে। একদিন সে এই অপমানের শোধ নেবে পাই পাই হিসেবে। তখন...

সাবিত্রী ভুরু নাচিয়ে হাসে—মন খারাপ কৈরে কি আর হবি। পরে উসুল কৈরে দেবো। বলে ফের হাই তুললো। আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর দরোজা বন্ধ করার ভঙ্গিতে একদিকের পাল্লা ধরে নাক কুঁচ্‌কে আদর জানালো —আমি তো আর ফুরায়ে যাচ্‌ছিনে।

হারু মণ্ডলের নাসিকায় স্ফীতি। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়ে চোয়ালের হাড় জেগে ওঠে। তারপর ছাতাটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

পেছন থেকে খল্‌খলিয়ে হাসে সাবিত্রী। একটু গলা চড়িয়ে শুনিয়ে দেয়—রাজা মশাই গো, আমি কিন্তু তুমার পথ চায়্যা থাকপো.. ।

হারু মণ্ডলের তখন ক্রোধে কাঁদতে ইচ্ছে করে। অপমান হজম করতে তার বুক ফেটে যায়। তুখোড় গ্রীষ্মের কঠিন দাবদাহ নিয়ে সে বাড়ি থেকে হন হন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, অল্পের জন্যে বুড়িটার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগলো না। পাশ ঘেঁষে বেরুনোরও কোনো পথ ছিলো না। তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

বুড়ির কপালে ভাঁজ। ঘোলাটে চোখের মণিতে সন্দেহ। চমকে ওঠে মণ্ডল। বুড়িটা এক নম্বরের হারামজাদি। ঠোঁটের কোণে বজ্জাতি হাসি। স্পষ্ট ইঙ্গিত। মণ্ডলের সমস্ত রাগ বুড়ির ওপরে গিয়ে পড়লো। সে ছাতাটা ফট্‌ ক'রে খুলে কনুই দিয়ে গুতো দিলো বুড়িকে—পথ আটকাও কি জন্যি ? আমি তোর নাঙ হই ?

বুড়ি অমনি কনুই ধরে তারস্বরে কান্না—ওরে বাবা, ওরে বাবা, কেষ্টলীলে চলতিছেরে বাবারা। আর আমারে ধৈরে মারতিছে গো....। আমি কনে যাবো গো...

হারু মণ্ডল কি বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই তীরবেগে ছুটে এলো সাবিত্রী। তারপর বুড়ির চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেলো

—ওই মাগী, কিভা কেষ্টলীগে করতিছে? কেষ্টলীলের আইজ গুষ্টির তুষ্টি কৈরে ছাড়বো চল্।

হারু মণ্ডলের মেজাজ তিরিক্ষি। তার তখন বমি আসতে থাকে। ভাগ্য ভাল যে, আশে-পাশে লোকজন নেই। তাড়াতাড়ি ছাতায় মুখ আড়াল ক'রে সে অদৃশ্য হয়ে যায় ঝড়ের গতিতে। ভুলেও আর পেছনে ফিরে তাকায় না।

ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, প্রায় বিধ্বস্ত চেহারায় হারু মণ্ডল তার কাছারি ঘরে এসে বসে। দম্ ফেটে বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা। চোখ-মুখে রোদে পোড়া ধুলো বালি কিচ্‌কিচ্ করে! বুকের ভেতরে হাঁপর চলার টান। কেউ এদিকে নেই। শালা বেজন্মা নবীনভা নির্ঘাৎ ঘুমায়ে আছে। তার হাওয়া খেতে হবে। ঠাণ্ডা জল খেতে হবে। অন্তত গোটা দুয়েক ডাব চাই। অথচ কাকে বলবে। কাছে পিঠে কেউ নেই। বসে থাকতে কষ্ট হয়। পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে লেপটে আছে শরীরে। তাড়াতাড়িতে খুলতে গিয়ে প্যারোৎ ক'রে পিঠের বাঁ দিকটা ছিঁড়ে গেলো। অমনি দুনিয়ার সব রাগ পাঞ্জাবিতে বর্তে গেলো তার। টেনে ফালা ফালা ক'রে ছিঁড়ে তাতে থুথু ছিটিয়ে, দলা-মোচড় ক'রে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই চিৎকার ক'রে উঠলো—নবীন! অ্যাই শুয়ারকি বাচ্চা, হারামখোর-ছোটোলোক...।

নবীনের সাড়া নেই। টু শব্দও নেই কারো।

রাস্তার ওপাশে একটা কদম গাছ। তাতে ছাতারে পাখিদের খ্যাচাখ্যাচা-খ্যাচা...কলরব। কর্কশ আর বিদঘুটে শব্দ।

গদির ওপরে চিৎপটাঙ শুয়ে শুয়ে হঠাৎ হাউমাউ ক'রে কাঁদতে থাকে হারু-মণ্ডল। কাঁদতে কাঁদতে নিজের চুলের ঝুঁটিটাকে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরে যন্ত্রণায় দাপাতে থাকে। কাটা মুরগির মতো ছুঁড়তে থাকে পা। মাথাটা ঠুকতে থাকে পেছনের ক্যাশ বাক্সের সঙ্গে।

: শালা, আগুন জ্বালায়া দিমু আইজ। আমি জানি, বেইশ্যে মাগী, শালী বিউটিরানী এখন আমারই বিছনায় শুয়ারকি বাচ্চা সান্যালের গলা জড়ায়ে—ন্যাংটো হয়া শুয়্যা আছে। মণ্ডল একা একা কাঁদে, আর কথা বলে, মনের ঝাল ওড়ায় শূন্যতায়—সি, পি, এম না নকশাল—ওরে তুরা আমার শ্যামা মার মতো উপকার কৈরতে নিছিলি। গুলিডা কৈস্‌কে গ্যালো ক্যারে। ওরে হারামজাদা কমুনিস্টরা। এই তুগারে হাতের টিপ? সান্যালের মাথার খুলিডা উড়ায়ে দিত্তি পারলিনেরে হারামির বাচ্চারা। এই তুরা কমুনিস্ট হৈছিস? এই টিপ!

নিয়্যা ইনকিলাব মারতিছিস? বিপ্লব করবি তুরা? বলতে বলতে ফের কপাল চাপড়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে থাকে মণ্ডল। নাক দিয়ে সিকনি গড়ায়।

ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'রে নাক ঝেড়ে গদিতেই মুছে রাখে হাত। তারপর আবার বকতে শুরু করে—ওই সান্যাল শালা কুত্তার ছাও। তোর জন্তি আমি লালঝাণ্ডাগরে বিরুদ্ধি জিহাদ করবো ভাবছিস? হবিনেরে। হবিনেরে। আর হবিনে মানব জনম ভাঙলি মাথা পাষাণে। তুই আমারে যতই উস্কানি দিস্, দিতি থাকেক। আমি তোর গুলি খাওয়ার জন্তি কাইজা করবো না। আমি আমার নিজির স্বার্থের জন্তি লড়বো। দুশমন জাফর কাজী, শালো নেড়ের বাচ্চা। আমার বিরুদ্ধি ছোটোলোকগরে বক্তিমে মেরে ক্ষ্যাপাতিছে। ক্ষ্যাপাতি থাক। য্যাদ্দিন মাহুদা আছে, তোমার দল আছে, থানা-পুলিস আছে, আমার হাতে ষোলোডা খুন কিরে, ষোল হাজার খুনের হিসেব করে, এই সাহস কার আছে?

তুই দীপু, আমার অন্তরের শত্তুর। লালঝাণ্ডারা আমার ধনসম্পত্তির শত্তুর। আমি কাঁটা দিয়্যা কাঁটা ওঠাবো। আমি ভক মণ্ডলের ছেলে হারাণ চন্দ্র মণ্ডল।

ও মা। মা-শ্যামারে।

কাঁদতে কাঁদতে গুণগুনিয়ে গান গায় সে—শ্যামা মা কি আমার কালোরে।

লাফ মেরে উঠে বসে সে গানের ওপর বিরক্ত হয়ে। চেঁচিয়ে বলতে থাকে—ভাল্লাগে না গো মা. কিছুই আমার ভাল্ লাগে না। আমি কনে যামু মা, কি করবো মা…। আবার গুণগুনিয়ে গাইতে থাকে—থ াকতে রে মন বুঝলিনে তুই, এমন যে তোর কপাল পোড়া…।

আমি সমিরুদ্দিরে কবো। আজই হুকুম দেবো। দেবোই। দেবোই।

ট্যাকায় করে কাম, মিছ্যা মর্দের নাম।

দিবি, ঘ্যাস্ কৈরে মুণ্ডুটা ধড় থিকে ফ্যালায়্যা দিবি…। পাঁচ হাজার ট্যাকা দিমু তরে।

তখুনি আবার সাবিত্রীর কথা মনে হয়। থাসকেল না খিটকেল—ছুড়িডা এইরম অপমান কৈরে ফিরায়্যা দিলো….'। কি খচ্চরের খচ্চর মেয়েছেলে। বলে কি। অ্যা—কি সেয়ানা! 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।'

গয়নার খায়েস। দেবো তোরে গয়না। কি জানি গানডা? হারামজাদি বিউটিরানী গাইতো....। ওরে লক্ষ মানিক কুড়িয়ে তোরে গড়িয়ে দেবো গয়না ...ছুটি মধুর বুলি শুনিয়ে যারে সোনার পাখি ময়না।

বাহা। বাহা।

সেই গয়না দেবো। অ্যাখুনিই তো দিতেম। অন্দরমহলে যাওয়ার উপায় নাই। বড়ঘরে লোহার খাঁচার মধ্যি ইস্টিলের সিন্দুকে। কতো গয়না! কত ডিজাইনরে। ডাকাতির ভয়ে, লালঝাণ্ডাগরে ভয়ে ব্যাঙ্কের লকারের মতো কঠিন, দুর্ভেদ্য খাঁচা বানাইচি। কারো বাবারও সাধ্যি নাই নম্বর ঘুরাইন্যা তালা খোলে। কামান দাগলিও না। একটা চটাও উঠপিনে কো। ভাবতে ভাবতে তার মনের ভেতরে কে যেন বলে ওঠে—ঘরে যাও। নম্বর ঘুরায়ে তালা খোলো। হাজার গয়নার ভাণ্ডার থিকে দু'চারখানা তুইলে নিয়ে সটান সাবিত্রীর কাছে যাও। সাবিত্রী তুমারে ফিরাবিনে।

ব্যস্ অমনি উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে পাঞ্জাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে মেলে ধরে। ঘামে ভেজা। জবজবে। সেন্টের সুগন্ধটা এখনও তাজা। কি হবে আর এ দিয়ে। ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন! খুব দুঃখ হয়। রাগের মাথায় এরকম দামী জামাটা ছেঁড়া খুবই নির্বুদ্ধিতা হয়েছে তার। মাঝে মাঝে কি যে তার হয়। নিজের ক্ষতিটাও নিজে বুঝে উঠতে পারে না।

না তাকে আরো শক্ত হতে হবে। ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রুকে নির্মূল করতে হলে—ধীরে-সুস্থে-ঠাণ্ডা মাথায় এগুতে হবে। সামনেই বিধানসভার নির্বাচন। ভোমাটা ভালই। হারামির বাচ্চাটার মুখে কিছু আটকায় না। যা-তা বলে ফেলে। ফেলুক। সেই তো, যে গরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়াও সুখের। ওরকম খিস্তি খেউড় না করলে পাবলিক শালোরা ভয় পায় না। ভয় না পেলে ভোটও দেয় না।

ভোমার দাবী, দশ হাজার। এম.এল এ-র টিকিটটা পাইয়ে দেবে। দশ কেন, কুড়ি হলেও সে খুব রাজি আছে। এম এল এ হতে পারলেই কে আটকায় আর। শালো জাফর কাজীর ভিটেটাকে তখন কাজে লাগাবে। কাছেই দক্ষিণের দিঘি। জলের অভাব হবে না। একটা চিনির কল বসাবার খুব ইচ্ছে তার। বেশ বড় সড় ক'রে। দিনে অন্তত হাজার মণ মাল চাই। এই সব জোতদারি-মহাজনী-তেজারতি-সুদের কারবারে আর আনন্দ নেই। সুখ নেই। চিনিকলের লেবার তো শালো এখানেই আছে। পাচ টাকা হপ্তা। ওতেই

হবে। হুজ্জোৎ করবে তো শালোদের ভাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। লাভ শালো লেবারের টাকা ঠকিয়ে। চোদ্দ-পনেরো টাকা রোজের বদলে পাঁচ টাকা, বড়জোর দশ টাকা হপ্তা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হুড়হুড় ক'রে দু'চারখানা লরি নামিয়ে দাও। ইটের ভাঁটা বসাও। বালিয়ারি বানাও। মাল বানাও চিনিকলে! ওঠাও লরিতে। ইটভাটাসে ইট নিকালো। লোড কর দো লরিমে। চলো পান্‌ছি বেলঘরিয়া। শহর কলকাত্তা। জিয়াদা নাফা।

ওই শালো কাজীটা তার জানী দুশমন। ওটাকে না হঠাতে পারলে বিশাল দক্ষিণের মাঠটাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। দু'পাঁচ বছর—ওই দক্ষিণের মাঠে ইটভাঁটা চলবে। কোটি টাকা নাফা হবে।

সাদা স্ট্যাম্পটা তোলা আছে সিন্দুকে। জাফর কাজীর মৃত্যুবাণ। উকিলের কাছে যেতে হবে। খুব ভালমতোন মুশাবিদা করতে হবে...। তারপর...। ইমাম সাহেবকে তো লাগিয়েই রেখেছে সে। শালোটার বড টাকার লালোস। ভিখেরির মতো হাত পাতে। পাতুক। এরম নাহলে কাজও উদ্ধার হয় না। 'মুসলমানরা কমুনিস্ট হয়ে গেলো' এই ধুয়াটা ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে হবে। লেগেও যাবে। পাকিস্তান, আর বাংলাদেশের শাসকরাও নাকি বেকায়দায় পড়লেই চেঁচাতে থাকে—ইসলাম বিপন্ন,। তারপর মার দিয়া কিল্লা। নিজেকে এখন খুব বড দার্শনিক মনে হলো হারু মণ্ডলের। আফসোস হচ্ছে, যদি এম এ, বি এ পাসটা থাকতো...দেখে নিতো ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্বের কুর্শিটা কিংনা দূর হ্যয়।

একটা কাক কা-আ-কা-আ ক'রে ডাকতে ডাকতে চৌকাঠে এসে বসলো। মণ্ডল তাকালো তীক্ষ্ণ চোখে। তার মনে পডে গেলো, আলমিরায় হাফবোতল হুইস্কি আছে। গলাটা কাঠ হয়ে আছে। কোনো শালো হারামখোরের পাত্তা নেই। প্রায় নিরুপায় জেদে সে হুইস্কির বোতলটা বের করলো আলমিরা থেকে।

ছোট চ্যাপ্‌টা দিশী হুইস্কির বোতল। অর্ধেকেরও কম। সোনালী রংটা চেয়ে চেয়ে দেখলো। আর তখুনি মনে হলো' আখ থেকে তো মদও হতে পারে। চিনির দাম বাড়লে মানুষ গুড় খায়! চিনির তখন কম কাটতি। কিন্তু ইণ্ডিয়ার মানুষের মদটা তো শালো না হলেই চলে না। চুরি-ছিনতাই খুন-রাহাজানি, যেমন করেই হোক, মদের তন্‌খাটা জোগাবেই।

ভাবতে ভাবতে সে চিনিকলের কাছাকাছি একটা মদের ফ্যাকটরি করারও

সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। তারপর আনন্দের লহরি তুলে সে চারদিক ভাল ক'রে দেখে নিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচে! কোমর দুলিয়ে, বুক চিতিয়ে। নাচ মেরি বুলবুল তো পয়সা মিলেগা...।

মদ খায়। র। গলা-বুক তাতিয়ে। খাঁ খাঁ রোদ্দুরে, স্যাঁকা টিনের ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে—চৌকাঠের কাকটার দিকে তাকায়। কাকটা ওড়ে না। নড়েও না। সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে মণ্ডলের দিকে।

মণ্ডল মদ খায়। জ্বলে থাক্ হয়ে যায় গলা বুক। কাকটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হাসতে হাসতে বলে—কৌন্‌রে তু? ইধর আয়া করেছিস হাঁ?

হেঁচ্‌কি ওঠে তার।

নিঃশেষ করে তলানিটুকুও। কাকটা বসে বসে তার কাণ্ড কারখানা দেখে। একবার ঘাডটা এপাশ ওপাশ করে। মণ্ডল বলে—পিয়ার করবি তু? কৌন তু? বিউটিরানী? সাবিত্রী?

'বোতলটা খালি। চুমুক দিতে গিয়ে নজরে পডতেই হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মণ্ডল। নেশায় পেয়ে বসে তাকে। আরো চাই। আরো। এক, দুই, তিন বোতলেও তার বুকের জ্বালা মিটবে না। এ সময় হয় মদ চাই, না হয় মেয়ে-মানুষ চাই। দুটোর একটা। দুটোর একটা। দুটোর একটা।

সক্রোধে খালি বোতলটা চোখের নিমেষে, তীব্র গতিতে চৌকাঠের দিকে ছুঁডে মারে। তৃষ্ণার্ত কাকটা, বোধহয় গরমে খাবি খেতে খেতে চৌকাঠের ছায়ায় এসে বসেছিলো। ভেবেছিলো, ঘরের ভেতরের অর্ধ উলঙ্গ লোকটাও তারই মত ক্লান্ত, অবসন্ন একটা কাক। তো কাককে কাকের ভয় কি। কিন্তু তার নিশ্চিন্ততার পরিণতিটা মারাত্মক হলো সেই মুহূর্তে। গুলিব মতো ছুটে আসা বোতলটা এসে আঘাত করলো তার মাথায়।

দু'তিনবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো আহত কাকটা। তারপর উড়ে যাবার চেষ্টা ক'রে-পাখায় পাখায় ঝটাপটি করতে করতে কাত হয়ে পডে গেলো সামনের উঠোনে। নিস্পন্দ-নিষ্কম্প হয়ে ওইভাবে পড়েই রইলো মাটিতে মুখ গুঁজে।

মণ্ডলের তখন মত্ত অবস্থা।

সে ছট্‌ফট করে। একবার উঁকি মেরে কাকটাকে দেখে। দেখতে দেখতে সে তার শক্তির উল্লম্ফন টের পায় নিজের ভেতরে। শক্তির দাপাদাপি তার

মগজে আগ্নেয়লাভার সৃষ্টি করে। মৃত কাক-আর ভাঙা বোতলের ছড়িয়ে পড়া টুকরো। বুলেট। সে হা-হা ক'রে হাসে।—শালো কমুনিস্ট শালো লালঝাণ্ডারা গ্যাখ্, হারু মণ্ডলের হাতের টিপ্ গ্যাখ শালোরা। বোতল দিয়্যা লক্ষ্যভেদ করি আমি। তুগরে বন্দুকের নিশানাও শালো ফৈস্কে যায়। দীপক সাণ্যালের কৈল্জেডা ছ্যাদা কোত্তি পাল্লিনে। শালোরা গোল্লায় যাবি। বলে হা-হা ক'রে হাসতে থাকে সে।

শালো বিউটিরানী, তোরে আচ্ছা কৈরে টিট করবো। শালী ভাত খাতিছিস ভাতারের, ত্যাল দিতিছিস ওই জামাইবাবু নাঙেরে···। আমার কৈল্জেডা জ্বালায়া দিলি তুই। আগে সাণ্যালডারে খুন করি, কৈরে ছবিডা হাত কৈরে নেই, তারপর তোরে দেইখে নেবো। তোরে ওই গয়নার খাঁচায় আটকায়া-সাবিত্রীর সাথে ফষ্টি নষ্টি করবো। তার গায়ে গয়না দেবো। রানী বানাবো। তোরে, পোড়া ভাত-পোড়া তরকারি গেলাবো।

মা-শ্যামা....

শ্যামা মা কি আমার কালোরে....।

বড় বউডার মরণ দে মা। মরণ দে। আর তো আমি পারিনে মা। ওই রোগা-প্যাকাটি হাড্ডির শরীলে তার গয়না। সারাদিন বিছ্নায় শুয়্যা শুয়্যা হারগিস্ চেল্লায়। অ্যাতো যে ভুগতিছে, কথা কলি কষ বায়া লোল্ ঝরে—ওয়াক্ থুঃ। ঘেন্নায় গা গুলায়। তো রাক্ষুসী শাকচুন্নিডার মরণ নাই। য্যানি তাবিজ-কবজ-তাম্বা মাদুলির হকার। গাওগতরে গিজ গিজ করে। তার আবার নাম কুসুম কুমারী বালা। ওয়াক্। ওয়াক্। কুসুমের ছিরি গো। চোখ ভরা পিচুটি। হৈল্দে দাঁত। ওপরের পাটির দাঁত এত উচা যে, মুখ বুইজে থাকলিউ, নিচের ঠোঁটের উপুর দিয়্যা বাড়ায়া থাকে তার হৈলদে রং। সিঁথির চুল উঠ্তি উঠ্তি ন্যাড়া ঘা.সর মোথার মতো। জ্যান্ত প্রেতাত্মাগো....মা...।

ট্যাঁ-ট্যাঁ-ফুঁ-ফুঁ সারাদিন তার বিরাম নাই। একেকসময় মনে হয়....গলাডা টিপা শ্যাষ কৈরে দ্যায়। শালো কুসুম কুমারী বালা! জাহান্নামের পোকা। সবাই তারে লুঠ-পাট কৈরে খাতিছে। ভাবতে ভাবতে ক্রুদ্ধ আস্ফালনেও তার মনে হয়, সে নিজে খাতিছে গরীবের রক্ত। আর ওরা খাতিছে তারই ভাগ। কি জন্তি সে ভাগ দিবি? দোষ সব তার ঘাড়ে। দুর্নাম য্যাতো তার মাথায়। অপবাদ সব তার; আর....সেই যে, অনাদি খাসকেল্ল কয়, মজা মারে ফৈজু

ভাই, আমাগরে খালি ঘুম কামাই।' তার তো কুনো সুখ নাই, আনন্দ নাই। শান্তি নাই। ইবার সব শালোকো নিচ্চিৎ খ্যাদায়া দেবো।

যাঃ যাঃ জাহান্নামের পোকারা দূর হটো।

এইভাবে হারু মণ্ডল তার যৌন তৃষ্ণার ঝাল মেটায় বিকৃতির সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে জপমালা টপকায় মানুষের সর্বনাশের। ঠিক তখুনি বড বউর দেখভালের যুবতী মেয়ে প্রমোদা ছুটতে ছুটতে, চিৎকার করতে করতে কাছারি ঘরে বয়ে আনে পরম সুসংবাদ।

: বাবা ঠাকুর, ও বাবাঠাকুর, বড মামণি মৈরে গ্যালো গো ·

হারু মণ্ডল তখন ক্লান্ত। নেশায় টলছিলো। দু'চোখ জবাফুলের মতো লাল। সে প্রমোদাকে দেখতে লাগলো। প্রমোদা আবারও চিৎকার করতে যাচ্ছিলো। ধমকে উঠলো হারু মণ্ডল—চোপ। যে যায় তারে যা'তি দে।

প্রমোদা হারু মণ্ডলের কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে গুটিয়ে যায়। দুই হাতে নিজেকে আডাল করার বৃথা চেষ্টা করে। তার চোখে জল। ঠোঁট কাঁপে। ছুটে আসার ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকে। আর হারু মণ্ডল দেখে, গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে প্রমোদার মুখ। গলা। বুক। নিতম্ব। পায়ের গোডালি পর্যন্ত।

ভয়ে প্রমোদা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে—বড মামণির দম আটকে গিছে।

: শুনেছি। আমি যদি দিল্লির মোগল বাদশা হৈতেম, তালি তোরে মুক্তার মালা দিতেম। তবু তোরে বখশিস দেবো প্রমোদা। আয়। আমার কাছে আয়।

প্রমোদা ভয়ে মাথা নাডে—না। না। আপনে চলেন।

: কাছে আয়।

: বাবা ঠাকুর!

: প্রমোদা।

: বড মা...

: আয়।

: না। বাবা ঠাকুর ··। আমি যাতিছি।

: প্রমোদা! গর্জে ওঠে হারু মণ্ডল।

প্রমোদার পা আটকে যায়। এগারো বছরে বিধবা হয়েছিলো সে। এখন চব্বিশ। অসহায় বাগ্‌দির ঘরের মেয়ে। শরীরের আঁটসাট বাঁধন। কালো·

কষ্টিপাথরে খোদাই করা শরীরে ওর পুঁইলতার তরতাজা কোমল মাধুর্য।
ঝক্‌ঝকে দাঁত। পুরু ঠোঁট। বুকের ভাঁজে অথৈ ঢেউ।

মণ্ডল টলতে টলতে নেমে আসে।

পিছু হটে প্রমোদা।

মণ্ডল হিংস্র বাঘের মতো এক থাবায় টেনে নিয়ে আসে তাকে। চেপে ধরে বুকের ভেতরে। বলে—তোরে আমি হাজার টাকা বখশিস দিমু।

দুরন্ত বাগ্‌দির রক্তে উছলে ওঠা বিদ্রোহে সজোরে হারু মণ্ডলকে ধাক্কা মারে প্রমোদা—আপনে একটা খরিশ কেউটে। বউ মৈরে যায়, আর আমার যৈবনে ছোবল দিতি আসেন।

মদমত্ত মণ্ডল আকাশের দিকে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে গদিতে পড়ে গিযে হা হা ক'রে হাসে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—ওরে, নেশার ঘোরে আমার মাথার ঠিক ছিলো না। শ্যামা মায়ের পেসাদ খায়া এই দশা। চল্। চল্।

প্রমোদা ছুটতে ছুটতে অন্দরমহলে চলে যায়। হারু মণ্ডল ঊর্ধ্বাকাশে হাত তুলে প্রার্থনা জানায়—মাগো, আর একটা সুসংবাদ দে মা। দীপকের মরণের সংবাদ।

তারপর যতটা সম্ভব শোকবিহ্বল চেহারায় সে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ায়। দূর থেকে কানে আসে হৈ-চৈ। কান্নাকাটির রোল। মণ্ডল টান মেরে ধুতির কোচাটা আল্‌গা ক'রে মাটিতে হেঁচ্‌ড়ে নিয়ে-উদ্‌ভ্রান্তের মতো অন্দরে প্রবেশ করে।

ধুন্ধুমার কান্নাকাটি বাড়িময়। কোন্ শালোরা কাঁদে? কাঁদে সেইসব গলগ্রহের দল। যারা কুসুম কুমারী বালার দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন। ডজন দেড়েক সংখ্যায়। এই গলগ্রহদের সবাইকে চেনেও না মণ্ডল। কোনোদিন কথা বলারও ফুরসৎ হয়নি। সেই তারা এলোপাথাড়ি কাঁদছে। মণ্ডল উঠোনে পা দিয়ে সবাইকে একনজর দেখে মনে মনে বলে—শালো জানোয়ারের দল, কাঁদিস কার লগ্‌গি? কুসুম কুমারীর শোকে? অসম্ভব। কাঁদিস এ বাড়ি থিকে তোগরে হাঁড়ি উইঠা যাওয়ার ভরাসে। হাঁড়ি তো ইবার উঠপেই। না উঠলি হাঁড়ি কুড়ি ভাইঙা নিজিই উঠাবো সব শালোরে।

তারপর একবার বড়্‌বউর ঘরের দিকে উঁকি মেরে বাইরে কাছারি ঘরে ফিরে আসে। টল্‌তে টল্‌তে মন্দিরের সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। যদিও

মন্দিরের দরোজা তখন বন্ধ। প্রণাম সেরে বাইরের গেটের পাশের ছোট ঘরের দরোজায় জোরে ধাক্কা মেরে ডাকে—সমির, সমিরুদ্দী।

: বাবু। খুলি।

দরোজা খুলে দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসে সমিরুদ্দী—কি হয়ছে বাবু?

কোনো কথার উত্তর না দিয়ে সমিরুদ্দীর ঘরে ঢুকে যায় মণ্ডল। আর তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে দরোজা ভেজিয়ে, অন্দরমহলের দিকে জানলাটা সামান্য ফাঁক ক'রে বলে—দ্যাখ্।

সমিরুদ্দী জানালায় চোখ রেখে বলে—সাইন্যালবাবু।

সমিরুদ্দীর পেছনে দাঁড়িয়ে খরিশ কেউটে হয়ে যায় হারু মণ্ডল—কোন্‌দিক থিকে আসে?

: আপনের বড়ঘরের দিক থিকে। চৈলে গ্যালো হন্‌হনায়া।

উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে মণ্ডল। চাপা স্বরে বলে—কনে ছিলো অ্যাতোক্ষণ?

: আপনের ঘরে।

: কতক্ষণ?

: দুপুরে আপনে বারায়া যাওরার পরে অন্দরের দিক যাত্তি দেখিছি।

: আমার বড বউ মারা গিছে খানিক আগে।

সমিরুদ্দী যেন আকাশ থেকে পড়ে—কি কন বাবু! প্রশ্নটা করেই বোকার মতো মণ্ডলের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে সমিরুদ্দী। সবকিছু তার কাছে রহস্যময় মনে হয়। কোনোদিন তার মালিক এই পাহারার ঘরটায় মাথা গলায়নি। কোনোদিন দীপক সান্যালকে নিয়ে একটা প্রশ্নও করেনি। রোজই তো সান্যালবাবু অন্দরে যায়। মালিকের ছোট বউ তার শ্যালিকা। চা খায়। হাসি ঠাট্টা করে। বিছানায় শুয়ে থাকে। এনিয়ে তো কখনো কোনো প্রশ্ন এ বাড়িতে কেউই তোলেনি। আজ হঠাৎ...সে হিসেব মেলাতে পারে না। বড় মা ঠাকরুণ মারা গেলো আর সান্যালবাবু চোরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো। তার মালিক এসে ঢুকলো পাহারার ঘরে। কি রকম গম্ভীর হয়ে পায়চারি করছে। সারা মুখে তার কালি ছেটানো। কালো মুখে রাগ। ভয়ানক। কাল কেউটের মতো দেখতে।

মণ্ডল পায়চারি করে। মাথায় তার বুদ্ধির খেলা।

এ সময় যে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে হয়, স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়;

খুব জানে সে। সূক্ষ্ম বিচারের সময় উত্তেজিত হলেই সর্বনাশ। অঙ্কশাস্ত্রে তার হিসেবের মাথাটা পরিষ্কার। মনে মনে সে হিসেব কষে। হিসেব কষতে কষতে মাথার চুল ছেঁড়ে পট পট ক'রে। সেই চুল আঙুলে পেঁচিয়ে টেনে লম্বা ক'রে। পট ক'রে ছিঁড়ে যায়। ম্যাট্রিকে অঙ্কে সে পঁচানব্বই পেয়েছিলো।

বাড়ির ভেতর মহলে কান্নাকাটি-ছোটাছুটি। লোকজন আসছে বাইরে থেকে।

মন্দিরের পুরোহিতও জেগে উঠে কাকে যেন হাত নেড়ে নেড়ে কি বলছে। গলগ্রহদের দু'তিনজন বোধহয় কাছাবি ঘর দেখে ফিরে গেলো। জানালায় দাঁড়িযে দেখাতে লাগলো মণ্ডল। তার ঠোঁটে একটা ধারালো হাসির ঝিলিক খেলে গেলো।

: শালো। যার ঘোড়া তার ঘোড়া না, চ্যারাকদারের ঘোড়া। প্রকাশ্যে সমিরুদ্দীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে সে বললো—সমিরুদ্দী। এক পাঞ্জা দেবো ইনাম। তোরে আমি বিশ্যাস করি। তুই পারবি।

সমিরুদ্দীর মতো দুর্ধর্ষ দাঙ্গাবাজও ক্ষণিকের জন্যে চমকে ওঠে। পাঞ্জার ইশারা সে জানে। একটাই উদ্দেশ্য। কাউকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে হবে।

মণ্ডল একটু বিচলিত হয়—কিরে?

: হ বাবু।

: নগদ পাঞ্জা। রাজি?

সমিরুদ্দীর চোখে লোভের আলো ঝক্‌ঝক্ করে—কারে?

হাসলো মণ্ডলের সমস্ত শরীর মুখের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে। ঘাড় নেড়ে বললো—পরে কবো। আগে আমার সাথে অন্দরে চল্। হিসাবটা সরেজমিনে মিলায়া দেখি।

: ঠিক আছে।

যেন শিকারী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অ্যাল্‌সেশিয়ান গন্ধ নিতে নিতে কুসুম কুমারী বালার বন্ধ দরোজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে দাঁড়ায়। পেছনে ভয়ানক সমিরুদ্দী।

ঠিক মিলে যায় অঙ্ক। হিসেবের অঙ্কে ফাঁকি নেই। ফাঁকও নেই। আত্মতৃপ্তিতে মণ্ডলের বুকে আনন্দের শিহরণ। মনে মনে ভাবলো, ইণ্ডিয়ার সদর সি. আই. ডির প্রধান হওয়ার ক্ষমতা আছে তার।

গলগ্রহদের কান্নার রোল কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। হারু মণ্ডল

সবাইকে দেখলো আর একবার। দেখে বড় বউর ঘরের দরোজা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে সমিরুদ্দীকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বললো। নিজে চলে এলো বড়ঘরের দরোজায়। ভেজানো। শব্দ না ক'রে দরোজা ঠেলে ভেতরে এসে দাঁড়ালো—বিছানার পাশে। চিৎ হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বিউটি রানী। পোশাক যেখানে যেমন গোছানো থাকা উচিত তেমনি আছে। কোথাও এলোমেলো হয়নি। দেখে ঠোঁটের কোণে সেই ধারালো হাসি ফোটে মণ্ডলের। শালো, কত রঙ্গ দেখালিলো পিঠার দেখালি ঠ্যাং, জালার মধ্যি মাছ থুইছিলাম. খুইলা দেখি ব্যাঙ। শালো, তুই জাইগে থাকলিউ কুনোদিন শরীলে তোর জামা-কাপড়ের অ্যাতো ছিরি-ছাপটা দেখি নাই। আইজ ঘুমায়ে ঘুমায়ে অ্যাতো সত্তীপনা'....।

দেখতে দেখতে তার জোরে জোরে শ্বাস ওঠে। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে। হারামজাদি, ছেনাল, সারা বাড়ির মানুষ কান্‌তিছে, হৈ হুল্লোড় করতিছে, পাড়া-প্রতিবেশীরা আয়ছে, আর কি কাল্‌ ঘুমরে তোর চোখির মধ্যি। কুম্ভকর্ণরেও হার মানায়া দিলি।

তার দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণে কট্‌কট্‌ শব্দ হয়। হাতের আঙুলগুলো নিশপিশ করে। বিউটির গলার কাছটা খুব নরম। তুলতুলে মাখন মাখন। ভারি কোমল। ধব্‌ধব্‌ ক'রে জ্বলছে। একটু একটু ক'রে এগিয়ে গেলো মণ্ডল। আস্তে আস্তে ডান হাতের আঙুলগুলো সাঁড়াশি বানিয়ে আলতো ক'রে চেপে ধরলো বিউটির গলা। খুব পেলব। কুসুম কুসুম ওম্‌।

না। থাকুক এ ঘুম অ্যাখন ভাঙবিনে। জাগা ঘুম ভগবানও ভাঙাতি পারে না।

দরোজা ভেজিয়ে ফের বউর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো মণ্ডল।

উঠোনে তখন লোকজনে গিস্‌ গিস্‌ করছে। এখানে সেখানে জটলা। ক্ষেত খোলার কামলারাও আছে সেই ভিড়ে। নবীনকেও দেখা গেলো। হারামজাদাও কাঁদছে ফ্যা-ফ্যা ক'রে। এইবার মণ্ডলকে দেখে গলগ্রহের দল এক-যোগে শোকে উথ্‌লে উঠে কান্নার প্রতিযোগিতা শুরু ক'রে দিলো।

: ও রে কি হৈলোরে বাবা গো, পরাণের বৈন্‌ঝিরে আমার....পুনারো বছর এই বুড়িরে টাইনে চৈলে গেলি তুই...

: কিড্ডা আর আমাগরে দেখপি ওরে পিসিমণিরে....এই তুমার মনে ছেলো গো পিসিমণিরে....

: ওরে দিদি আমার সতী লক্ষী ছেলোরে...ও দিদি তুই আমাক নিয়্যা গেলিনে ক্যানেরে....

: সিঁথার সিঁন্দুর নিয়্যা মাসি আমার বিদায় নিলি৷ গো...বাবা। কেডা আর ক্ষেন্তি ক্ষেন্তি কৈরে নাড়ুডা-বড়ুডা খাতি কবে রে....ওরে আমার মাসিরে... ।

: এই চোপ্। চোপ্ শুয়্যারের বাচ্চারা। গর্জে উঠলো হারু মণ্ডল। যেন সাট্‌ল্ ব্রেক।

নিমেষে স্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেলো শোক-প্রতিযোগিতা।

হারু মণ্ডল আঙুল তুলে হুকুম জারি করলো—খালি প্রমোদা থাকপে ইখেনে। আর সব ভাগো। ভাগো হিয়াসে। জল্‌দি ভাগো। শালো কুত্তেন পালেরা... ।

চোখেব পলোকে উঠোন ফাঁকা।

বারান্দায় কালাপাহাড সমিরুদ্দী।

উঠোনে নবীন।

চৌকাঠে বলির পশুর মতো থরথরিযে কাঁপে প্রমোদা। তার মাথার ঘোমটা খসে পডে। শক্তি নেই আবার খসে পডা ঘোমটা মাথায় তোলার।

খস্‌খসে ভয়াল কণ্ঠ হারু মণ্ডলের—প্রমোদা।

প্রমোদা কাঁপতে থাকে।

: ঘবে আয়।

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের ভেতরে এসে দাঁডায় প্রমোদা।

সামনে কুসুমকুমারীর মৃতদেহেব দিকে তাকায় হারু মণ্ডল।

মেঝেতে-মুখ হাঁ ক'রে, বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের ভয় নিয়ে নিঃশব্দে পডে আছে কুসুম কুমারীর লাশ। তার খডগের মতো খাডা নাকটা শূন্যের দিকে। বাঁ হাঁটুটা ভাঁজ করা। ডান পাটা শক্ত। সটান। পরণের শাড়িটা কোমর অব্‌দি উঠে আছে। আর সামনের উঁচু বেঢপ দাঁত দুটি বিভৎসভাবে গেঁথে গেছে নিচের ঠোঁটে। কেটে গেছে। রক্ত চুঁযে পড়েছে। কালো জমাট বেঁধে আছে সে রক্ত।

মণ্ডল প্রমোদার দিকে পেছন ফিরে তাকালো। সেই খস্‌খসে ভৌতিক কণ্ঠ তার—তুরা কনে আছিলি?

: বাসন মাজতি ছিলাম।

: হু। শুয়্যারের বাচ্চারা?

: জানিনেক্কো।

: ছোট বউ ?

: ঘুমায়া ছেলো।

: হু।

: এ ঘরে কেডা ঢুকিছিলো ?

: অ্যাঁ ?

থতমত খায় প্রমোদা। তার জিভ্-গলা-বুক শুকিয়ে যায়। বুকটা হাঁপরের মতো জোরে জোরে ওঠা নামা করতে থাকে। বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। মাথাটা ঝুকতে ঝুকতে প্রায় বুকের কাছাকাছি।

: কিরে।

: অ্যা!

: বড় বউ মরার আগে কেডা আয়ছিলো এ ঘরে ?

: জানিনেকো।

গদাম্।

হারু মণ্ডলের ডান পায়ের কিক্ ঠিক তলপেটে এসে লাগে প্রমোদার। সবেগে দুই হাতে পেট চেপে ধরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সে—ও ভগবান, ও ভগবান, মৈরে গেলাম গো।

: চোপ্ হারামজাদি।

চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে ওঠায় মণ্ডল। হিস্ হিস্ শব্দে বলে—কেডা আয়ছিলো ক।

: জানিনেকো ভগবানরে।

ঠাস্। ঠাস্।

দুই গালে চড় খেয়ে বেসামাল প্রমোদা হুমড়ি খেয়ে হারু মণ্ডলের পায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে—ও বাবা-ঠাকুর গো, আর মাইরো নাগো। মৈরে যাবো গো আমি।

: ক তালি। বলে ওর চুল খামচে উর্ধ্বমুখে টেনে ওঠায় মাথা।

প্রমোদা গোঙাতে গোঙাতে বলে—ছোট মাঠাকরুণ আয়ছেলো।

: কি জন্যি ?

: পান খাতি।

: হু। তুই জানলি ক্যাম্নে, বড় মা ঠাকরুণ মৈরে গিছে ?'

: ঘরে মাজা বাসন রাখতি আইসে দেখিছি।

ছোট বউরে খবর দিছিলি ?

: হ।

আয়ছিলো ?

না।

ক্যা ?

কয়ছে, ঘুমায়া আসপেনে।

হু। তুই ছোটবউর ঘরে গিছিলি ?

না। বাইরি থিকি ডাকছিলেম।

ঠিক আছে। তুই উঠানে যা।

প্রমোদা উঠোনে পেয়ারা গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। সমিরুদ্দীকে দেখে তার আতঙ্ক বেড়ে যায়। কঠিন-শক্ত মুখ। গুটি বসন্তর দাগ সারা মুখে। চোখ ছুটি বিড়ালের মতো। যখন তাকায়, মনে হয় বুকের মধ্যে সূচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। প্রমোদা ভয়ে মাটির দিকে তাকায়।

নবীন ঠায় দাঁড়িয়ে। সাড়া শব্দ নেই।

হারু মণ্ডল কুসুম কুমারীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে। ঘাড়ে হাত দেয়। শক্ত। কি ভেবে ঠ্যাং ধরে টেনে লাশটাকে আলোতে নিয়ে আসে। চোদ্দ-পনেরো সেরের একটা মাছের মতো। হাল্‌কা।

গলায় নখের স্পষ্ট দাগ। দু'তিন জায়গায় ছড়ে গেছে। জমাট রক্তের রং মেরুন।

শ্বাস রোধ করা মৃত্যু।

আপনমনে ঘাড় নাড়ে মণ্ডল। ঠোঁটের কোণে আবারও জেগে ওঠে সেই ধারালো হাসিটা। তারপর লাশটা আবারও ঠ্যাং ধরে টেনে আগের জায়গায় এনে ফেলে রাখে। বেরিয়ে আসার সময় দরোজাটা টেনে দেয়। একবার প্রমোদাকে দেখে বারান্দা থেকে নামার সময়। মুখে আঁচল প্রমোদার, ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ফিক্ ক'রে হাসে মণ্ডল। নবীনকে বলে : নোবনে, এইখানে খাড়া পাহারা। প্রমোদা যেভাবে রইছে' সেইভাবে থাকপে। কেউ য্যানি ইদিক না আসে, খবরদার। পিচ্ছাপ-পায়খানা বন্ধ।

নবীন মাথা ঝাকায়—আচ্ছা।

: সমিরুদ্দী, চল্।

সমিরুদ্দীকে নিয়ে বেরিয়ে যায় মণ্ডল। আবার উঠোনে সিমেণ্টের পার্টিশনের গেট দিয়ে ঢুকে নিঃশব্দে শোবার ঘরের দরোজাটা দুম্ ক'রে খুলে ভিতরে ঢোকে। বিউটী যেন ত্বড়িৎবেগে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলো। মনে মনে হাসলো মণ্ডল। আল্‌মিরা খুলে গোটা হুইস্কির একটা বোতল ধুতির খুটে ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সমিরুদ্দীকে ইশারায় ডেকে নিয়ে কাছারি ঘরে এসে দেখলো আশে-পাশে ঘুর ঘুর ক'রে ঘুরছে গলগ্রহরা। কোনো খয়রাতি পার্টির লোকজন তখনো কেউ কাছারিতে আসেনি।

সেই হাফ হুইস্কিতে যেটুকু নেশা ধরেছিলো, এতক্ষণে তা উধাও হয়ে গেছে। সমিরুদ্দীকে বললো—তুই চৌকাঠে টুল নিয়্যা বয়। কুনো শালোকে ঢুকতি দিবিনে। দেখিস—একটা ভাঙা বোতল আছে। পায়ে না বেঁধে। আর ওই মরা কাকটারে উঠায়া দূরে ফ্যালায়া দে।

সমিরুদ্দী কাচ খুঁটতে ব্যস্ত হলো।

মণ্ডল বোতলের সিপি খুলতে লাগলো। বেঘোর বেহদ্দ নেশা চাই এখন তার। মনে মনে তার হিসেবের যোগফল নামানো শেষ। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। চারটে বেজে দশ। এখনো পৌনে তিনঘণ্টা বেলা আছে। অনেক সময়।

র' হুইস্কিতে ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিলো। খুব তেজী। দাউ দাউ ক'রে জলতে জলতে তরল সোনালী জল গলা বেয়ে নেমে যায়। বেশ আরাম বোধ করে সে। আর তখুনি মনে হয়, দিনের বেলা সান্যাল শুয়ারের বাচ্চাটা তো খিড়কি দিয়্যা ঢোকে। সে সময় তার আদরের শালী, খিড়কির দরোজা আর ভেতর বাড়ির পার্টিশনের দরোজা বন্ধ ক'রে রাখে। কেউ ও বাড়িতে ঢুকতে পারে না। এমনকি সে নিজেও অনেকদিন দরোজা বন্ধ দেখে ফিরে এসেছে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে। কোনো কোনোদিন খিড়কির দরোজা খুলে বন্ধ করার শব্দও শুনেছে পার্টিশনের এপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর বেশ-ভূষা ঠিক-ঠাক ক'রে ঘুম চোখে দরোজা খুলে দিয়েছে শালী সিনেমার নায়িকার মতো। পাকা-অভিনয়। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ। তো আজও তো দীপক খিড়কি দিয়েই পালাতে পারতো। কিন্তু তা না ক'রে সে সদর দিয়ে গেলো কেন?

কুসুম কুমারী ওদের অবৈধ লীলাখেলার খুব বড বাধা ছিলো। তাকে সরিয়ে দেয়া হলো। একাজে দীপক বিউটিকে চমৎকার কৌশলে কাজে

লাগিয়েছে। প্রমোদা নিশ্চিৎভাবেই সব জানে। ও ওদেরই লোক। হয়তো একদিন সুযোগমতো তাকেও ঝেড়ে দেবে ওরা।

দেখা যাবে কার মাথায় কত বুদ্ধির খেলা।

আজ পাশাপাশি চিতা জ্বলবে দু'খানা।

মদ খেতে খেতে, এইসব ভাবতে ভাবতে হারু মণ্ডল হা হা ক'রে হেসে ওঠে। তারপর সমিরুদ্দীকে ডাকে, সমিরুদ্দী।

: বাবু।

: মদ খা। গিলাস আনেক।

: না বাবু। আপনের স্যামনে পারবো না।

: গিলাস আনেক।

সমিরুদ্দী বিস্মিত হয়ে তার মালিকের মুখ দেখে। অতবড় বোতলটা অর্ধেক ক'রে ফেলেছে এরই মধ্যে। তাকে দেখে নির্দয় সমিরুদ্দীরও বুক কাঁপে। মাথায় তার পাঁচ হাজারের পাগ্লাটা মাতলামো শুরু করেছে। সে হুকুম তামিল করে। মণ্ডল গেলাস ভরে মদ ঢেলে দেয়—খা।

সমিরুদ্দী গেলাসটা নিয়ে মালিকের দিকে পিঠ দিয়ে বসে গেলাসে চুমুক দেয়। বাইরে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো কাকের কোলাহল শোনা যায়। ক্রমে তা বাড়তে থাকে। বাড়তেই থাকে। বাড়তেই থাকে। মদ খেতে খেতে মণ্ডলের মনে হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত কাক এক সঙ্গে তার কাছারি ঘরের টিনের চালের ওপর উন্মত্তভাবে আক্রমণ করছে।

কা-কা-কা-কা।

কা-আ-কা-আ-কা-আ আউ। আউ।

কা-আ-আউ, কাআ-আউ, কাউ। কাউ।

ডাকতে ডাকতে, টিনের চাল থেকে চৌকাঠের ওপরে মুহুর্মুহু হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে কাকের কাফেলা। ভয় পেয়ে হারু মণ্ডল বলে—মরা কাকটারে কনে ফ্যালিছিস?

সমিরুদ্দী ইশারায় কাছারির চাল দেখায়।

: সব্বোনাশ! অ্যাখন বারাইনাও যাবিনে! বারালিই ঠোকর মারবি।

দশবারোটা কাক জড়াজাপটি ক'রে চৌকাঠ গলিয়ে ভেতরে ঢুকে বেদম চিৎকার করতে শুরু করে। মণ্ডল কানে হাত চাপা দেয়। সমিরুদ্দী লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। কাকেরা উড়ে পালায়।

হাসে হারু মণ্ডল—শালোর কাইণ্ড দেখিছিস? ওইতো এট্টুখানি শরীল

পারলি য্যানি আমাগরে ছিঁড়া খায়ে ফ্যালাবে। শত্তুরের উপুর কাইয়ারও রাগ-ত্মাখ।

সমিরুদ্দী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মণ্ডল উঠে এসে খপ ক'রে সমিরুদ্দীর বাঁ হাতের কবজি চেপে ধরে। সমিরুদ্দী তাব কবজিতে হারু মণ্ডলের শরীরের উত্তেজনা টের পায়। মণ্ডল ফুঁসে ওঠে—সমির।

: কন।

: ট্যাকা তোরে ক্যাশ দেবো আমি। কাজডা করতি হবে।

সমিরুদ্দীর লাল চোখে নীল নোটের ছায়া কাঁপে। তার বসন্তখচিত মুখে চোয়ালের হাড় ফুলে ফুলে ওঠে। সে হাসে—কী করতি হবি কন?

: আল্লার কিড়ে, কাকপক্ষিরেও জানাবিনে?

: আল্লার কিড়ে।

: সমির, তুই আমার অনেক দিনের বিশ্যাসীরে।

: সমিরুদ্দী নুনহারামি করবিনে কুনোদিন। কাম তো আপনের কম করিনাই বাবু। কুনোদিন উল্টা পাল্টা কিছু শুনিচেন?

: না। শুনিনাই। সেই জন্যিই তো তোরে কই। ভরসা করি।

: আল্লার কিড়ে খায়ছি বাবু।

হাসে হারু মণ্ডল নিঃশব্দে। নিজের ভেতরে। শব্দ হলে চমকে উঠতো ঠাণ্ডামাথার দাঙ্গাবাজ জনাতঙ্ক সমিরুদ্দীও। হায়েনার হাসি। মিষ্টি। কিন্তু হিংস্র। নিষ্ঠুর।

: শোন্। আইজ মাঝ রাত্তিরে বড় বউর চিতা জ্বলবে। আমারে সে সময় শ্মশানে খবরডা পৌঁছাবি।

: কেডা?

: সাইন্যাল।

হিস্স্ ক'রে হাসে সমিরুদ্দী।

: বহোৎ আইচ্ছ্যা বাবু। কিন্তুক ম্যালা দেরি কৈরলেন।

: জানি।

: জানীদুশমন ওডা আপনের।

: তাও জানি।

: দেরি কৈরেন না। টাকাডা আনেন। ঘরে বউর হাতে দিয়্যা আসি।

: আয় আমার সঙ্গে।

বাইরে তখন কাকযুদ্ধের সুতীব্র মহড়া। মণ্ডলকে ঠিক চিনে ফেললো ওরা। দশ বারোটা কাক এক সঙ্গে তার মাথার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে চিৎকার ক'রে বসে পড়লো। মাথায়-ঘাড়ে ধারালো ঠোঁটের ঘা লেগে চামড়া ছড়ে গেছে! সমিরুদ্দী একটা লাঠি নিয়ে হই হই ক'রে তাড়া করলো আক্রমণকারী কাকদের। গলগ্রহরাও ছুটে এলো। কিন্তু কাকেরা কিছুতেই পিছু হটতে চায় না। উড়ে যায় তাড়া-খেয়ে, পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়।

সমিরুদ্দী প্রায় বুকের নিচে মণ্ডলকে লুকিয়ে, নিজেও দু'চারটে ঠোকর খেয়ে অন্দর মহলে নিয়ে গেলো তার মালিককে। বাইরে গলগ্রহরা তখন কাকের সঙ্গে লড়াই শুরু ক'রে দেয়। হাতে হাতে লাঠি লগা নিয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি ক'রে কাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

কাকেরা আরো ক্ষেপে যায়। তারস্বরে চিৎকার করে।

গলগ্রহদের যুদ্ধের হুঙ্কার, আর কাকেদের প্রতিশোধ স্পৃহার চিৎকারে মণ্ডলবাড়ি টাল-মাটাল। মাথায় ঘাড়ে ভীষণ যন্ত্রণা করতে লাগলো মণ্ডলের। আর সেই যন্ত্রণা যেন তাকে বলে দিলো শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সময় থাকতে মেরে সাফ ক'রে দাও। নাহলে বিপদ তোমারই। কুসুম কুমারীর মতো তুমিও একদিন ওইভাবে চিৎপাত হয়ে মরে পড়ে থাকবে।

বিউটি তখনো ঘুমে অচৈতন্য। হারু মণ্ডল প্রথমে লোহার খাঁচার চাউস তিনটে তালা খুলে তার ভেতরে ঢুকলো। টুক-টাক শব্দ করলো। বিউটির তবু ঘুম ভাঙে না। তারপর নম্বর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আয়রন সেফের তালা খুলে টাকা বের করলো। গুনলো। আয়রন সেফ আটকালো। খাঁচার তালা আটকালো। তখনো ঘুমোচ্ছে কুত্তিটা। বিড়বিড় করলো মণ্ডল—এই তোর ঘুম হতিছেবে শয়তানি। জাইগে জাইগে খুন? এ ঘুম তোর ভাঙে ক্যাম্নে রে? কানের কাছে বোমা ফাটালিও এঘুম তোর ভাঙবিনে। কি কৈরে ভাঙাতি হয়, আমি জানি তার ওষুধ। আগে বড়ডারে ফ্যালাই, তারপর তোরে পাবোনে।

বাইরে কাকের কলরব তখনো চলছে।

সমিরুদ্দীই বললো—আপনে আর বারায়েন না। আমি সবাইরে কয়া যাই লোকজনরে খবর দিক।

: ঠিক আছে। এই নে।

: কত?

: যা কথা। পাক্কা।

: পুরা ?

: শুইনে ছ্যাখ।

: না। না। আপনে আমার মালিক। মুখির কথাই যথেষ্ট।

মণ্ডলের খুব হেচকি উঠতে লাগলো। টলতে টলতে জড়ানো গলায় খামচে ধরলো সে সমিরুদ্দীর কাঁধ—আইজই পাশাপাশি চিতে জ্বেল্‌বে।

: খোদার কসম।

: আর অ্যাখন বাইরে রটায়া দিবি, বউর শোকে মদ খায়া মাতাল হয়া গিছে ঠাকুরবাবা।

: জানি কি কি কতি হবি।

: আরো ইনাম দেবো তোরে। কাজ হাসিলের পর রিহার্সাল দিয়্য' দেবো নে। কাইল থিকে আমি অবতার সাজবো। যা।

চলে যায় সমিরুদ্দী জামার পকেটে সবুজ নোটের পঞ্চাশখানা শত্‌কে আরাম নিয়ে। মণ্ডল টলতে টলতে পার্টিশনের গেট দিয়ে বড় বউব ঘরের বারান্দায় উঠে যায় গান গাইতে গাইতে—মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া / ও মন থাকতে নয়ন / বুঝলিনে মন / কেমন তোমার কপাল পোড়া / ম'লে সঙ্গে দিবি মেটে কলসী / কড়ি দিবি অষ্ট কড়া / মন কেন মায়ের চরণ ছাড়'....। হরি-হরি-হরি-ইবোল, হরি-ইবোল।

অঝোরে কাঁদতে থাকে হারু মণ্ডল। কাঁদতে কাঁদতে ঢুকে যায় বড় বউর ঘরে। আর মেঝেতে বসে সমানে কপাল চাপড়ায়। কপাল চাপড়ে চিৎকার ক'রে বলতে থাকে—

: ওরে কুসুম কুমারী আমার, একি ষড়যন্ত্রে তোর বউ। আমারে না কয়ে, না বৈলে পলায়া গেলি এমনি কৈরে দাগা দিয়ারে। ওরে পাষাণী, ওরে ওরে ডাকিনী, ওরে এই ছিলো তোর মনে...। ওরে আমি তো তোরে বাঁইচে থাকতি চিনি নাইরে বউ....। সতী আমার। ওরে সাবিত্রী আমার...। হঠাৎ অনাদি খাসকেলের বউ সাবিত্রীকে মনে পড়ে যায়। নিরুচ্চারে বলে— আইজই ফিরায়া দিলি তুই। তোর গয়নার খায়েস মিটাবো ইবার। আমারও খায়েস...।

ঘরের বাইরে ফের আবির্ভাব ঘটে গলগ্রহদের। প্রভুকে কাঁদতে দেখে ওরাও সাহসী হয়ে ওঠে। দল বেঁধে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে কাঁদতে শুরু করে সকলে।

প্রতিবেশীরা আসতে থাকে। যুবকেরা আসে গেঞ্জি গায়ে। গামছা কোমরে বেঁধে। শ্মশানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে।

হারু মণ্ডল তখন অর্ধোন্মাদ। কাঁদছে। চেঁচাচ্ছে। আর ঘরের জিনিস-পত্র ভাঙচুর করছে। তাকে কেউ সামলাতে পারছে না। এক সময় ধেই ধেই করে কুসুম কুমারীর লাশ ঘিরে নিমাই-এর মতো দুই হাত উঁচিয়ে নাচছে। গান গাইছে।

: ওরে আর তো হবে না, মানব জনম মোর, পাষাণে ভাঙিলে মাথারে...।

হাঁ হাঁ ক'রে উন্মাদিনী হয়ে ছুটে আসে বিউটি রানী। এসেই কুসুম কুমারীর লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে-আছাড়ি পিছাড়ি ক'রে কাঁদতে থাকে। তার মুখে তখনো ভ্যানিশিং ক্রিমের সুগন্ধি। পাটভাঙা শাড়িতে বিদেশী সেন্টের মৌ মৌ সুবাস। কপালের টিপটা পর্যন্ত অক্ষত।

: ও দিদি গো। এ তুমি কি কৈরে গেলে গো....। দিদিগো, দিদিগো, আমরা কারে নিয়্যা থাকপো গো....ওরে একি বিষম ব্যথা দিলাগো তুমি....

: এই, এই। চোপ। চোপ। হারু মণ্ডল ধম্‌কে ওঠে।

: চুপ কি থাকা যায় গো বিধি....যায় না।

: আমি তোরে চুপ করাই

আচম্‌কা বিউটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হারু মণ্ডল। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে উন্মত্ত ক্রোধে চেপে ধরে তার কণ্ঠনালি। ঠিকরে বেরিয়ে আসে বিউটির চোখের মণি। জিভ্‌। গোঁ গোঁ গোঁ ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে।

কেউ এগুতে সাহস পায় না। ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে বিউটির শরীর। অনন্যোপায় হয়ে ছুটে আসে নবীন। এসে শক্তি খাটিয়ে অনেক কষ্টে বিউটির কণ্ঠনালি থেকে মণ্ডলের থাবাটাকে আলগা করে। আর মুক্ত হয়েই ছুটে পালায় বিউটি। উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পালাতে চেঁচায়—অরে মাইরে ফ্যালাও। মাইরে ফ্যালাও। পাগল হয়্যা গিছে।

হারু মণ্ডলের মুঠোয় তখন নবীনের চুল। লাথি। সপাটে নবীনের পিঠে লাথি চালায়। দমাদম কিল ঘুষি মারতে থাকে।

নবীন চেঁচায়—বাবাঠাকুর গো, আমি নবীন গো বাবাঠাকুর।

: চোপ শালো। নবীন কোন্ শালোরে।

বেগতিক নবীন তার প্রভুকে ঠেলে-ধাক্কা মেরে ছুটে পালায়। পালায়। পালাতে পালাতে অন্দর থেকে সদর। সদর থেকে বড় সড়ক। তার চোখে

পড়ে সমিরুদ্দীর সঙ্গে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে আসছে দীপক সান্যাল। নবীন এসে সামনে দাঁড়ায়।

: বাবু; বাবাঠাকুর বদ্ধ উন্মাদ হয়্যা গিছে। ছোট মাঠাকুরুণরে পিরায় মাইরে ফ্যালাতিছিলো। এইরকম কৈরে বাঘের মতো টিপে ধৈরছিলো গলা। আমি তারে ছাড়ায়্যা দিছি। আর অ্যাখন য্যাতো রাগ আমার উপুর। এই দ্যাখেন মাইরে আমার নাক মুখ ভাইঙে দিছে। ঘরের জিনিস পত্তর আছড়ায়্যা নষ্ট করতিছে। শিগ্‌গির কৈরে চলেন।

শুনে মনে মনে চম্‌কায় দীপক সান্যাল। বিউটিকে মারে কেন মণ্ডল? তাহলে কি ও সব ঘটনা জেনে গেছে? প্রমোদা বলে দিয়েছে? তাকেও কি হঠাৎ আক্রমণ ক'রে বসবে?

নিজেকে সাহস জোগায় সান্যাল। তার হাতে রাবণের মৃত্যুবান। পার্বতী ডাক্তারের হত্যাকাণ্ডের ছবি। ছবি না ঘোড়ার ডিম। ওতো একটা ভয় দেখানোর কৌশল। সেদিন কোনো ছবিই ওঠেনি তার ক্যামেরায়। কিন্তু মণ্ডল জানে তার হাতে ছবি আছে। যেটা জনসমক্ষে প্রকাশ হলে—মণ্ডলকে চরম মূল্য দিতে হবে। সেও জানে, হারু তাকে বন্ধু মনে করে না। সহ্যও করে না। সুযোগ পেলেই যে ও চরম প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না, সেকথাও তার অজানা নয়। কিন্তু যতদিন পার্বতী ডাক্তারের হত্যাকাণ্ডের ছবির ভীতিটা ওর মনে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকবে, ততদিন ওর করার কিছু নেই। ওকে নির্বিবাদে সবকিছু সহ্য ক'রে যেতে হবে।

একবার সমিরুদ্দীর দিকে তাকায় দীপক সান্যাল। সমিরুদ্দীকে তার খুব বিশ্বাস। অনেক অসাধ্য কাজ সমিরুদ্দী ক'রে দিয়েছে! হারু তার বিন্দু বিসর্গও জানে না। বরং সমিরুদ্দী হারুর অনেক গোপন কথা তাকে বলে দিয়েছে। আজও একটু আগে গদিতে গিয়ে ভয়ানক এক ষড়যন্ত্রের কথা তাকে বলে দিয়েছে সমিরুদ্দী। তাই সমিরুদ্দী যতক্ষণ আছে, সে নিশ্চিন্ত।

এখন নবীনকে ধমক দিলো সমিরুদ্দী—তুই শালা ভেরেণ্ডা। গাণ্ডু। তোরে য্যাখন-ত্যাখন মারে ক্যা? কৈ আমার গতরে হাত উঠাতি পারে বাবাঠাকুর? যা—! তারপর সান্যালকে বলে—চলেন তো কত্তাবাবু।

হাঁটতে হাঁটতে সান্যাল বলে—তুমি বাপু কাছাকাছি থাইকো।

সমিরুদ্দী হেসে মাথা নাড়ে—থাকপো। আগে গিয়্যা পাগল ঠিক করেন। একদম ঘাবড়াবেন না কৈল্। সে যদি চিম্‌টি কাটে, তো আপনে ঘুষি মাইরবেন। শালা একনম্বরের কুইত্তা।

তখনো চিৎকার ক'রে চলেছে হারু মণ্ডল। কখনো ঘরে, কখনো বাইরে, কোচা খুলে গড়াগড়ি যায়। বেহুঁশ। চারদিকে ভিড়। লোকে লোকারণ্য। যেন যাত্রাগানের মহড়া। নায়ক, হারান চন্দ্র মণ্ডল।

কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না দীপক সান্যাল। ভিড় ঠেলে, ধমকে, সে পথ ক'রে এগিয়ে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ায় হারু মণ্ডলের। আর তাকে দেখা মাত্র চিৎকার ক'রতে গিয়ে হঠাৎ বজ্রাহতের মতো থেমে যায় মণ্ডল। আর মনে মনে আশ্বস্ত হয় সান্যাল। যাক; প্রথম ধাক্কাটা সামলে দিয়েছে। বিপদ কেটে গেছে। এখন তাকে দাপটের সঙ্গে টানতে হবে পরিস্থিতির উপসংহার।

শক্ত ক'রে মণ্ডলের হাত চেপে ধরে সকলকে শুনিয়ে ধমক দেয় মণ্ডলকে—কি হতিছে এসব? শোকে তো মানুষ পাথর হয়। পাগল হয় না কেউ তোর মতো।

হারু মণ্ডল নির্বাক। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে সে চেয়ে থাকে সান্যালের মুখের দিকে। দেখে মনে হয়, সে ইহজগতে নেই। তার মুখে কাল্পনিক পারলৌকিক ছায়া। কোথায় নিমেষে চুপসে গেলো এতক্ষণ যে দাপে সে ইহলৌকিক জাদুর ভেল্কি দেখিয়ে যাচ্ছিলো। এখন সে ভিন্ন কোনো গ্রহ বা গ্রহান্তরের মানুষ। এখানে যা ঘটেছে সে তার কিছুই জানে না। বোঝেও না এদের বিন্দুবিসর্গ ভাষাও।

কুসুম কুমারী তেমনি চিৎপাত শুয়ে আছে লাশ হয়ে। হাঁ মুখ। বিস্ফারিত চোখ।

হারুকে ঠেলতে ঠেলতে খাটে বসাতে গিয়ে লাশের সাথে ঠোক্কর খায় সান্যাল। শিউরে ওঠে এক অদৃশ্য ছায়া—ছায়া অনুভূতিতে। তবু সে জোর ক'রে গলায় গাম্ভীর্যমিশ্রিত শোকাবেগ নিয়ে বলে—মানুষের বাঁচা-মরার কথা কে বলতি পারেরে হারু। সবাই-ই একদিন যাবি, যাতি হবি মহাপ্রস্থানের ডাকে। কেডা অমর আর? তো দুঃখ ৫া একটাই, অ্যাতো চিকিচ্ছে করলি, ওষুধ-পত্তর, ডাক্তার, কোবরেজ, পথ্য....কিছুতিই কিছু হৈলো না। ধুঁকে ধুঁকে মৈরে গ্যালো বউদি....বলতে বলতে সান্যালের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। এবং সে কেঁদেই ফেলে।—তুই চুপ থাকেক। যা করার আমি করতিছি।

সান্যাল বাইরে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে—বেলা থাকতি থাকতি কাঠ জোগাড় করো। শোলা, ধূপ, চন্দন, আতর, খই, কিচ্ছু....না—দুইশো টাকার খুচরা...পাঁচ-নয়া-দশ নয়া...কেউ আমার গদিতে চৈলে যাও। আমার কথা কৈবে। বাতাসা, কদমা-খাগড়াই হলি ভাল...যাও-যাও তিন চাইরজন চৈলে যাও। সমিরুদ্দী, তুমি বউদির আত্মীয় স্বজনরে নিয়্যা শুকনা কাঠ,

শোনা, একটিন কেরাসিনির ব্যবস্থা কৈরে ফ্যালাও। ফুলের মালা চাই। ফুল চাই। নতুন-শাঁখা,সিঁন্দুর, আলতা...। ছোট বউ কনে? তারে ডাকো··· ওই প্রমোদা...যা ডাকেক। জোগাড় যন্তর করতি করতি রাইত এক প্রহর গড়ায়া যাবিনে···। আর-এই যে, হরিপদ দাদা, হরি সংকীর্তনের ব্যবস্থা কৈরে ফ্যালো তুমি। যাও....। খানিকটা রসিকতাও ক'রে দেয় সান্যাল—হরিপদদাদা ছাড়া হরির কেত্তন কেডা করতি পারে!

তো এতক্ষণে চারদিকে সাজ সাজ পড়ে যায়। হারু মণ্ডল খাটের রেলিং ঠেস্ দিয়ে বোবা হয়ে বসে আছে। ওইভাবেই বসে থাকে। সান্যাল হঠাৎ ফ্ঁকা হয়ে যাওয়া উঠোন পেরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে আসে বিউটির ঘরে। বিউটি তখন-সিঁদুর-আলতা বের করছিলো। সান্যালকে ঢুকতে দেখে প্রমোদা বেরিয়ে যায়। বিউটির গম্ভীর মুখ। কথা নেই।

: কি হৈছে? রাধের আমার কথা নাই যে?

: নবীন না বাঁচালি রাধের আইজ চিতে জ্বৈলতো।

সান্যাল দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বিউটিকে। জোর ক'রে চুমু খায়।—রাধে আমার, আর কয়ডা দিন সৈহ্য করো। আর, হ্যাঁ, কুত্তির মড়া য্যাখন নিয়্যা যাবি, সে সোময়-বুকির কাপড় ফ্যালায়ে কাঁইদবে। পাবালক যা বোঝার বুঝুক। আমি ওদিকে আছি। তাড়াতাড়ি আইসো। চান করাতি হাব।

: শোনো।

: কি? তাড়াতাড়ি কও।

: আমি কৈল্ চান করাতি পারবো না। ঘেন্না করে।

: তুমি আতর দিও। আল্তা দিও। চন্দন-সিঁন্দুর দিও।

: মনে থাকে য্যানি। বলে ঘরের ভেতরে পিচিত্ ক'রে থুথু ফেলে বিউটি রানী।

সান্যাল হেসে বেরিয়ে যায়।

গলগ্রহের দল, প্রতিবেশীরা সবাই হারু মণ্ডলের জয় জয় করে।

তারপর সকলকে হতবাক ক'রে দিয়ে-যখন সমবেত 'বলো হরি-হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে—কুসুম কুমারীর মরদেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়—সেই সময় বুকের আঁচল ধুলোয় লুটিয়ে, হৃদয় বিদীর্ণ কান্নায় ভেঙে পড়ে বিউটিরানী। শেষে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। গড়াগড়ি যায়। মুখ দিয়ে ফুপড়ি উঠতে থাকে।

সান্যাল তার নাড়ি দেখে। বলে—জ্ঞান নাই। ও প্রমোদা, জল ঢালো মাথায়। আহারে, আমি অ্যাখন কয়দিক সামলাই। ও মা শ্যামা।

সমিরুদ্দী বলে—কত্তাবাবু, আপনে ইদিক সামলায়া পরে আইসেন। আমি ঠাকুরবাবারে নিয়্যা আইগ্যাই। ও নবীন দৌড়া। মা-ঠাকরুণরে নিয়্যা উরা ম্যালা দূর চৈলে গিছে।

নবীন দৌড়ায়।

সান্যাল মনে মনে সমিরুদ্দীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে হারু মণ্ডলকে বলে—ছেইলে থাকলি সেইতো মুখাগ্নি কৈরতো। সে কাজ তোরেই কৈরতি হবি। তুই আগায়ে যা। আমি আসতিছি।

হারু মণ্ডল তাকায় সমিরুদ্দীর দিকে।

সমিরুদ্দী বলে—চলেন বাবাঠাকুর।

অনেক দূর থেকে হরিবোল ধ্বনি ভেসে আসে। শোনা যায় হরিপদ ঘোষের কীর্ত্তনগান।

ওরা চলে গেলে সান্যাল প্রমোদার দিকে তাকায়—ধর, ঘরে নিয়্যা যাই।

পেছনে পেছনে গলগ্রহরাও আসে। প্রমোদা বলে—পিসিমণি দুধ আনো গরম গরম।

কুসুম কুমারীর দূর সম্পর্কের পিসি দুধ আনতে ছোটে! ক্ষেন্তি বলে—আমি হাত পা টিপি দেবো?

মাথা নেড়ে নিষেধ করে সান্যাল—না তুমরা বরং বাইরেই যাও। আমার যে কি জ্বালা; কোন্‌দিক যাই। কোন্ দিক সামলাই। হারুডা খুব শোক পাইছে। তার কাছেও থাকা দরকার। ইদিকে এই কাণ্ড।

প্রমোদা সেই সময় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—কত্তাবাবু, আপনে শ্মশানেই যানগে। পাঁচজনে পাঁচ কথা কতিছে।

তখন খেয়াল হয় সান্যালের। সে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে—তুমরা সামলাও। আমার শ্মশানে যাওয়া বেশি দরকার। শালীর থিকে বন্ধু বড় আমার কাছে।

কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে বিউটি তার পায়ে চিমটি কেটে-উ-উ-করতে করতে 'না' টাও ওই সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। সান্যালের বুকে নিষিদ্ধ রোমাঞ্চের ডাক। সে দ্বিধাগ্রস্ত।

কুসুম কুমারীর পিসি গরম দুধ নিয়ে আসে। প্রমোদা আবারও ইশারা ক'রে সান্যালকে চলে যেতে বলে। খুব রাগ হয় সান্যালের। প্রমোদাকে

লাথি মেরে উলটে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চুপ ক'রে বসে থাকে বিউটির কোমরের কাছে। প্রমোদা পিসিকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে—ও পিসি, জ্ঞান ফিরিছে। তুমিই ধীরে ধীরে দুধটা খাওয়াও। কত্তাবাবু বেতবুনি যাবি।

অগত্যা মধুসূদন বলে বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ায় সান্যাল। কটমট ক'রে প্রমোদার চোখে চোখে তাকিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায়।

বেতবুনির শ্মশান তিমিরপুর থেকে প্রায় দুই ক্রোশ! বেশিও হতে পারে।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত। রাত ন'টায় সাড়ে ন'টায় চারদিকে নিশুতি! একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। গাছগাছালিতে কষ্টিপাথরের রংমাখা।

শুনশান্ পথ ধরে দ্রুতবেগে হেঁটে চলে সান্যাল। আধ মাইল পথ সে অনায়াসে পার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দু'একজন মানুষেরও সন্ধান মিলছে। দু'পাশে ছড়ানো-ছেটানো ঘর বাড়িও। কিন্তু তারপরেই ফাঁকা মাঠ। আবাদি জমি। কোথাও কোথাও খেজুর গাছ। শন ক্ষেত। রবিশস্য তো এবার মাঠেই চোদ্দ আনা পুড়ে গেছে। সেসব নাড়া বিচুলি এখনো মাঠেই পড়ে আছে। দু'একটা ক্ষেতে আগুন দিয়ে পোড়ানো। লাঙল পড়েনি। বৃষ্টি নেই যে!

সান্যাল যত এগোয়, ততই সে দিকহারা হয়ে পড়ে। সে অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে একটা হোগলা বনের ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিভ্রম কাটলে ত্রস্তে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠ বরাবর হাঁটা দেয়। কিন্তু সে প্রায় দিশেহারা তখন। ডানদিকে- বাঁ দিকে কেবল হোগলা বন। শুকিয়ে খড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বহুদিন আগে দু'একবার বেতবুনির শ্মশানে গিয়েছিলো। তখন দলের সঙ্গে ছিলো। সেও বোধহয় অন্যপথ দিয়ে। কিংবা হতে পারে এই পথই। এখন কিছুতেই ঠাহর করতে পারছে না।

জনবসতিহীন এ কোথায় সে এলো বুঝতে পারে না। এবং হাঁটতে হাঁটতে সে শেষ পর্যন্ত ছুটতে আরম্ভ করলো। না, কোনো সাড়া শব্দ নেই শ্মশান যাত্রীদের। কীর্তনের আওয়াজও শোনা যায় না। কতদূর এগুলো ওরা?

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, হোগলা বনের ভেতর দিয়ে কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। খুবই সন্তর্পণে। তাই কি? ছ্যাৎ ক'রে ওঠে বুক। একটা

ভয়ের শিহরণ রক্তস্রোতে বয়ে যায়। কান পেতে ডানদিকের হোগলাবনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো সাড়া-শব্দ পায় না। তার মনে হলো, এসব তার মনের ভুল। আর সব থেকে বড় ভুল বিউটির সঙ্গে সময় কাটাতে যাওয়া। নিজের ওপরে ভীষণ রাগ হয়। নির্বোধের মতো আজ কেন সে বিউটির সঙ্গে অভিনয় ক'রে সময় নষ্ট করলো। শ্মশানযাত্রীরাই বা কি মনে করলো? হারুটাতো যা মনে করার করেছেই। একেক সময় কেন যে এরকম মতিভ্রম হয়। বিউটিও কি কম। অতটা করারই বা কি দরকার ছিলো। লোকজন যে খুব একটা বিশ্বাস করেছে, তাও তো কারো চোখ মুখ দেখে মনে হয়নি। হারুর নিস্পৃহ মুখ চোখেও কি রকম একটা বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠেছিলো। ভেতরে ভেতরে ও নিশ্চয়ই তাদের মুণ্ডুপাত করছিলো। কি যে মোহ বিউটিকে ঘিরে। এতদিন তো ওকে সবরকম ক'রে ভোগ করেছে। তিল তিল ক'রে তিলোত্তমার নির্যাস যা ছিলো তার সবটাই শুষে নিংড়ে নিয়েছে। তবু ওকে ছাড়া যায় না। ছাড়তে পারে না। লোকে যে আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে ইশারায়—নানা ইঙ্গিত করে, হাসে, টিপপুনি কাটে—অথচ সামনা সামনি তারা সতর্ক, সবই তো বোঝে সে। একেকবার মনেও হয়েছে, না, আর না যথেষ্ট হয়েছে। বিউটির যা দেবার ছিলো-উজাড় ক'রে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিবেদন করেছে....

তবু, বারবার অদৃশ্য হাতছানিতে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেছে। মনে হয়েছে নিষিদ্ধ প্রেমের মতো এতো আকর্ষণ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এ হলো সব পাওয়ার বড় পাওয়া....। এখন এই যে পথহারানোর দুর্বিষহ যন্ত্রণা...।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি, অনেকটা কুসুমকুমারীর মতো—হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে খুব দ্রুতবেগে সরে গেলো ডানদিকের হোগলা বনের ভেতরে।

চেঁচিয়ে ওঠে সান্যাল—কে? কে? কে

না। কেউ না। তারই মনের ভুল।

আবার হোগলা বনে একটা সরসর্ আওয়াজ। কে যেন ঠিক মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে হোগলা গাছ-গুলোকে দলিত মথিত করতে লাগলো।

কে? কে?

নিশ্চুপ হয়ে গেলো হোগলা গাছগুলো।

খুব ভয় পেয়ে গেলো সান্যাল। তার মাথার ভেতরে ভয়ের পোকা ঢুকে তাকে কামড়াতে লাগলো। ক্রমে তা ঘাড় বেয়ে-বুকে পিঠে নামতে নামতে

কোমর চাপিয়ে হাঁটুতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সৃষ্টি করলো। তবে কি কুসুমকুমারী তাকে অনুসরণ করছে প্রেতাত্মা হয়ে? প্রতিশোধ নিতে চায়? কেন?

হাওয়ায় শব্দ বাজে ফিস্‌ফিসিয়ে—জানের বদ্‌লা জান।

না। না।

মানুষ খুন হলে সে প্রেতে রূপান্তরিত হয়? কুসুম কুমারীকে তো এই পথ দিয়েই ঘণ্টাখানেক আগে শ্মশানে নিয়ে গেছে। এখনো দাহ হয়নি। সান্যালের মনে হলো কে যেন তার চুল ধরে টান দিলো পেছন থেকে। সে চিৎকার ক'রে উঠলো ভয়ে। মাথায় হাত দিয়ে দেখলো একটা ফড়িং।

যাক! ফড়িং।

রাম-রাম-রাম। একমনে রাম নাম জপ করতে করতে দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলো সান্যাল। আর উচ্চস্বরে গাইতে লাগলো—একবার রাম নাম নিলে যত পাপ হরে / জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? রামনাম কেবলম্‌। রামনাম সাচ্চা হ্যায়।

কে?

ঝুর ঝুর ক'রে একটা মাটির ড্যালা ঠিক যেন হোগ্‌লার বন থেকে উড়ে এসে সান্যালের সামনে ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো। খানিকটা তার গায়ে মাথায় লাগে। শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে এক অশরীরি আবেষ্টনিতে ভারী হয়ে ওঠে। তার পায়ের শক্তি নিঃশেস হয়ে আসে।

পা কাঁপে। তবুও ছুটতে থাকে। ছুটতে থাকে। রামনাম ভুল হয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে—না, না, আমি মারি নাই কুসুম কুমারীরে। আমি মারি নাই। ছোটে। উন্মাদের মতো। হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুক্‌ শব্দ হাতুড়ির ঘা হয়ে দম ফুরিয়ে আসে।

তবুও ছোটে।

ছুটতে ছুটতে বলে, হে ভগবান! হে মা কালী! হে মা অসুর নাশিনী! আমারে বাঁচাও। আমি নির্দোষ। বাঁচাও।

কেডা তুমি? কেডা? আমারে ভয় ড্যাখাও? হোগ্‌লা ক্ষ্যাত উথাল-পাথাল কৈরে কেডা তুমি ছুইটে আসো আমার পিছন পিছন?

চিৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে সান্যাল—কেডা তুমি? তুমারে দেখা যায় না ক্যান্‌?

ফুরিয়ে আসে হোগ্‌লা বন। সামনে বিস্তীর্ণ পোড়া ফসলের মাঠ। শক্তিহীন, নিস্তেজ সান্যালের আর এক কদমও এগুবার ক্ষমতা নেই। সে

কাঁপতে কাঁপতে, জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বসে পড়ে পোড়া-নাড়া-বিচুলির ওপর।

সামনে জনবসতির সাড়া। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শোনা যায়। এক-বিন্দু আলোর ঝিলিক চোখে পড়ে সান্যালের। আছে, মানুষ আছে ওখানে। আর একবার তাকে ছুটতে হবে। শক্তি সঞ্চয় ক'রে উঠে দাঁড়াতে হবে। যতই তার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ুক, হৃৎপিণ্ড ফেটে যাক....শেষবারের মতো ছুটে গিয়ে ওই আলোর কাছে পৌঁছুতেই হবে তাকে। জীবনের এই প্রথম তার কাছে কুকুরের ডাককে খুব প্রিয় মনে হয়। যেখানে লোকালয়, মানুষের বসতি, কুকুরের অস্তিত্বও তো সেখানেই। কুকুর মানেই মানুষ! মানুষ মানেই কুকুর!

গলা-বুক শুকিয়ে তো কাঠ। হাঁপাতে হাঁপাতে, তাড়া খাওয়া কুকুরের তৃষ্ণার্ত জিভের মতো এখন তার জিভটাও ঠোঁট গলিয়ে বেরিয়ে আসে। হাঁ ক'রে ধুঁকতে ধুঁকতে শ্বাস নিতে নিতে পার হয়ে আসা হোগ্‌লা বনের দিকে তাকায়। তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এখন ভয় থেকে তার মুক্তি। সামনে আলোর বিন্দু। নদী তীর। বেতবুনির শ্মশানও ওর কাছে-পিঠে। ওই আলোর ঝিলিক কি শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার আগুনের?

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই আর সিগারেট বের ক'রে যেই মাত্র বারুদের ওপরে দে'শলাইয়ের কাঠিটা ঠুকতে যাবে...ওখুনি ঘটনাটা ঘটলো।

কালো কাপড়ের মুখোশ পরা ভঁ ়াকায় এক দস্যু, হাতে তার উদ্যত বিশালাকারের ভোজালি অন্ধকারে ঝিলিক দিচ্ছে।

সান্যালের প্রথমে মনে হলো, এও তার মনের দুর্বলতা। চোখের ভুল। সে কাঠিটা ঠুকে দিলো দে'শলাইয়ের বারুদে।

খস্‌স্‌ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো..। সেই আলোয় সে দেখলো কালো-মুখোশধারীর বিশাল ছায়াটা দুলে উঠলো নাড়া-বিচুলির ওপর।

: সান্যাল—!

: কেডা? হাত থেকে টুপ ক'রে দে'শলাই' আর সিগারেট খসে পড়ে যায় নাড়া-বিচুলির মাঠে। একটা অবিশ্বাস্য ভরসায় সান্যাল কথা বলে ওঠে—সমিরুদ্দী! হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতি পারছি। খুব চিনতি পারছি। বলে আনন্দে হা-হা ক'রে হাসে দীপক সান্যাল—মিছিমিছি আমার সাহস পরীক্ষা করিতিছো? ওহ্‌, খুব চমকায়া দিছিলে। চলো-চলো-কোন্‌দিক দিয়্যা যাতি হবে....।

আমি কি ছাই পথ ঘাট চিনি নাকি। এই বলে সান্যাল হাঁটতে শুরু করে— তাই তো কই, সমিরুদ্দী ছাড়া এই বেশাল শরীর কার আছে সাত গিরামে ?

চাপা স্বরে পেছনের মুখোশধারী গর্জে ওঠে—আমি কুসুম কুমারীর প্রেতাত্মা। খাড়াও।

: কি ?

চমকে, থমকে দাঁড়িয়ে যায় দীপক সান্যাল।

মুখোশধারী বলে—আমি তোর যম।

: না। এই সমীর। ধের। ভয় ছাখাও ক্যা। ধরো সিগারেট খাও। তাড়াতাড়ি চলো।

: আগে তোর রক্ত খাই। পরে যাবো শ্মশানে। তোরে নিয়্যা যাতি হবে।

: না। এই সমিরুদ্দী ভাই ! আপনে ভোজালিডা নামান। বলে হাসতে চেষ্টা করে দীপক সান্যাল।

: সাইন্যালবাবু !

: কেডা ? কেডা ? তুমি কেডা ?

পিছু হটতে হটতে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সান্যাল—হারু। তুই হারু। আমার প্রাণের বন্ধু। অ্যাতোক্ষণ সমিরুদ্দীর পিছনে লুকিয়ে ছিলি ক্যা ? শ্মশানে যাইস নাই ক্যা ? বউদির মুখে আগুন দিবি কিডা ?

হাহা ক'রে হেসে ওঠে হারুমণ্ডল। ফাঁকা মাঠে সে হাসি বহুদূরে, হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তারপর অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড করলো সে। ছুটে এসে গোল পোস্টের কাছ থেকে ব্যাকাসের মতো কিক করলো হারু মণ্ডল—ঠিক সান্যালের তলপেটে।

চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে, ঘুরপাক খেতে খেতে—হঠাৎ থেমে ছুটতে শুরু করলো দীপক সান্যাল। তার পেছনে সেই কালো মুখোশধারী তীব্র বেগে এগিয়ে গেলো।

চলন্ত অবস্থায় ভোজালির অব্যর্থ কোপটা ঠিক ঘাড়ের পেছনে গিয়ে আঘাত করলো। চোখের পলকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো সান্যালের মুণ্ডুটা ধর থেকে। আর ছুটন্ত সান্যালের কবন্ধ দেহটা আশ্চর্যজনকভাবে চার-পাঁচ গজ ছুটে গেলো। তারপর ধপাস ক'রে পড়ে গেলো মাটিতে। কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলো মুণ্ডুহীন দেহটা-বেতবুনির শ্মশান-পথে'

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পড়েছিলেন / ছাতিম গাছের বড় পাতাটির নিচে…

কি আছে ছাতিম গাছের বড় পাতাটির নিচে? পাখি? পাখির বাসা? জীবন? জীবনের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস? দমকা হাওয়ায় ফুলে ওঠা পালের গভীরতা?

সেই প্রিয় ছাতিম গাছটাও কেটে ফেলছেন জাফর কাজী। বাঁশ বাগান উজাড়। বড় আম গাছ দুটি, গোটা দুই হিজল, কত ফুল বর্ষায় সোঁদা গন্ধের মৌ ছড়াতো, আম্র মঞ্জরিতে মৌমাছির গুন্ গুন্ গান গেয়ে চাক তৈরির খেলা… সব নিজের হাতে নিশ্চিহ্ন করেছেন। কুড়োলের একটা একটা কোপে—পাঁজরের একটা একটা হাড় যেন স্থানচ্যুত হয়েছে।

মামুদাদার চেলারা সর্বত্র প্রেতনৃত্যের উৎকট তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে।

বিরান হয়ে গেছে চব্বিশ পরগনার আগুন ঝরানো ছেলেদের চারণভূমি। ফেরারী-খাদ্যহীন, বাসস্থানহীন, নিরাপত্তাহীন জীবনটাকে নিয়ে তারা কে কোথায় ছিটকে সরে রয়েছে।

শুধু মৃত্যুর খবর। ধ্বংসের খবর।

লাল ঝাণ্ডার সাথে লাল ঝাণ্ডার বিরোধ। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত।

এ এক চরম নৈরাজ্য।

প্রচণ্ড অস্থির সময়।

জাফর কাজী ভাবেন। ভাবতে ভাবতে কূল পান না। কিনারা পান না। উড়ো খবরে তার প্রাণ আই-ঢাই করে। কেন, লাল ঝাণ্ডা—কেন লাল ঝাণ্ডার বিরোধিতা করে? ওরা যদি বেরিয়ে গিয়ে ওদের ভাবনায় সমাজ বদলের লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, তো যাক না। তাতে দোষের কি। বরং তাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো—তাদের মূল লক্ষ্যটাকে সমর্থন করেও তো শুধরে দেওয়া যায়। আন্তরিকভাবেই করা যায়।

নিজেদের এই রক্তাক্ত হানাহানিতে মামুদারা সুযোগ নিচ্ছে। বেরিয়ে যাওয়া অংশকে নির্মূল করার কাজে তারা আরও সাহসী হয়ে উঠছে।

হোক। এই সবই হোক। নির্মূল হোক। ধ্বংস হোক।

মামুদাদেরই চেলাদের প্রেত নৃত্যের পরিধি বাড়ুক। একদিন এই জন্যে পরস্পরবিরোধী লাল ঝাণ্ডারা যখন আফসোস করবে, তখন কারোই পায়ের নিচে মাটি থাকবে না। সে সময় তৃতীয় কোনো শক্তির সাচ্চা রক্তের অনুপ্রাণে সমৃদ্ধ হবে সমাজবদলের গতিধারা।

পেটটা এত ছোট। তবু তাকে ভরিয়ে রাখা যায় না। গাছ-গাছালি-ফল-ফসল সবকিছু লোপাট হয়ে যায়। লোপাট হয়ে যায় ইজ্জৎ আব্রু। মানুষের ব্যক্তিত্বও।

ছাতিম গাছটা তার খুব প্রিয়। এর ছায়ায় কতদিন বসেছেন। ওদিকে মসজিদের সামনের পুকুর ঘাটে কোনোদিনও তিনি বসেননি। বাড়ির এদিকটায়, পেছনেই এটা, ছাতিমের কিছুটা দূরেই দক্ষিণের মাঠ বলো, দিঘি বলো, হ্রদ বলো, তার শুরু। এখানে বর্ষায় বসতেন। দেখতেন তার রূপ-অরূপের খেলা। মাছেদের ভাসান দেয়া মুখ। লেজের দাপট। তাদের রূপালি শরীরের খেলা।

ছাতিম গাছটায় তখনো দুটো টুনটুনিপাখি টুং টুং ক'রে ডাকছে। কি বলছে ওরা? কি বলছে? কাজী তুমিও? বাসস্থান ভেঙে দেয়ার খেলায় তুমিও নাম লিখিয়েছো? ভাবতে ভাবতেই জীবনানন্দ দাশের কবিতা মনে পড়ে গিয়েছিলো।

সকালের রোদ্দুর তখনো তাতিয়ে দেয়নি খরার দুপুরের মতো প্রকৃতিকে।

দক্ষিণের মাঠের গোল্লা পাকানো হাওয়ার ঘূর্ণিতে একটা গানের সুর শুনতে পেয়ে তাকালেন। চেনা সুর যে! হাওয়ার জোর কমলে দেখলেন সেই তিনি।

ঈশ্বর।

গেরুয়া বসন। একতারা। কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি।

কুড়োলটা রেখে দিলেন কাজী। আর গামছায় মুখ ঘাড় মুছতে মুছতে বসলেন রোদপোড়া ঘাসের শক্ত শরীরে।

ঈশ্বর এগোয় তার আগে আগে এগোয় তার বাউল সুর। সুরের কথা। তার পশ্চাৎঘেরা রাশি রাশি কৃষ্ণচূড়ার চালচিত্র। কাজী কবি হয়ে ওঠেন নিষ্ঠুর প্রকৃতি আর সংহাররূপী সমাজের সেই গেরুয়া প্রচ্ছায়ায়, তার ঠোঁটে হাসি ফোটে।

জান পাখি তুই রইলিরে মনে।
আমি খুঁজলাম তোরে অচিন বনে
ওরে ঠিকানাহীন জনে জনে···রে
শুধাই তুমি রও কোন্‌খানে··· ?
স্বজন সে মন নিখোঁজ রইলে
প্রাণ পিঞ্জরে সঙ্গোপনে।

: ঈশ্বর দাদা। ও ঈশ্বর দাদা। এই যে, এইখেনে গো। হাত তুলে ডাকলেন কাজী।

ধুলোয় ধূসর ঈশ্বরের বাবড়ি চুলের ঝাঁকরা মাথা। একমুখ হাসি তার।

প্রাণখোলা। তার হাসি দেখলে তার মনের কথা বোঝা যায়। এ হাসি আর কারো মুখে কোনোদিন দেখেননি কাজী। শিশুরা হাসে। হাসতে পারে। ঈশ্বরের মতো বয়সের মানুষ হাসে না। হাসতে পারে না। তাদের হাসি ইতিহাসের পাতায়, ভারতের সংবিধানের পাতায় হারিয়ে গেছে।

ঈশ্বর হাসতে হাসতে একতারাটা কোলের ওপরে রেখে বসে পড়ে মাটিতে। ধুলোয়-ঘামে-মাখামাখি তার রোদপোড়া তামাটে হয়ে যাওয়া ফর্সা মুখখানা।

: ক্যামন আছো গো কাজী দা! বউদি ক্যামন?

: কি কবো? নজরুলের কথাটা উল্টা কৈরে কলি কতি হয়—বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি···।

শুনে হাহা ক'রে হেসে ওঠে ঈশ্বর—ফাস্‌কিলাস, ফাস্‌কিলাস। কাজীদা নামডা তুমার দেখতিছি কাঠে কাঠে মিলে গিছে গো।

: তুমার কি খবর?

: আছে। জোর খবর আছে। এট্টু জিরায়ে নেই আগে।

: জিরাও।

দু'জনের কথায় ছেদ পড়ে। কাজী দে'শলাই বিড়ি এগিয়ে দেন ঈশ্বরের দিকে। নিজেও একটা ঠোঁটে চেপে ধরেন। ঈশ্বর যেন আকাশ থেকে পড়ে। বিস্ফারিত দু'চোখে তাকিয়ে থাকে কাজীর মুখের দিকে। সেখানে এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের ছায়া খোঁজে সে। সেই অমলীন জ্যোতির্ময় দুটি চোখ। সেই প্রশস্ত কপাল। কপালের পরিশ্রমি ভাঁজ। যেন দিগন্তে বলাকার চিরল চিরল পাখার টান। পুরু ঠোঁটে অকম্প্র প্রত্যয়। ঘন ভুরুতে ধনুকের বাঁক। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। হাওয়ায় হাল্‌কা মেঘের মতো ওড়ে।

: হ্যাঁ আমার বিশ্বাস হয় না।

: যান্ত্রিক গতির যুগে মানুষের কোমল মন-মানসিকতা তো অনেকদিন আগে হারায়া গিছে ঈশ্বর দা। গতি বাইড়ছে। মানুষের যন্ত্রণাও বাইড়ছে। য্যাতো আধুনিক আবিষ্কার হতিছে, ত্যাতোই মানুষের টেনশন বাড়তিছে। তুমি-আমি সেই যন্ত্রণা, সেই টেনশনের আওতায়···। আর অন্য দ্যাশে মানুষ যখন সমাজ বদলাতিছে, আমরা তখন গোড়ামির কবরে সেধিয়ে যাতিছি। তারা ক্ষিদের জন্যি, চিকিচ্ছের জন্যি, বাসস্থানের জন্যি আর অদৃষ্টের উপুরে নির্ভর করে নাকো। আমরা তো অদৃষ্টকেই দোষ দেই। দিতিছি। দেবোও। এই শ্যাষ বয়সে তাই প্যাটে ভাত নাই, কিন্তুক নেশা ধৈরতি হৈলো। চিন্তা-ভাবনার পাহাড় বড় ভারী গো ঈশ্বর দাদা। নেশা করলি খানিকটা য্যান্ হালকা থাকি।

বেশ লম্বা ব্যাখ্যা দিয়ে কাজী হাসলেন। ঈশ্বরের মাথা নাড়া দেখে বোঝা গেলো, যুক্তিটা তারও মনোঃপুত হয়েছে। সে তখন দে'শলাই জ্বালিয়ে নিজে বিড়ি ধরালো, কাজীকেও ধরিয়ে দিলো। বিড়ির ধেঁায়ায় ঈশ্বর তাকালো দূরে।

কেন, এতো কৃষ্ণচূড়ার বাহার কেন? রক্তের মতো লালই বা কেন তার রং? পাতায় অতো সবুজ। ধূসর ডালপালা। তার ফুল একেবারে বিপরীত। এই খরায়, এই মাটি-ফাটা উত্তাপে তার রঙে কোনো মালিন্য নেই। হয়তো উত্তাপে উত্তাপে তার রঙের রোশনাই বেড়ে যায়। আগুন ঝরিয়ে যে ফোটে।

দক্ষিণ মাঠের এই দিকটায় নামি। নিচু। তাই হাঁটু সমান জল এখনো বড় একটা পুকুরের সমান জায়গা নিয়ে, বুকভরা কচুরি পানায় খাবি খাচ্ছে প্রচণ্ড খরায়।

ঈশ্বরের চোখ পড়ে ছাতিম গাছটার দিকে। সিকি পরিমাণ খোবলানো গুঁড়ি। সে অবাক হয় আবারও। খুব শান্ত কণ্ঠে বলে—কাটতিছিলে গাছটা?

: হ্যাঁ।

: কি জন্যি?

: কাজ আছে।

: ছাতিম গাছে কিসির কাজ?

: গাছটা লাকড়ি কৈরে বেচলি—চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পাবো।

: কি?

সেইসময় মজনু এসে দাঁড়ায়। কাজীর হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দেয়। কাজী তাড়াতাড়ি সেটা কোমরের খুঁটে গুঁজে রেখে মজনুকেই বলেন—ঘরে মুড়ি আছে। প্যাজ লঙ্কা দিয়্যা বানায়্যা নিয়্যা আয় দেখি। ঈশ্বরদা আইছে।

বাধা দেয় ঈশ্বর—না মুড়ি আমার দরকার নাই। খুব গম্ভীর দেখায় তাকে।

কাজী জোর দিয়ে বলেন—তুই যাতো।

মজনু চলে যায়।

ঈশ্বর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ দেখে। পেঁজা তুলোর মতো হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাচ্ছে। মেঘের গায়ে একটুও কালির ছোঁয়া নেই। ধু ধু সাদা। দেখে তার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে। তার চেহারাটাই বদলে যেতে যেতে—বুক খালি ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে। ভীষণ দুঃখি মনে হয় ঈশ্বরকে এসময়।

: কাজী দা। মহা আকাল সামনে। মানুষ বাঁচপিনে। আবার চারদিক সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছায়া ঘোর হয়্যা আসতিছে। ফের মা-বৈনের ইজ্জৎ

লুটাবে, আব্রু নষ্ট হবে। শ্যাল্-শকুনের তো রাজত্বি চলতিছে। তখন চৈলবে রাক্ষস-খোক্কসের রমরমা বাজার।

: চিন্তায় ঘুম আসে না ঈশ্বর দা। সাধে কি বিড়ি টানি। আশার আলো কদ্দুর, তাও জানিনে। আলো যারা জ্বালাবি—তারা ঘর ছাড়া। গাঁও-গেরাম বিরান কৈরে তারা ফেরার।

ঈশ্বর গম্ভীর হয়ে, একতারাটা কোল থেকে নামিয়ে রাখে একপাশে। তারপর নিজের হাঁটুতে সক্রোধে একটা চাটি মেরে বলে—কি জন্যি আইজ গাঁও-গিরাম বিরাণ কৈরে ফেরার হতি হয়? ইয়ার পিছনে কারণ নাই মনে করো? ভুরুতে টান ওড়ে ঈশ্বরের। চোখ বড় হয়। সে চোখে রাগ—মস্ত কারণ ইয়ার কাজী দা। ধনীর ঘরের দুলালগরে হাতে যে পারের বৈঠা ধরা গো। তুমার ছেইলেরে পলাতি হইছে, আমার ভাইরে ঘর ছাড়তি হইছে, কিন্তু ধনীর দুলালগরে বাড়িতি জোর পাহারার বন্দোবস্তো কৈরছে মানুদাদা স্বয়ং। ক্যা? সমাজ বদ্লানোর লড়াই করবো—যাগরে বিরুদ্ধি জান-কবুল লড়াই, হয় তারা আমাগরে উচ্ছেদ কৈরবে, নাহয় আমরা তাগরে ধ্বংস করবো—সেই তাগরে পুলিশি পাহারায় শান্তিতে পালঙ্কে ঘুমায়া থাকপো.বউ নিয়া?

চম্‌কে ওঠেন কাজী—কি কও তুমি ঈশ্বর দা?

: কথা হে। কথা কই। লোকে কয় আমি পাগল। আমিও কই আমি পাগল। তো কিসির পাগল তা বোঝো না?

রাগে কাঁপতে থাকে ঈশ্বর। কাঁপতে কাঁপতে থু থু ক'রে থু থু ফেলে। চাদরে মুখের ঘাম মোছে। আর শিশুর মতো প্রশ্ন করেন কাজী—তোমার মাথায় কি অন্য চিন্তার খেলা ঈশ্বর দা?

: না। চিন্তা একটাই। সমাজ বদলের।

: ও।

: কাজীদা, বিপ্লবের চেহারা দেইখে মগজ গরম হয়া যায় কাজী দাদা। এই জন্যি ছদ্মবেশে সারাডা জীবন কাটাইছি? বাউল সাইজে ঘুরতিছি—হাটে-মাঠে-ঘাটে—। দিন নাই, রাইত নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ··। হুঃ। এই সব কারণে আমাগরেই তো সর্বনাশ হতিছে। দল ছাইড়ে বৈসে যাতিছে ভাল ভাল ছেলে পেলেরা। যোগ দিতিছে যারা দুই-তিন দিক থিকে মাইর খাতিছে তাগরে সাথে। তাগরে চোখ-মুখির দিক তাকান যায় না কাজীদা। ফুঁসতিছে অজগরের মতো। ঘেন্না আর রাগে দপ্ দপ্ কৈরে জ্বলে তাগরে চোখির মণি। বলতে বলতে ঈশ্বরের সমস্ত আক্রোশ যেন কাজীর ওপরে

এস্যে আছুড়ে পড়ে—হ্যাঁ, তুমি, তুমার যা ছিলো সয়-সম্পত্তি, তা দিয়্যা তুমি তোমার জীবনডা দুধে-ভাতে চালাতি পাইরতে। কি কও, পাইরতে না? এই সমাজ বদলের পোকাডা মাথায় টুক কৈরে ঢুকি গিছিলো। ছেইলেডাও বিপথে যাতি পাইরলো না তো তুমারই জন্যি। আইজ তুমার চাকরি নাই। ছেইলে ঘর ছাড়া। কি করতিছো? ছাতিম গাছের লাকড়ি বানায়া—বাজারে বেইচা প্যাটের খিদে মিটাতি হবি। ইয়ার পরে কি বেচপে? কি আছে?

কাজী মৃদু প্রতিবাদ করেন ঈশ্বরের কথায়—আমি কি করিছি? কিছুই করি নাই ঈশ্বর দা। বিপদ আমার একলারও না। ঘরে ঘরে বিপদ। পশ্চিমবাংলায়ও না শুধু। সারা দ্যাশ জুইড়ে বিপদ।

বাবড়ি চুলে খুব জোর নাড়া দিয়ে ফুঁসে ওঠে ঈশ্বর। রাগে তার তামাটে মুখ আরো তামাটে দেখায়। বাঁ হাত তীব্রভাবে নেড়ে সে থামতে বলে কাজীকে—অতো বিনয়, অতো আদিখ্যেতা দেখাতি হবে না কাজী দা। এসব আমি বুঝি। একটা জীবনের অসীম মূইল্য। জীবন তো ভুঁইফোঁড় জিনিস না! কিছু ধনীর দুলালের স্বেচ্ছাচারিতার জন্যি আমাগরে ঘরের হাজার হাজার জীবন আইজ নষ্ট হয়া যাতিছে। কেডা তাগরে আশ্রয় ছায়, কেডা খাতি ছায়, কেডা খোঁজ-খবর রাখে? কত শত সোনার টুকরো ছেলেরা রাতির আঁধারে রাস্তায় ইট মাথায় দিয়্যা পাগলের মতো ঘুমায়।

কাজী বলেন—সমাজ বদলানোর কাজ করতি গেলি এই দু:খ কষ্ট তো সৈহ্য করতিই হবি ঈশ্বরদা। আমার কথা হৈলো, পথটা ঠিক আছে নাকি—সেইডা দেখা। লৈক্ষ্য থিকে সৈরে দাঁড়াইছি কিনা-ভাল কৈরে যাচাই করা। দুঃখ কষ্টর কথা কয়া লাভ নাই।

: লাভ নাই মানে?

: তুমি একটা ব্যবস্থারে ধ্বংস করতি চাও। সেডাতো ফুল বিছানো পথে করা যায় না। তার জন্যি তো কাঁটা ছড়ানো পথ দিয়্যা হাঁটতি হবিই। রক্ত নিতি গেলি, খরচও করতি হয়।

: সে তো জানিই। আমার কথার মানে তুমি বোঝো নাই। আমি কই ধনীর দুলাল নেতাগরে নিজিগরে জীবনযাত্রার কথা। জীবনাচরণের কথা। কর্মীরা কাঁটার পথে হাঁটপে! তারা ফুলশয্যায় আরামে ঘুমাবি—তা মানা যায় না। এরকম ফারাক থাকলি—ফুলশয্যাঅলারা—কাঁটার পথে হাঁটার ভয়ে—পথের নিশানাডাই পালটায়ে দিবি।

: সেরম বিপদ আছে নাকি?

: আলবাৎ আছে। না হলি বড় একটা অংশ চৈলে যায় কি জন্যি ?

: ইতিহাসের একাকৃটা পৈর্য্যায় আসে যখন এইসব ঘটনা ঘাটতিই থাকে।

: তাই বৈলে যারা যায়, তারা মাসুদার দালাল, আর আমরা মাসুদার পুলিস পাহারায় ঘুমায়া চ্যাচাই—বহোৎ খাঁটি আমরা। সতীর সতী তস্য সতী। হেরা অসতী। ইয়ার মানে কি। বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজনায় তোৎলাতে থাকে ঈশ্বর—মানেডাও পষ্ট খুবই।

কাজী এই প্রথম ঈশ্বর বাউলকে তার রাজনৈতিক গভীরতা দিয়ে নিরীক্ষা করলেন। দেখলেন তার কথা বলার মধ্যে নতুন এক সঙ্কেত ধ্বনির স্পষ্ট গুঞ্জরণ। তার ক্রোধের পেছনে যুক্তি আছে। আবেগের পাশাপাশি আছে ঘর ছাড়তে বাধ্য হওয়া কর্মীদের প্রতি অসীম মমত্ববোধ। এযেন অন্য এক ঈশ্বর তার সামনে উপবিষ্ট। এই বাউল সেজে থাকাটা যার দীর্ঘকালীন ছদ্মবেশ। শিক্ষাগত যোগ্যতাও যে খাটো নয় তার, তাও আজ মনে হয় কাজীর। এই মুহূর্তে তিনি মনে করতে পারেন না, ঠিক কবে, কতদিন আগে ঈশ্বরকে এই তিমিরপুরে প্রথম দেখেছিলেন। কোথায় তার আসল ঠিকানা, কোন্ ঘরের ছেলে—সব ফেলে এইভাবে সমাজবদলের জন্যে সর্বত্যাগী জীবন কাটিয়ে দিলো।

: একটা কথা ঈশ্বর দা। কাজী প্রসঙ্গটা পালটে দিতে চাইলেন।

: কও হাজার কথা কও! ক্ষতি নাই। কিন্তু খাঁটি কথা শুনতি চাই তুমার মুখে।

: তাই হবি। কিন্তু একসাথে ভাত খাবো কৈল্ আইজ।

: না। আমার ঝোলায়—চিঁড়ে-গুড় আছে।

: সিডাতো ভাত না।

: কাজীদা। খাওয়ার সোময় আলি-চায়ে খায়া যাবো।

: ও। আমার সামর্থ্য নাই সেই জন্যি!

: কাজীদা তুমারে দুঃখ দেওয়া বা অপমান করা আমার উদ্দেশ্য না। না খায়া যদি চলে, আর না খায়া কি, কথায় আছে, অনাহারের থিকে চিঁড়ে খাওয়া কষা না। সাথে যখন আছেই, তালি ভাত নষ্ট করা ক্যা? সেই কথা।

কাজীর খেয়াল হয় মজনুর কথা। অনেকক্ষণ গেছে। এখনও ফিরছে না কেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে, খানিকটা এগিয়ে উঁচু গলায় হাঁক দিলেন—কিরে মজনু, আরে ওই, মুড়ি আনতি কতক্ষণ লাগেরে অ্যা?

কোনো প্রতিউত্তর ফিরে আসে না দেখে বিরক্ত হলেন কাজী। তখুনি ঈশ্বর বলে ওঠে হাসিমুখে—কি অ্যাতো হাঁক-ডাক। তুমি বৈসোতো কাজীদা।

: না। ছেইলেডা গ্যালো···

: আহা, ধরো, মুড়ি যা ভাজা ছিলো, তা ফুরায়া গিছে। হতি পারে না? মাথা নাড়লেন কাজী ধীরে ধীরে। বিষণ্ণ দেখায় তাকে। মনে পড়ে যায়, মুড়ি ছিলো না বলে আজ সকাল থেকে কিছু খাননি তিনিও। ঘরে কিছু মিষ্টি আলু ছিলো, নসিরণ সেদ্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলো। তিনি নিষেধ করেছেন পেটের ব্যথার অজুহাত দিয়ে।

: ঠিকই। মুড়ি নাই। বিড়বিড় ক'রে বললেন কাজী।

: না থাকে, না থাকুক। বৈসো তো কাজী দা তুমি। চিঁড়ে-গুড় খাই আইসো।

: তুমি খাও।

: তুমিও খাও।

: না। না।

হেসে হেসে ঈশ্বর কাজীর বিষণ্ণতা কাটাতে চায়—কাজীদা, আমাগরে তো মৈধ্যবিত্তগরে মতো ঠুন্‌কা অভিমান মানায় না। তুমি এখন চাষী। দিনমজুর। আমার তো চাল-চুলা কিছুই নাই গো। নিজিগরে কাছে মান-সম্মানের কি আছে কও?

কাজী তার বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারলেন না। বললেন—তা ঠিক। কিন্তুক তুমারে চারডে মুড়ি খাওয়াতি পারলেম না।

হাহা ক'রে প্রতিবাদ করে ঈশ্বর—চুপ, কাজীদা চুপ। একি কথা তুমার কও দেখি। না, না, এরম করলি আমি আর আসপো না কতিছি।

কাজী আবার বিড়ি ধরালেন। ঈশ্বরকেও দিলেন। তারপর ফ্যাকাসে হাসি হাসলেন—দুঃখ হয়।

: কিসির আবার দুঃখ? এই তো খানিক আগেই আমার কথার প্রতিবাদ কৈরলে? সমাজবদলের পথে কাঁটা থাকপিই। দুঃখ-কষ্টও হবি। তো আমারে মুড়ি না দিতি পেরে কষ্ট কিসির? বলি আমি কি রাজা-গজা নাকি?

: যাও ছিলো, হারু মণ্ডলের জন্যি সব নষ্টা হয়া গ্যালো।

: একটা কথা কৈ কাজী দা?

: কি?

: হারু মণ্ডলের শ্যাষ ব্যবস্থাডা করা যায় না?

চম্‌কে ওঠেন কাজী। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—কিসির ব্যবস্থা?

: দীপক সান্যালের মতো? কথাটা ভুম ক'রে বলে ফেলে ঈশ্বর।

আর সবেগে মাথা নাড়েন কাজী—না এসব ভাল কথা না।

ঈশ্বরের চোখে কৌতুহল—ভাল কথা তালি কোন্‌ডা? মণ্ডলের শত অত্যাচার মাথা পাতি নিতি হবি?

: সে আমি কি কবো।

: তালি কেডা কবে?

: যারা দায়িত্বে আছে।

: কাজীদা। আমরা কিন্তুক সবরমতী আশ্রমের ছাগলঅলা বুড়ো না। নন্‌ কো-অপারেশনের কথা কয়া, বাংলার বিপ্লবীগরে চরকা দিয়্যা ভুলায়ে-ভালায়ে 'স্বদেশী' বানাইনে, আর নিজির রাজ্য গুজরাটের ধনীগরে তলে তলে কাপড়ের মিল বানাতি মন্তর দেইনে। আমরা অহিংসের নামাবলীও গায় লটকাইনে। আমাগরে ধর্ম কও, আদর্শ কও, তার আসল কথা, উগ্র বলপ্রয়োগ কৈরে ক্ষমতা দখল করা। তার মূলে থাকপি—সহিংস শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি। তাই মণ্ডলের শ্যাষ ব্যবস্থার কথা কয়া আমি কুনো অন্যায় কথা কই নাই।

কাজী মনে মনে নমস্কার করেন ঈশ্বরকে। হে ঈশ্বর। এ তোমার কোন্‌ রূপ: এ সব কথা তুমি জানো—তাতো তুমি কোনোদিন বুঝতে দাওনি। শুধু মেলামেশা করেছো মুকুন্দ সাহার সঙ্গে। হারু মণ্ডলদের দু'চোখে দেখতে পারতে না। এই দেখতাম তুমি তিমিরপুরে ঘুরছো, ফিরছো, গান গাইছো, তোমার গান শুনে মনে হতো, সেসব বুঝি আধ্যাত্মিক গান। কিন্তু তাতো না। সুরটা ধান-মাটির। বাউল ফকিরের গন্ধ ছড়ানো। কিন্তু সুরের ভেতরে যে কথা, তাতে আছে জেগে ওঠার আহ্বান। চেনা জানার কথা। আবার সেই তুমি নেই তো নেই। উধাও। দু'তিনমাস কোনো খোঁজ খবর নেই। আবার একদিন একতারা বাজিয়ে-হেলে-দুলে গান গাইতে গাইতে এসে হাজির—এই তিমিরপুরে।

আপন মনে কি যেন বিড বিড করতে থাকে ঈশ্বর। ভুরুর মাঝখানে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। ত্রিশূলের মতো ভাঁজ। হঠাৎ ঝোলার ভেতর থেকে একগোছা ছোট আকারের ছাপানো কাগজ বের ক'রে দিলো কাজীর সামনে। গম্ভীর মুখ—সৈকত পাঠাইছে। গোপনে বিলি করতি কইছে।

: কি এগুলা?

: লিফলেট। পৈড়ে ছাখো। য্যাতোদূর জানি, হারু মণ্ডল, রঙ্গলাল দাগা, থানার ওসির এ হৈল মৃত্যুবান। ধরা পৈড়লে তুমারেও মর্গে পাঠাবে।

: ও।

: সাইন্যালের খুন হওয়ার কথা আছে। মণ্ডলের ছোট রানীরে দিয়্যা বড় বউরে খুন করাইছিলো সাইন্যাল। মণ্ডলও শ্মশানের পথে সাইন্যালরে খতম করাইছে। বড় বউর বদলা না। সাইন্যালরে খতম না করলি মণ্ডলই খতম হয়া য্যাতো। দাগা—ওই শালো মাড়োয়ারীগরে তো একটাই ধর্ম—বেইমানী করা। সিরাজদ্দৌলারে হারাতি পারে, ক্লাইভের বাবারও ক্ষ্যামতা ছিলো না। ওই জগৎশেঠ শালো মেরো, বেইমানী কৈরলো। মীরজাফর তো একটা পুতুল। আসল চাবি-কাঠি ছিলো ওই শেঠ ব্যাটার হাতে। তো রঙ্গলাল দাগা, শালোর বুদ্ধিতে মণ্ডল থানার ওসির সঙ্গে লাইন কৈরে মামুদারে ধৈরছে। দীপক সাইন্যালের হৈত্যার দায়-দায়িত্ব চাপায়ে দিছে লালঝাণ্ডাগরে উপুর। উরা দ্বিতীয়বার তিমিরপুরে অ্যাকশন চালাবি, কবে চালাবি সেই খবর আমি জোগাড় কৈরে দেবো।

: তাহলি ?

: হু। খুব সাবধান কাজীদা। ভোমার দলটা এখন নিজিগরে দলেরই হায়ার করা মস্তান পার্টি। পয়সা নিয়্যা কাজ করে। মামুদার সাথেও হট্ লাইন ভোমার। চব্বিশ পরগনায় য্যাতো খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, তার নায়ক এই ভোমা। সব থানায় তার হাত। থানার বড় দারোগা, মেজো দারোগা ভোমারেই সেলুট মারে। উলটে চা-সিগরেট খাওয়ায়। পুলিস দিয়্যা ভোমার অ্যাকশানে সাহায্য করে।

কাজী মনোযোগ দিয়ে লিফলেট পড়তে লাগলেন।

হঠাৎ মজনুকে ছুটে আসতে দেখে ঈশ্বর বলে ওঠে—কাগজ লুকাও কাজীদা!

মজনু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দেয়—চাচা, থানার মেজোবাবু, আরো দুইতিনজন, সাথে মসজিদের ইমাম সাহেবও আছে—এদিকেই আসতিছে।

শোনামাত্র লিফলেটগুলো নিজের ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে আপনমনে গান ধরে ঈশ্বর বাউল—

জ্ঞান পাখি তুই রইলিরে মনে
আমি খুঁজলাম তোরে অচিন বনে
ওরে ঠিকানাহীন জনে জনে···রে
শুধাই তুমি রও কোন্খানে · ?
স্বজন সে মন নিখোঁজ রইলে
প্রাণ পিঞ্জরে সঙ্গোপনে।

আর শ্রোতা তো তখন দু'জন। কাজী আর মজনু। কাজী দক্ষিণের মাঠের দিকে তাকিয়ে যেন নিবিষ্ট মনে গান শুনছিলেন। এবং তিনি বুঝতে পারলেন একটা বড় জটলা তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঈশ্বরও চোখ বুজে গেয়ে চলেছে গান। সে থামতেই কাজী বলে উঠলেন—আহা, বড়ই ভাল কথা। বড়ই মধুর সুর। তুমিই আসল বাউল-ফকির গো ঈশ্বর দাদা।

পেছন থেকে মেজোবাবু হাঁক দিয়ে ওঠে—কাজী সাহেব।

যেন চমকে উঠেছেন কাজী। দ্রুত পেছন ফিরে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি—আরে, আপনেরা। ওই মজনু, কনে বৈসতে দেই ক'দেখি। যা তো থান তুই টুল নিয়্যা আয়।

: টুল ফুলের দরকার নেই।

মজনু থমকে দাঁড়ায়। ঈশ্বরও একমনে তার একতারার তারে আঙুল বুলিয়ে, টুং টুং আওয়াজ তুলে চাবিতে মোচড় দেয়।

মেজো দারোগা তাকে লক্ষ্য করে। হাতের রুলটা নাচিয়ে নাচিয়ে কাজীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন—আপনার বিরুদ্ধে এলিগেশন আছে। দেড় বিঘের এই ভিটে-বাড়ি-বাগান, ছ'মাস আগে আপনি হারানবাবুর কাছে বিক্রি করেছেন। টাকা নিয়েছেন সাত হাজার। দলিলে লেখা আছে মোট দাম ন'হাজার। রেজিষ্ট্রি করার সময় বাকি দু'হাজার টাকা আপনি পাবেন। তিনমাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি করার কথা ছিলো। আপনি···

কাজী উত্তেজিতভাবে কিছু একট, বলতে যাচ্ছিলেন। তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। মেজোবাবু—চুপ করুন আপনি। আমি যা বলছি শুনুন। দলিলে লেখা আছে, তিনমাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি ক'রে দিতে আপনি রাজি না হলে, বা কোনোরকম বাদ সাধলে, আইন অনুসারে এই দেড় বিঘে ভিটে বাড়ি, গাছ-গাছালি-স্থাবর সমস্ত সম্পত্তি হারানবাবুর মালিকানায় বর্তাবে। এ নিয়ে আপনি নিজেই দলিলের বয়ানে সম্মত হয়েছেন যে, কোর্টে বিধিসম্মত কোনো অভিযোগ দায়ের করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তারপর মাননীয় সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে আপনি সুস্থ মস্তিষ্কে দলিলে স্বাক্ষর করেছেন। মাননীয় স্বাক্ষীগণও স্বাক্ষর করেছেন আপনারই উপস্থিতিতে। হ্যাঁ, একনম্বর সাক্ষী সর্বজনমান্য মসজিদের ইমাম সাহেব। কি ইমাম সাহেব? মেজোবাবু ইমাম সাহেবের মুখের দিকে তাকান।

ইমাম সাহেব দ্রুতবেগে মাথা নেড়ে বলেন—আল্‌হামদোলিল্লাহ্। হাঁ, আমার সামনেই দলিলে সই দিছিলেন কাজী সাহেব।

কাজী হতভম্ব হয়ে তাকালেন ইমাম সাহেবের মুখের দিকে।

ঈশ্বর বাউলের যুগল ভুরুর মাঝখানে হিংস্র ত্রিশূলের ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মজনু বজ্রাহত হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে একবার কাজীর দিকে, একবার ইমাম সাহেবের দিকে, একবার মেজো দারোগার দিকে তাকায়।

মেজোবাবুই মৌনতা ভাঙে আবার—দ্বিতীয় সাক্ষী সেটেলমেণ্ট অফিসের ছোট-বাবু—কুঞ্জপদ দাস। রামেশ্বরপুর বাজারের বিরাট ব্যবসায়ী নিরাপদ দাসের ছোট ভাই। কি কুঞ্জপদবাবু?

কুঞ্জপদ দাস থতমত খেয়ে দ্রুতবেগে বলতে থাকে—আমি তো আসলে কাজী সাহেবেরই লোক। উনিই আমারে ডাইকে নিয়্যা গিছিলেন। হ্যাঁ, টাকা সাত হাজারই নিছিলেন দলিলে সাইন ক'রে। বাকি দুই হাজার রেজিস্ট্রি করার সোময় দেওয়া হবে—দলিলেই উল্লেখ ছিলো।

কাজী কুঞ্জপদকে দেখলেন।

মাথা নিচু করলো কুঞ্জপদ।

মেজোবাবু তার তৃতীয় সাক্ষীকে ইশারায় এগিয়ে আসতে বলেন—তিনজন সাক্ষী ছিলেন সেদিন। ইনি তিমিরপুর ইসকুলের প্রধান শিক্ষক, মাননীয় দীপক সান্যালের মাসতুতো ভাই, রামকিঙ্কর ভাদুড়ি। কি মিঃ ভাদুড়ি? আপনি ছিলেন তো?

একমুখ হেসে, মাথার ব্যাকব্রাশ চুলে হাত বুলিয়ে, চশমাটা কপালের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে রামকিঙ্কর ভাদুড়ি—অবশ্যই। কাজী সাহেব তখনো ইসকুলের চাকরিতে ইস্তফা দেননি। উনিই আমাকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। আমার মনে হয়েছে, ওনার একটা ভয় ছিলো মনে। দলিলে সাইন করিয়ে—হারানবাবু যদি টাকা পয়সা না দেন। আসলে হারানবাবু তো সেরকম মানুষ না। কালী সাধক মানুষ। আত্মভোলা। দলিল টলিলেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আইন তো সেসব গ্রাহ্য করবে না। এই জন্যেই দলিল করা। হ্যাঁ, কাজী সাহেব সেদিন সাত হাজার টাকাই গুনে নিয়েছিলেন। সত্তর খানা একশো টাকার নোট। কি কাজী সাহেব, তাই তো?

ইমাম সাহেব রুষ্ট স্বরে বলে উঠলেন—উনি স্বীকার কৈরবেন কি জন্যি? চোখ মুখ দেখতিছেন না? যান, বিষয়ডা উনি এই প্রথম শুইনলেন।

মেজোবাবু মাথা নাড়লেন—তাইতো মনে হচ্ছে। বলে ফুস্ ক'রে একটা শব্দ করলেন মুখে—হ্যাঁ, শুনুন কাজী সাহেব। আপনার বিরুদ্ধে একনম্বর এলিগেশন হচ্ছে, ছ'মাস পার হওয়ার পরেও আপনি এই দেড় বিঘের ভিটে-বাড়ি রেজেষ্ট্রি ক'রে দেননি। দ্বিতীয় নাম্বার, আপনি জ্ঞাতসারে হারানবাবুর সম্পত্তি

তসরুফ করছেন। অর্থাৎ বাঁশ ঝাড়, আমগাছ, হিজলগাছ, এবং এই আমার সামনেই দেখতে পাচ্ছি—এই যে বলুন তো আপনারা, এটা কি গাছ?

ইমাম সাহেব বললেন—ছাতিম গাছ সার!

: রাইট। ছাতিম গাছ। হ্যাঁ, এইতো সিকিপরিমাণ কাটা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এইতো কুড়োলটাও এখানেই পড়ে আছে। এটা এভিডেন্স হিসেবে সিজ করছি আমি। বলে একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলকে তিনি ইঙ্গিত করলেন। এটা তুলে নাও।

কাজী একবার পিছন ফিরে তাকালেন। যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো। নসিরণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে—রান্না ঘরের ছাপরার চালার পাশেই গোয়ালঘর। গোয়ালের পাশ দিয়ে একটা একটা সরু রাস্তা। চারা একটা কামরাঙা গাছ। তারই নিচে দাঁড়িয়ে আছেন নসিরণ। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দু'চোখ ছাপিয়ে উদ্‌গত অশ্রুধারা নেমে আসতে চাইছিলো তার। কিন্তু তিনি প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করতে লাগলেন।

: তাহলে? মেজো দারোগা বাঁ হাতে রুল ঠুকে ঠুকে বলতে থাকেন—কাজী সাহেব, আইনত আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি। কারণ ইতিমধ্যেই থানায় আপনার বিরুদ্ধে ডায়েরি করা হয়েছে। অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ দখলতো করছেনই। উপরন্তু তসরুফও করছেন। যাই হোক···

ইমাম সাহেব সকরুণ মুখে হাত জোড় করলেন মেজোবাবুকে—কাজী সাহেব লিডার মানুষ মেজোবাবু। লোকে তারে মান্যি গণ্যি করে। অ্যারেস্ট না কৈরে তারে বরং কিছুদিন সোময় ছান···

আকাশ-পাতাল কাঁপানো বিস্ফোরণ নির্গত হয় কাজীর কণ্ঠ থেকে—খামোশ বেল্লিক!

মেজোবাবু সহ সমবেত সবাই চম্‌কে ওঠে। ইমাম সাহেব পড়ে যেতে যেতে কুঞ্জপদকে আকড়ে ধরে নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করেন।

হাহা ক'রে হাসে ঈশ্বর বাউল। হাসে। হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেরিয়ে যায় মজনু।

কাজী সোজা, টানটান, ঋজু। চোখে অগ্ন্যুৎপাত। ঠোঁটে বিদ্রূপ ঝলসানো ধার—ভণ্ড ইমাম! পা-চাটা কুত্তা! জাহান্নমের কীট। একদিন তুমারে আমি হাবিয়া দোজখের আজাব ছাখাবো। তুমি মুসলমানের জন্যি ঝুটা দরদ ছাখাও। তুমি ইসলামের তামাম তিমিরপুরির বড় খিদমৎগার সাইজে-গরীব, ভুকা-চাষা-

তুবোর সম্র-সম্পদ হারানমণ্ডলগরে হাওলা কৈরে দিতিছো। তুমি ভাবো, জাফর কাজী অন্ধ, কত টাকা ঘুষ পাও হারান মণ্ডলের কাছ থিকে, তার কুনো খবর রাখিনে? চিৎকার ক'রে ওঠেন কাজী সম্বণার—হটো। দূর হটো। জাফর কাজী কুনোদিন কারো কাছে মাথা নিচু কৈরে মাফি মাঙেনাই ইমাম সাহেব। আমার স্থামনে ঈশ্বরের তামাম দুনিয়া পৈড়ে আছে। তার আকাশের নিচি, আমি জাফর কাজী, মাথা উঁচা কৈরে দাঁড়ায়া থাকপো—আমৃত্যু। যদ্দিন শকুনের থাবার মদ্ধি থিকে আমি আমার ভিটা-বাড়ি, আমার পিতৃভূমি উদ্ধার কৈরতে না পারবো—গাছতলায় থাকপো ইমাম, কিন্তু বে-ইনসাফির কাছে—মাথা নোয়াবো না। যাও, যাও। যান মেজোবাবু। আর তুমি নিরাপদর ভাই, তুমি হারামখোর দীপক সাইন্যালের ভাই, এই তুমার শিক্ষকের আদর্শ ··। যাও তুমরা। আমি আইজই গাছতলায় চৈলে যাবো···।

নির্বাক-স্তব্ধ সময়।

ইমাম সাহেব গুটি গুটি ক'রে পিছন হটতে হটতে বলেন—আমি যাতিছি। মাগ্‌রিবের সোময় হয়্যা গিছে। বলে আর কারো উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মেজোবাবু থম্‌কে গিয়েছিলেন উত্তেজিত কাজীর সামনে। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে কাজীর উদ্ধত আচরণে। তিনি গর্জে ওঠেন—কৈবর্ত্ত্য পাড়ার ইতিহাসের কথা এরই মধ্যে ভুল হয়ে গেলো!

কাজী সদর্পে বাঁ হাতের করতলে ঘুঁষি মেরে, চোখ রাঙিয়ে জবাব দেন—মেজোবাবু, আমি আপনার খাসতালুকির গোলাম না। আপনে দারোগা। আমি শিক্ষক। আপনে খুন করেন মানুষ। আমি লড়াই করি পশুত্বের বিরুদ্ধি। জোরডা তো আমারই বেশি থাকার কথা। আর যদি ষোলোজন অসহায় মানুষকে রাত্রির অন্ধকারে মস্তান ভোমার দলের সাথে আপনে খুন কৈরে থাকেন, পোয়াতী বউগরে রেপ কৈরে—শক্তির ডম্পাই দেখান তো—আর একদিন চিষ্টা কৈরে দেইখবেন—মেজোবাবু, তিমিরপুর তৈয়ার আছে। আইসপেন। যান অ্যাখন।

মেজোবাবুর চোখ মুখ ক্রোধে লাল। হয়তো হাতের রুল দিয়ে তিনি কাজীর মাথায় আঘাত ক'রে বসতেন—হাতও তুলেছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়লো—দক্ষিণের মাঠের খাল-বিল দিয়ে সুতোর রেখার মতো একটা লাইন দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। তাই দেখে হাতটা নামিয়ে নিলেন তিনি সঙ্গেসঙ্গে। এবং জোর ক'রে গলার আওয়াজটাকে কঠিন ক'রে বললেন—আপনাকে পনেরোদিন সময় দিচ্ছি। বাড়ি ভ্যাকেট ক'রে দেবেন। অন্যথায় সি. আর. পি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যাবো আপনাকে।

আর হ্যাঁ, বাড়ির কোনো স্থাবর জিনিসে হাত দেবেন না আপনি। এই ছাতিম গাছটাও এরকমই থাকবে। বলে তার দলবলের দিকে ফিরলেন—চলুন, যাওয়া যাক।

ওরা চলে গেলো।

কাজী তখন থর থর ক'রে কাঁপছিলেন।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি ছাতিম গাছটার নিচে বসে পডলেন মাথায় হাত দিয়ে। মুখটা তার ঝুঁকে পড়লো মাটির দিকে। রাগে, দুঃখে, অপমানের তীব্র জ্বালায় বহুক্ষণের অবরুদ্ধ অশ্রুধারা তার দু'চোখ বেয়ে টপ টপ ক'রে ঝরে পড়তে লাগলো তৃষিত মাটির বুকে। কিছুতেই বাঁধ মানাতে পারলেন না। ঈশ্বর এগিয়ে এসে শরীর ঘেঁষে বসলো তার। কাঁধে হাত রাখলো।—কাজী দা।

কাজীর সমস্ত শরীরে আবেগের দোলা। তিনি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেললেন। নসিরণ ছুটে এলেন না। খুব ধীরে, অবসন্ন পদবিক্ষেপে ছাতিম গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। মুখে তখনো আঁচল ঢাকা। শুধু অন্তহীন শঙ্কায় অকম্প্র চোখের মণি দুটি স্থির।

সেই সময় হল্লা শোনা যায়।

চমকে তিন জনই একসঙ্গে চোখ তোলেন।

মজনু।

মজনুর পেছনে সরু লাইন দেওয়া মানুষ। কুড়ি, পঁচিশ, তিরিশ।

ঈশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে মজনুর উদ্দেশ্যে বলে—কিছু হয় নাই। সবাইরে যাতি কও।

তবু কেউ যায় না। রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শরীরের ঘাম ঝরায়। হাঁপায়।

কাজী আত্মসম্বরণ ক'রে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়েন। দেখেন চেনা মুখের হিন্দু-মুসলমান ভুকা মানুষ সারবন্দী। নিঃশব্দ। খালি গা। পেট-পিঠ চিপ্‌টে লাগা। দেখলেই বোঝা যায় ক্ষুধার্ত। হাওয়াই বলে দিতে পারে হামলোগ ভুকা হ্যায়।

আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালের শ্লোগান।

ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যয়, লাখো ইনসান ভুকা হ্যয়।

ঈশ্বরের কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষ ঘোষিত হয়—নেহরুর বিটিরে ডাইকা আইনে গ্যাখাও —তার সমাজতন্ত্র আর গরিবী হটানোর কি চমৎকার দৃশ্য। মামুদারে কও, আরে শালা হারামখোর, তিন নম্বরের মিথ্যাবাদী, রাইটার্সে—যেখানে বলে তোর রাজ্য-শাসনের দণ্ডমুণ্ডের- ন্যায়দণ্ড থাকে—শালা সেই ঘরে মেয়েমানুষ নিয়্যা ফূর্তি মারিস,…নকশাল গ্যাখা মাত্তর গুলি করার হুকুম দিস। সি, পি, এম-এর সাচ্চা

কর্মীগরে খুন করার জন্যি মাস্তান বাহিনী পাঠাইস…শালা হিপিগরে মাস্টের; অরে চুলির ঝুটি ধৈরে নিয়্যা আয়·· ত্যাখায়ে দেই…সমাজতন্ত্র কারে কয় রে শালা হারামির বাচ্চা।

কাজী তাকে থামাতে চেষ্টা করেন—ও ঈশ্বর দা, চুপ করো। তুমার বউদি—তুমার পিছন দিক যে।

: ও। ফিরে দাঁড়ায় ঈশ্বর। বলে—বউদি তুমি ঘরে যাও তো। কিছু হয় নাই। দারোগা আইছিলো অন্য কারণে।

নসিরণের তবু ভয় যায় না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন মাথা নিচু ক'রে। মজনু এসে তাকে বলে—চাচি, চলো, তুমি ঘরে চলো।

নসিরণ একাই ফিরে চ'লে গেলেন দু'চোখভরা হতাশা আর ভয় নিয়ে। মজনু এবার মুখোমুখি দাঁড়ায় কাজীর—এই ঘর, এই ভিটে তুমি ছাড়তি পাইরবে না চাচা। আমরা একবার শ্যাষ মুকাবিলা করবো। পাঞ্জা লড়বো মরণের সাথে। মরছিতো এমনিও। চারদিক ঘিরা আকাল। শ্যাল্ শকুনে খুবলায়্যা খাবি আমাগরে লাশ। ভুকা প্যাটে মরার থিকে—গুলি খায়্যা মরা ঢের ভাল চাচা।

ঈশ্বর বলে ওঠে—না ঘর ছাড়া হবিনে। যা হয় হবি। সি. আর. পি আসে আসুক। ভুকা প্যাটে বজ্রপাত ঘটাবো আমরাও।

কাজী এগিয়ে গেলেন সারবন্দী নরনারায়ণদের কাছে। মাথা নিচু করে ওরা সবাই। তিনি বলেন—ক্ষ্যাত-খোলা তো জ্বৈলা-পুইড়া ছাই হয়্যা গ্যালো। এভাবে তো ধুক্‌পুক্ কৈরে মরা যাবিনে। তুই একদিনির মধ্যি চলো—সার্কেল অফিসারের কাছে যাই। রিলিফ দিতি হবি। য্যামন কৈরে হোক ব্যবস্থা করতি হবি। তুমরা ঘরে যাও। আমি সন্ধেবেলা আসপো।

পরদিনই চার-পাঁচশো মানুষের মিছিল নিয়ে কাজী গেলেন রামেশ্বরপুর সার্কেল অফিসারের এজলাসে। তিনি দেখা করলেন। সব শুনলেন। তারপর পরিষ্কার বলে দিলেন তার করার কিছু নেই। হতে পারে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানরা যদি একত্রিতভাবে মহকুমা প্রশাসককে ধরে যদি এগোয়, তারপর তো এম. এল. এ আছেন। তাকেও ধরতে হবে। রাইটার্সের টনক না নড়লে কিচ্ছু করার নেই কারো। শুনে ফিরে এলেন কাজী। সবাইকে বলে দিলেন, রাত পোয়ালে অন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই।

খা-খা করে মাঠ-ঘাট। দারুণ খরায় জ্বলে যেতে থাকে গাছ-পালা-ফুল, ঘাস লতাগুল্ম। আকাশে চিল ওড়ে। শকুন ওড়ে দলে দলে।

চারদিকে আকালের সাড়া! অশুভ পদধ্বনি মৃত্যুর।

কাজাপাড়ায় বড় পীরের থানে শিরনি দেয় চাষী বউরা।

চাষীরা জলভরা মাটির ঘটে আম্র পল্লব, সিঁদুর, কুলোতে লাল রঙের আলপনা ধান ও দূর্বাঘাস, একটা ব্যাঙ বাঁধা চালুন, মাটির পুতুল সাজিয়ে দল বেঁধে গান গায় ফসলের পোড়া ক্ষেতে ক্ষেতে। মাঠে মাঠে শান্তিজল সিঞ্চন করতে করতে—ফুটি ফাটাতে মাটিতে কুলো দিয়ে হাওয়া দেয়। জল ঢেলে কাদা কাদা মাটিতে গড়াগড়ি দেয় আর গান গাইতে থাকে—

আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে··
আশমান হৈলো টুটা টুটা
জমিন হৈলো ফাটা।
ম্যাঘ রাজা ঘুমায়া আছে ম্যাঘ দিবো কেডা···
আল্লা ম্যাঘ দে · ।

রবি শস্য গেলো। আউসের খন্দ পার হয়ে গেলো। আমনের আবাদি সময়ও ফুরিয়ে এলো। নেই। বৃষ্টি নেই। সাদা সাদা হাল্কা মেঘে ধোঁয়াশার চিহ্ন নেই। দক্ষিণ মাঠের হাঁটু জলও শুকিয়ে পায়ের পাতাও ভেজায় না। কচুরি-পানাও হলুদ হতে হতে শুকিয়ে যায়। ফড়িং বসে বসে তৃষ্ণার জল পায় না। কাক উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কা-কা-কা-কা ক'রে মাথা খায় ভুকা মানুষের। আসে চিলেরা। দারুণ চিৎকারে সচকিত ক'রে চলে যায় ক্লান্ত পাখায়। তারা খাদ্য পায় না। কীট পতঙ্গের দেখা নেই। শামুক-গুগ্‌লিরা উধাও। শুকনো মাটিতে কেঁচো-কেন্নেরও পাত্তা নেই। কাক কি খায়। চিল কি খায়।

কুকুরগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে পড়ে পড়ে ম... থাকে। কেঁউ কেঁউ ক'রে রাত্রির উষ্ণ হাওয়াকে ভয়ের বিবরে ডুবিয়ে দিয়ে মরে যায় কুকুরগুলো। আর সেই মরা কুকুর ঘিরে দাঁড়িয়ে যায় জ্যান্ত কুকুরগুলো। শকুন, চিল আর কাকেরা।

কুকুরের হাহাকার স্পর্শ করে মানুষের সমাজকে।

পুকুরে শুধু কাদা পড়ে থাকে। খাবার জলও মেলে না। কুয়ো-ইঁদারার তলায় কোনোদিন জল ছিলো কিনা—বোঝা যায় না।

হাহাকার।

উর্ধ্বশ্বাসে হাহাকার ছুটে আসে।

ছেলেরা গায়, মেয়েরা গায়, বুড়োরাও সুর ধরে।

হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য থাকে না।

তারা চিৎকার ক'রে ক'রে কোরাশ গায় এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়।

আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই

আল্লা ম্যাঘ দে··· ।

কৈবর্তপাড়ায়, দাস পাড়ায়, বাগ্‌দি পাড়ায় বউ-বেটিরা প্রার্থনা জানায় তাদের বরুণ দেবতার কাছে।

অনাহারের দুর্মর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে কচি কচি শিশুরা।

কচু-ঘেঁচু নেই। লতা গুল্ম নেই।

কচি ঘাসের শেকড়ও নেই। শিমূলের চারাগুলো উৎপাটিত হয়ে যায়। তার শিকড় চিবিয়ে খায় ক্ষুধার্ত মানুষ।

কচুরিপানার পেটের মোটা অংশটাও পেটে চালান হয়ে যায়।

তবু বৃষ্টি নামে না। আশমানে মেঘ জমে না। ঝাঁঝাঁলো রোদ-পোড়া আশমান। রাতে সেই নীল সিয়া আশমানে নক্ষত্রের মেলা বসে যায়। ধ্বক ধ্বক জ্বলতে জ্বলতে ওরা হাসে রাতভর। ওরা ডুবতে ডুবতে সূর্যের দেখা মেলে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে—পাগলা হাওয়ায় তপ্ত বালুকণার ছাঁট গায়ে লেগে সরষের মতো ফোস্‌কা ফেলে দেয়। গাছের নিচে পড়ে থাকে মানুষ। তারপর একের পর এক পালাতে থাকে গ্রাম ছেড়ে।

: এই ফজরালি, কনে যাতিছো ?

: শহরে যাই। তিন-চাইরদিন উপাস। বাঁচিনা।

: ওই নগেন, চৈল্লে ?

: না গেলি খাতি দিবি কিডা ? মাগ্‌-ভাতারেই ভাগি গো।

আমরা যাতিছি। ভাতের খোঁজে। জলের খোঁজে।

গাঁয়ে রক্ত আমাশয় ঢুকে যায় আকালের কানাগলি দিয়ে। অবধারিত মৃত্যু আসে তার কালো ছায়ার থাবা মেলে। পালায়। পালায়। মানুষ আতঙ্কে পালাতে থাকে।

কলিমুল্লাহ আসে। মজনু আসে। জয়দেব মিস্ত্রী আসে। বৃদ্ধা পুঁটিরানী, সয়মারা দল বেঁধে আসে। কি হবিগো কাজী। কি উপায় হবি।

: রিলিফ নাই।

: কাজী চলেন গো, আপনে একবার হারু মণ্ডলের কাছে চলেন।

: চলেন গো। আপনে আর অমত কৈরবেন না। আমরা গেলি দূর দূর কৈরে তাডায়া ছায়। কুত্তা-বিড়ালেরও মানুষ অ্যাতো ঘেন্না করে না গো।

: না আমি যাবো না। কাজীর এক কথা।—তুমরা যাও।

কলিমুল্লাহ এসে হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে কেটে কাজীর পা জড়িয়ে ধরেন—আমি তুমার চাচা হই কাজী। তুমি চলো। মণ্ডল কয়, কনে গ্যালো গো তুমাগরে লিডার। থাকে তো অ্যাখন আমারই বাড়িতি। থাকতি দিছি। আমিতো আর জহ্লাদ না। কনে খ্যাদাবো কও। চারদিকির যা অবস্থা। আর অনাদি খাসকেলই কয়া দিলো—কাজীরে আসতি কওগে। আইসে-মাফ-ছাপ নিয়্যা মণ্ডলদার সাথে হাত মিলাতি কও। রিলিফও আসপিনে। লঙ্গরখানাও হবেনে।

নসিরণ তার অর্ধভুক শরীর নিয়ে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠেন ক্রোধে—মদিনের বাপ। কিসির তুমার অহংকার? হাজার মানুষ ভুকা মরে, আর তুমি জিদ ধৈরে আছো—যাবা না। যাতি হবি তুমারে। কলিম চাচায় তুমার পাও ধৈরে কাঁদে। ওহ, মাবুদ, তুমার আরস শুদ্ধা কাঁইপে ওঠে না? উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকেন নসিরণ—তুমি না যাও, আমি যামু মণ্ডলের কাছে। মানুষের জানই যদি বরবাদ হয় তো কিসির-মান-অপমানের টানাটানি? একি তুমার নিজির জন্যি হাত পাততি যাবা? আর হারু মণ্ডলের কি। সে তো সরকারী জিনিস দিবি।

দংশিত বিবেক নিয়ে ভুকা মানুষের কাফেলার সঙ্গে কাজী আসেন সন্ধেবেলা হারু মণ্ডলের কাছারি ঘরে। কাছারির মাঠে নিঃশব্দ ভুকা মানুষ অপেক্ষা করে বুকভরা আশা নিয়ে। এবার কাজ হবে। কাজী এসেছেন।

কাছারি ঘরে—নবীনের হাতে পাখার হাওয়া খেতে খেতে, হুকো টানতে টানতে, মশলা চিবোতে চিবোতে হারু মণ্ডল কাজীর সবকথা ধৈর্য ধরে শোনে আর সহানুভূতিতে উহু-আহা করতে থাকে। তার ঠাণ্ডা মাথা। দুখি দুখি মুখ। আর মাঝে মঝে—মা শ্যামা, মা শ্যামা ডাকে। রঙ্গলাল দাগা, অনাদি খাসকেলও তাল দেয়। দুঃখের পাঁচালি শুনতে শুনতে ক্যাশবাক্সে তানা-নানা তানা-নানা করে বোল্ তুলে—গুণগুণ করে। সুর ভাজে—শ্যামা মা-কি আমার কালোরে···।

কাজী তখন শান্ত সংযত বিনয়ের সুরে ডাক দেন—হারুবাবু।

যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে ফিরে এলো হারু মণ্ডল। অর্ধনিমিলিত চোখে সে তাকালো—হু?

: কি হবি ?

: ইয়েস। কি হবি। মা-শ্যামা-মাগো, এ তুমি কি সমেস্যায় ফ্যালালে মাগো। আমি অ্যাখন কি জবাব দেই। না খাওয়া আমারই গিরামের মানুষ সব। বড় কষ্ট ওগরে। মাগো···বলে আবার চোখ বুজে ক্যাশবাক্সে বোল তোলে, হারু মণ্ডল। সুর ভাজে—শ্যামা-মা-কি আমার কালো রে··· ।

: গোটা দুই লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করতি না পারলি—এরা মৈরে শ্যাষ হয়া যাবি।

: হু। লঙ্গরখানার ব্যবস্থা কৈরতে হবে। তা কাজী সাহেব, আমি তো ধর্ম-কর্ম নিয়্যা থাকি। মুখ্যু-সুখ্যু অপগণ্ড মানুষ। আমি কি কৈরতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী মানুদা আছে, প্রধানমন্ত্রী আছে। রাষ্ট্রপতি আছে। সেখেনে যানগে। তারা বুঝতি পারবি ভাল। দরকার হলি—একটা-দুইটা কি কথা, পঞ্চাশটাও তারা খুইলে দিতি পারে লঙ্গরখানা। আমিও খুশি হবো।

আবার তবলের চাটি পড়ে ক্যাশবাক্সে। চোখ বন্ধ হয়ে যায় মণ্ডলের। কাজী বুঝতে পারেন, মণ্ডল তার ভজনা চায়। কাকুতি মিনতি শুনতি চায়। তিনি ভুকা মানুষের কথা ভেবে নিজের জিদ্‌কে দমিত করেন। সবিনয়ে, হাত-জোড় করে বলেন—আমরা আপনারে চিনি। আপনি আমাগরে আইন-আদালত সবকিছু।

মাথা নেড়ে ছন্দ তোলে মণ্ডল—বাঃ বাঃ। খুবই মিষ্টি কথা। আনন্দ হতিছে আমার। তো—ভোটটা যে আপনেরা তে-রঙ্গায় দেন নাই, সেটাও তো খাঁটিকথা কাজী সাহেব।

কাজী সে কথার জবাব না দিয়ে তার অনুনয়ের সুরকে আরো কোমল করলেন—না খাতি পায়া মড়ক শুরু হয়েছে গিরামে। রক্ত আমাশা, ডায়রিয়ায় মরতিছে শিশুরা, যুবকরা। অ্যাখন যদি আপনে না বাঁচান—তালি তিমিরপুর শ্মশান হয়া যাবি হারুবাবু।

এইসময় রঙ্গলাল দাগা দাঁত-মুখ খিচিয়ে বলে ওঠে—আরে ইতোদিন তো ইণ্ডিয়ামুদে বৈসে খুবতো পাকিস্তান কো দরদ দিখালেন কাজী সাব। ইখোন পাকিস্তান বাঁচায় না ? চীন রাশিয়া বাঁচায় না ? কুথায় গিলো লালঝাণ্ডা কুম্পানি ? যান না, পাকিস্তানের দরওয়াজা খুলাই আছে। সিখানে ভাত মিলবে রোটি মিলবে। সামারমে সরবৎ বি মিলবে বহোৎ মিঠাবালা··· ।

চাপা কঠিন স্বরে দাগার দিকে তাকিয়ে মৃদু ধমক দিলেন কাজী—দাগা

সাহেব!

: সে হালুয়া! ভিখ্ মাঙতে আসিয়ে চোখ রাঙাচ্ছে—হাঁ?

: বাজে কথা কন কি জন্যি?

হারু মণ্ডল দাগাকে থামিয়ে দিয়ে ফিক্ ক'রে হাসে—লঙ্গরখানা?

কাজী মাথা নাড়েন—হ্যাঁ।

: খুলে দিতি পারি।

: আপনের দয়া।

: উহু কাজী সাহেব। আমি তো শুয়ারের বাচ্চা। কন, শ্যামা মা-র দয়া। তারই কৃপা।

কাজী আশান্বিত হয়ে ঘাড় ঝাঁকালেন—ঠিক।

: আমিও কই ঠিক। কিন্তু একটা শর্ত আছে। রাজি থাকলি, আমিও রাজি।

: কি শর্ত?

হারু মণ্ডল হঠাৎ চোখ বুজে ভাবে আবিষ্ট হয়। কখনো হাসে, কখনো কান্নার ছায়া পড়ে তার মুখে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা পেণ্ডুলাম হয়ে দুলতে থাকে। আর রঙ্গলাল দাগা কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে থাকে কাজীর দিকে। দু'জনের চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নেয় দাগা। নবীন সাঁই সাঁই পাখা চালায়। সমিরুদ্দী দরোজার সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে অপেক্ষমান ভুকা মানুষের কাতরগুঞ্জন শুনে, তাদের মৃত্যুর ছায়াময় আলস্য দেখে মিটমিট ক'রে হাসে। অনাদি খাসকেল একবার খুব জোরে 'মা শ্যামা' বলে তার ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেই ধ্যান ভেঙে যায় হারু মণ্ডলের।

: না কাজী সাহেব। শর্ত টর্ত কিছু না ভাই। ও কিছু না। সব শ্যামা-মার ইচ্ছ্যা। ইমাম সাহেব অনেকদিন ধৈরে কৈতিছেন, মজিদের পলিস্তারা ঝুর ঝুর কৈরে পড়তিছে। ইটগুলান হাঁ হয়া যাতিছে। মেরামত দরকার। সেই জন্যি চাষীগরে জমিতে ধান উঠলি—বিঘা পিছু-এক মন ধান দিতি হবে আমারে, আমি গোছায়া-গাছায়া তা ইমাম সাহেবরে দিয়্যা দেবো। আর হিন্দুগরেও—যাগরে চাষ-বাস আছে, তারাও তাই দিবি। তবে-তাগরে জিনিস দিয়্যা—বারোয়ারিতলায় মঙ্গলচণ্ডীর পুজা দেবো··য্যানি জেবনে আর গিরামে অকৈল্যাণ না আসে।

কাছারির জানালায় কে একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা-বার্তা শুনছিলো। সে দৌড়ে গিয়ে হারু মণ্ডলের প্রস্তাবের কথা বাইরে প্রচার ক'রে

দিলো, আর সেই, অথৈ জলে ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন বাঁচার আশায় খড়কুটো আকড়ে ধরে, তেমনি ক্ষুধার্ত-হতাশায় নিমজ্জিত কংকালসার মানুষ সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—রাজি। রাজি। রাজি।

একজন শ্লোগান দেয—আমাদের ভগবান, হারু মণ্ডল—যুযুগ জিও।

শুনে হারু মণ্ডলের আকর্ণ হাসি অনেক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে থাকে কাজার দিকে। যেন, কি হে কাজী। আখেরে কি দেখতিছো? তুমার শিষ্যরাই আমাব নামে জিন্দাবাদ দিতিছে। ভগবান কতিছে।

খাসকেল বলে ওঠে তখন—ঠাকুর পরমহংস কযছে, উপকার যে কবে, সে উপকৃতের কাছ থিকে অপকার পায। ধন্দের কাম নাই। সাদা কাগজে সই দিতি হবে। সই দিতি না পারো টিপ-ছাপ ছাও। কথায় আছে, আগের ব্যজার ভাল তো পাছের ব্যজার ভাল না।

তিতো বিরক্ত হারু মণ্ডল বাঁ হাত নেড়ে ঠোঁট উলটে, ভুরু নাচিযে তার অনীহা প্রকাশ করে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এ কি কও অনাদ। ধর্মের কাজের জন্যি টিপ্‌ ছাপ নিবা? পাপ হবি হে। বড পাপ।

অনাদি তার যুক্তিতে অটল—সবাই আপনের মতো না মণ্ডলদা। ধর্মের জান্যই তো টিপছাপের দরকার। কথায কয়, ঘাড়ে ধৈরে হরিভক্তি। জামানাডা তো অধর্মের এখন। ওসব ছাড়েন। টিপ-ছাপ দিতি হবে।

মণ্ডল বিরক্ত হয়ে বলে—আমি আর কুনো কথা কবো না। তুমরা যা ইচ্ছ্যা করোগে।

দাগা সিগারেট জ্বালিয়ে ধেঁাযা ওডায—হঁা জি, আপনি চুপচাপ আরাম করেন।

বাইরে গুঞ্জন।

গম্‌গম্‌ করে কাছারির মাঠ।

ক্যা। টিপ-ছাপ ক্যা?

আমাগরে বিশ্বাস করে না?

ধানের কর্জনামা হে।

কাজী এতক্ষণ বসে বসে সাজানো নাটকের অভিনয় দেখছিলেন। তিনি ধৈর্য রাখতে পারলেন না শেষপর্যন্ত। প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন—না। টিপ ছাপ দিবিনে কেউ।

খাসকেল একবার চোখ বোজা তপস্বীর দিকে তাকিয়ে নিজেই হারু মণ্ডলের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়—টিপ-ছাপ হবিনে তো ?

: না।

: তালি কাটেন এখন। সাহায্যও হবিনে। যান।

: হাজি, পাকিস্তানের কাছে মাঙেন তব্।

হতাশার আগুনটাও ছড়িয়ে যায় জানালা গলিয়ে ভুকা মাঠের মগজে মগজে। সেখান থেকেই পালটা প্রতিবাদ ওঠে—দেবো। টিপ ছাপই দেবো আমরা।

চম্‌কে ওঠেন কাজী। তিনি মাথা নেড়ে বলেন—না। না। ভুল করতিছো তুমরা।

কলিমুল্লাহ্ এসে দরোজায় দাঁড়ায়। জয়দেব মিস্ত্রী আসে। ঠেলে ঠুলে বৃদ্ধা পুঁটিরানীও এসে দরোজায় মুখ গলিয়ে বলে—আমরা টিপ-ছাপ দেবো।

: কলিম চাচা। মৈরবেন।

: বাঁইচা আছি কনে ? মরার আবার জহ্লাদের ভয় কি ? টিপ-ছাপ দেবো।

: সক্কলেই দেবো।

: আমরা লঙ্গরখানা চাই। দুইবেলা চারডে প্যাটে দিতি চাই।

: কাজী তুমি দূর হটো।

বিমূঢ় বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন কাজী—কি কও তুমরা ?

জয়দেব মিস্ত্রী বীভৎসভঙ্গি ক'রে জবাব দেয়—কথা কই। আপনে যান। মণ্ডল ঠাকুর আমাগরে নেতা। লালঝাণ্ডা-অলাগরে চিনি। কৈলকাতায় গাড়ি হাঁকায় আর গিরামে আইসে ভোটের সোময় আমাগরে সাথে সান্‌কিতে ভাত খায়া ধোঁকাবাজি করে।

: মিস্ত্রী। কাজীর অর্ধভুক শরীরের সমস্ত শক্তি যেন উবে যয়ে সেই মুহূর্তে।

বাইরে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। কাজীর মুণ্ডুপাত করতে থাকে অনাহারি মানুষ।

: কাজী যায় না ক্যা ?

: ঘুষ চায়।

: শালা এক নম্বরের ভণ্ড।

: হের ঘরের মোচ্ছি মাচা ভর্তি চাইল আছে। হের কি।

: ভণ্ড কাজী নিপাত যাও।

: দূর হটো। তফাৎ যাও।

কৃমী-কীটের মতো কিল্‌বিল্ ক'রে, কদর্য মুখভঙ্গি করতে থাকে ভুকা মিছিল।

তারা যেন কেউ কোনোদিন কাজীকে দেখেনি। চেনেও না। অচ্ছ্যুৎ-ঘৃণ্য একজন লোক তাদের সামনে এসে তাদের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাজী অবসন্ন বোধ করেন। নতমুখ তার আর উঁচু হয় না। তার বুকের গভীরে তখন চৌদ্দবছর বনবাসে কাটিয়ে আসা সীতার অভিমান। তার ইষ্ট-দেবতা রাম—আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করতে বলছে। হে পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও। দ্বিধা হও। তুমরা আমার নরনারায়ণ। আমি তো তুমাগরে সেবক। তুমরা নিজিরাই আইজ ফাঁদে পাও দিলা। এ দুঃখ আমি করে রাখি···।

হারু মণ্ডল নবীনকে ধমক দেয়—হাতে জোর নাই - জোরে পাখা চালা। কাজী সাহেবরেও এট্টু দিস্। ঘাইমে গিছে।

নবীন দুই হাতে পাখা চালায়।

সাঁই-সাঁই-সাঁই-সাঁই।

মণ্ডল হাসে ক্যাশবাক্স বাজিয়ে।

তানা-নানা-তানা-নানা।

: খাসকেল।

: কন।

: সেরেস্তাদারবাবুরে ডাকো। সকলের য্যাখন ইচ্ছ্যা টিপ-ছাপ দিবি··· কারণ কও দেখি? এডাই তো মার ইচ্ছ্যা। মা করায়, আমরা করি। মা হাসায়, আমরা হাসি। মা কাঁদায়, আমরা কাঁদি। সেইতো ইচ্ছ্যাময়া শ্যামা আমার। তার যা মর্জি; কেডা তা বোধ করতি পারে হে? কেডা পারে? এইযে-ও কলিম মিঞা, তুমি প্রবীণ মানুষ গো, তুমি আগে ছাপ দ্যাও গে। ও জয়দেব, তুমি শিল্পী মানুষ। আমার ঘরে তুমার হাতের পালঙ্ক—বড়ই ভাল হাত হে তুমার···আহা। বড় ব্যথা পাই হে। যাও—তুমি তো নাম লিখতি পারো। করোগে সই। আমার কি, সব মার ইচ্ছ্যা।

ঘরের বারান্দায় সেরেস্তাদারের কাছে টিপ-ছাপ দেবার লাইন পড়ে যায়। কংকালের সারিতে—টিপ ছাপ কে কার আগে দেবে, তাই নিয়ে বেধে যায় হুড়োহুড়ি। ঠেলাঠেলি। অধিকতর দুর্বলরা মুখ থুবড়ে পড়েও যায়। মেয়েরা কেঁদে ওঠে।

: খা, খা, খ্যাও—দানবরা তুরাই খা। আমাগরে পিণ্ডায় তো জোর নাই। আমাগরে কপালে পোড়ার মরণ লেহি দিছে ভগমান···।

: কলিম মিঞা্যা চাইল পায়ছে?

সাপের লেজের মতো অাঁকা-বাঁকা লাইনের শেষ প্রান্ত থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওঠে। হায় হায় করে। মাথার ওপর দিয়ে ঘাড় তুলে দেখতে চেষ্টা করে সামনের দিকে কি হচ্ছে। কিন্তু কেউ লাইন ছাড়ে না।

: আর কেডা চাইল পায় ?

: মিস্তিরী। মিস্তিরী।

: কেডা ?

: আরে জয়দেব।

কাজী দেখেন—কেউ চাল পায় না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে কালির ছাপ পায়। সেরেস্তাদারের পাশে বসে খাসকেল সকলের হাত ধরে ধরে ক্রমানুপাতিক টিপ-ছাপ দেওয়ায়। ধমক দেয়। টিপ দেওয়া শেষ হলে চালের আশায় কলিম মিঞার পাশে গিয়ে শূন্য হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আর সকরুণ চোখে এদিক সেদিক দেখে। চালের বস্তার সন্ধান করে। চাল কোথায় ? কোথায় ?

মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রায় দৌড়ে—সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে গেলেন কাজী। যেতে যেতে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে ওঠেন। সে কান্না তার ঘরের চৌকাঠে এসে শব্দ ক'রে জানান দেয়। অপ্রতিহতবেগে ভেতর থেকে উৎসারিত ক্ষুব্ধ অভিমান তার কণ্ঠে আর্তনাদ হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

ছুটে আসেন আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকা দুর্বল শরীর নিয়ে নসিরণ।—কি-কি হয়ছে ?

: কি হবি ? ভালবাসার পুরস্কার পালাম। কেয়ামত হয়্যা গ্যালো মদনের মা।

: কি কও গো তুমি ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢোক গিললেন কাজী।—মদনের মা, কলিম চাচা-জয়দেব মিস্তিরীরা আইজ যদি আমারে খুন কৈরে ফ্যালাতো, এই লজ্জার হাত থিকে রেহাই মিলতো আমার।

নসিরণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুখে কথা জোগায় না। যতক্ষণ চোখের পাতায় ঘুম নামে না, জাগরিত জীবনের প্রাত্যহিক যন্ত্রণায় মাথার ভেতরটা তো ততক্ষণই পোকার কামড় চলে। একটা এমন সময়, এমন মুহূর্ত কি নেই, যার সবটুকুতেই সুখের ছোঁয়া, শান্তির পরশ থাকে ? কোথায় যাবেন। কোথায় সেই শান্তির পরশমণি লুকিয়ে আছে। এ জীবনে বেঁচে থাকার আর তো কোনো

মানে হয় না। এখানে মানুষ জন্মমাত্র পশুত্বের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। ছোট ছোট পশুরা বড় বড পশুদের শিকার। যখন খুশি ক্ষিদে পেলেই থাবায় লুফে নিয়ে পেটে চালান ক'রে দেয়।

স্বামীর পিঠ ঘেঁষে ধপ ক'রে বসে পড়েন নসিরণ। জানতে ইচ্ছে হয়, কি করেছে ওরা। তুমিতো ওদের জন্যেই গেলে। আমিই তোমায় কটু কথা বলে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে পাঠালাম। সেই তুমি ফিরে এসে, ঘরের দাওয়ায় বসে চোখের জল ফেলছো!

: তুমার পায় ধরি গো। কাঁইদো না। তুমি পুরুষ। পুরুষ মানুষির কান্তি নাই। কি হয়েছে কও।

: কান্নাডাই তো একমাত্তর সান্ত্বনা আমার মতোন পুরুষের। আজন্ম-মুসলমান হয়্যা এক শ্রেণীর লোকের সন্দেহের, ঘেন্নার জ্বালায়—খাক হয়্যা গ্যালাম। এখন মনে হয়, জন্মিলাম যখন—তালি এই হ্যাশে-কুত্তা বিডাল হয়্যা জন্মিলাম না ক্যা। মানুষ—লাথি-ঝাঁটা মাইরতো—কুকুর-বিডালের তো মান সম্মান বোধ নাই। আমারও হৈতো না। কিন্তু এ আমি কি হৈলাম মদনের মা। কুত্তা বিডালরা তো কেউ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান না। কুকুর-বিডাল কুকুর বিড়ালই ।

নসিরণ অস্থিরভাবে স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—তুমি কি পাগল হৈলে শ্যাষ পৈর্যন্ত? কি কও এসব পাগলের প্রলাপ?

: না। পাগলের প্রলাপ না। এই হৈলো আসল কথা। খাঁটি কথা। আমার জীবনের পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতার আলোয়—আমি যা দেখিছি মদনের মা, তা যদি ঠিকমতো প্রকাশ করতি পাইরতাম, তো মানুষ আর মানুষের আকৃতিতে থাকতি পাইরতো না। জানোয়ার হয়া যাইতো মানুষ। রক্তের বানে ভাইসে যাইতো সমাজ সংসার—। আমি তো তা পারিনে গো। না পাইরলাম কুত্তা বিডাল হতি, না পাইরলাম জল্লাদ হতি। মানুষও তো হতি পাইরলাম না। আমারে উরা ভণ্ড কয়। ঘুষখোর কয়। আমি নাকি মাচার মোত্তি চাইলের বস্তা-লুকায়া রাখিছি···। ওহ···।

: কলিম চাচায় কৈলো?

: না। অন্যেরা। ফাঁকি দিয়্যা সাদা কাগজে টিপ-ছাপ দিয়্যা নিতিছে। মতিভ্রম হলি যা হয়। প্যাটে ক্ষিদে। প্যাটের জ্বালা বড় জ্বালা।

: তাই বৈলে নিজিগরে ভবিষ্যৎটাও শ্যাষ কৈরে দিলো?

: দিলো। হারু মণ্ডল আইজ থিকে তামাম কাজী পাড়ার রাজা হয়্যা গেল্যো। বলতে বলতে পাগলের মত উঠে দাঁড়ালেন কাজী। তরতরিয়ে নেমে গেলেন উঠোনে।

নসিরণ ছুটে আসেন—কনে যাও?

: পথে।

: না। পথে যাতি হবিনে আর। আমি কতকাল থিকে কতিছি চলো—অন্য কুনোখানে যাই। মদনরে কও—একটা চাকরি-বাকরি নিক। শ্যাষ জীবনডা এট্টু শান্তিতি কাটাও।

: না। তা হয় না। বাজানের নিষেধ। হারু মণ্ডল যদি ভিটি ছাড়া করে—তাও যাবো না। গাছতলায় পৈড়ে থাকপো। মদনের কামাই আমার চাইনে। সে যে পথে গিছে যাইক। আমি যা পারি নাই, উরা যদি তা পারে··· তালি—হিন্দুর দিক কুনো মুসলমান যেমন কু-নজরে তাকাবিনে, কুনো হিন্দুও মুসলমানরে সেই নজরে দেখপিনে।

নসিরণ সবেগে মাথা নেড়ে তার হতাশার কথা জানিয়ে দেন—এই স্বপ্ন কুনোদিনও ফলবতী হবিনে। মানুষ তো নষ্ট হয়া গিছে। তার বিবেক নাই। তার বোধ নাই। তার সাচ্চা মনও নাই, তুমি কারে দিয়্যা স্বপ্ন দ্যাখো? ফসল বাঁচাতি যে বেড়া দিছো, ম'ইতের অন্ধারে সেই বেড়ারই হাত পাও গজায়। ধার নোখ। মস্তবড় বড় বড় দাঁত। আকাশ পাতাল সোমান লোভ—লালোছ—ক্ষ্যাতের সব ফসল হেরাই সপাটে খায়া ছাপ্ কৈরে দিতিছে। মদনের বাপ, ক্ষ্যাত বাঁচে কেম্নে? কেডা পারে বাঁচাতি? চলো, সোময় হাতে আছে অ্যাখোনো। তিমিরপুররে আমরা ওয়ালায়কুম জানায়ে দূর কোনো গাঁও গিরামে চৈলে যাই।

কাজী এখন নিজেকে আত্মস্থ করতে পেরেছেন। নিজেকে এবং তার অমিত-তেজ শক্তিটাকে অনুভব করতে পারছিলেন। আর নসিরণের কথা শুনতে শুনতে তার মনে হলো, তিনি যেন ঈশ্বর বাউলের মুখ থেকে এতক্ষণ ওই নেগেটিভ ব্যাখ্যা শুনছিলেন।

নসিরণের ব্যাখ্যাটা কি মিছেমিছি শুধুই ক্ষোভপ্রকাশ? নেগেটিভ?

এইভাবে রাত ভোর হয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। নিশির কালো মিশমিশে চাদরে ঢাকা রাত্রি···। আবার ভোর। আবার দুপুর। আবার রাত্রি।

লঙ্গরখানা হয় না।

বৃষ্টি হয় না।

ক্লান্ত-ক্ষুধিত মানুষ আর গায়ও না—আল্লা-ম্যাঘ দে—পানি দে ছায়া দেরে তুই…

পালিয়ে যায় দলে দলে, দল ছুট হয়ে। মা ছেলের দিকে তাকায় না। ছেলে বুড়ো বাবাকে টেনে ফেলে দিয়ে—দে ছুট্, দে ছুট্।

গাছের গুটি গুটি আম শুকিয়ে—থুবড়ে—ঝরে পড়ে গেলো।

যারা আছে, লড়ছে জীবনের মায়ায় তীব্র ক্ষুধার কামড়ের বিরুদ্ধে—

মুঠভরা সোনালী স্বপ্নের মতো একমুঠো সাদা ভাত—

যুবতীর ঢলো ঢলো—জল্‌জ্বলে যৌনকাতর চোখের মায়ার চেয়েও মনোমুগ্ধকর…

একমুঠো সাদা ভাত…

ভাত…

হাতছানি

: মণ্ডলবাবু, সই নিলেন, টিপ-ছাপ নিলেন, চাইল নাই। লোঙ্গরখানা নাই। কুনো উদ্‌যোগ-আয়োজনও তো দেখিনে।

ধুলো-বালির এলোপাথারি ঝড় ছুটে যায় হু হু ক'রে।

মণ্ডলের কাছারি ঘরের সামনে কংকালদের ভিড় জমে ওঠে রোজ। কিল্‌বিলে দেহ। শিশুগুলো জলের মতো পায়খানা করে। মায়েরা তাদের থ্যাক্‌না মেরে বসিয়ে রেখে ছুটে আসে কাছারি ঘরের সামনে। ল্যাকপেকে হাড়িসার শিশুরা তারস্বরে চেঁচায়। চোচয়ে পাড়া মাথায় করে।

মণ্ডল হাসে মিটিমিটি। রবীন্দ্রনাথের 'চক্ষুমুদি করে জপ'। সেইভাবেই ক্যাশবাক্সে তানা-নানা-তানা—নানা বাজায়।

বাজিয়ে বাজিয়ে গুণগুণ করে :

'মনরে কৃষি কাজ জানো না,
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা….'

: ধম্মাবতার গো। চরণে শতকোটি পেন্নাম হইগো ঠাকুরবাবা।

: কে? কেরে?

: আমি জয়দেব গো ঠাকুর।

চোখ নিমিলিত। যেন বহুদূর থেকে কথা বলে মণ্ডল—ঠাকুর জয়দেব

গোস্বামী এলি ?

তাড়াতাড়ি জিভ্ কেটে কপালে ও বুকে আঙুল ঠুকে পাপ খালন করে জয়দেব—না গো ঠাকুর। আমি নরাধম মিস্তিরীগো ৷

: নারে। আমি তো আর পালঙ্কে ঘুমাইনে। শ্যামা মার চরণে শানের উপুর শুয়্যা রাত কাটাইরে। আর পালঙ্ক চাইনে। কি হবি ওসব নরকের সুখে? কি আছে? সব অসার। দুই দিনের আরাম। সবই তো শ্যামার চরণের তলে তলায়া যায়রে। ওরে—মায়ের আমার কালা অঙ্গের রাঙাচরণের যে কি মহিমে…

বলে আবেগে ফুচ্ ফুচ্ ক'রে নাক টানে মণ্ডল।

পুঁটিরানা কেঁদে কেঁদে বলে—ঠাকুর, চারডে চাইল দ্যাও গো।

: কি হবি চাইলে! শ্যামা-শ্যামা করোগে…। এইতো তপিস্যার সোময়।

: শাক-পাতা খাতি খাতি রক্ত পডতিছে বাবাঠাকুর।

: সরকারি ডাক্তারখানায় যাওগে। আমিতো মা শরীলের ডাক্তার না। আমি মনের ডাক্তার। মন যদি হয়রে বিকল / হাতে বাঁধা সোনার শিকল / শ্যামা মারে ডাকরে ও তুই / চাইনে পাকা বাডি ত্রিতল / ও তোর মিলবে যেরে অপার সুধা / হোক না দুঃখ যতই অতল।

: হারুবাবু।

: কেডা, কেডা আমারে বাবু কয়। ওরে বাবু মানে কাবু। আমি বাবু না। ও, কলিম মিঞা।

: ব্যবস্থা না করলি তো চলে না।

: হবি, হবি। আগামী হপ্তায় লঙ্গরখানা হবি। আল্লা আল্লা করোগে। তুমার আর কী। তিন কাল গিয়্যা এককাল আছে। আল্লা ভরসা।

ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলেন কলিমুল্লাহ্। কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল শরীরে মাথাটা ঘুরে যায়। তিনি টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। গলা দিয়ে গল্‌গল্ ক'রে রক্ত ছোটে। হাত ছুঁডতে ছুঁডতে কয়েকবার গোঙানির শব্দ হয়…। একসময় হাঁ ক'রে—দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে চিরদিনের ক্ষিদে মিটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

হারু মণ্ডল চেঁচিয়ে ওঠে ঘৃণায়। এই, এই সমিরুদ্দী, এ শালো হারামখোর, শালো হারামজাদা, শালো দাঙ্গাবাজ শকুনটা আর মরার জাগা পাইলো না। উঠা।

হটা শালোর ময়লা গাড়ি। এহ্। ছাখ্, চোক্ষু দুইখান ঠিক শকুনের মতো রে…।

সমিরুদ্দী তার প্রভুর ইঙ্গিতে—কলিমুল্লাহ্‌র একটা ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় ক'রে হেচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে ফেলে রেখে এলো বড় রাস্তার ধারে।

মণ্ডল বললো—নবীন। জল ঢাল। রক্ত ধো। গোবর জল ছিটায়া—গঙ্গাজল দিয়্যা শুইধ্য কর। শালো বেজাতের মড়া! শালোগরে পুটকি দিয়্যা লঙ্গরখানা ঢোকাবো আমি।

নবীন ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—আস্তে কনগো ঠাকুর, সমিরুদ্দী আসতিছে।

: ঠিক। য্যাতোই ও শালো আমার পিয়ারের লোক হৈক, মুসলমানের পর দরদ তো থাকপিই। যাইক, আমার বড় আনন্দের দিন আইজ, পায়ের নিচি একশালোর দাঙ্গাবাজ মুসলমান ভিক্ষে মাঙতি মাঙতি প্যাঁজ ক্ষেতে গ্যালো—। শ্যাল্-শকুনে-কুত্তায় ছিঁড়্যা-কুটে খাকগে।

: সমিরুদ্দী আইস্যা পৈড়ছে ঠাকুরবাবা। হুঁশিয়ারি দেয় নবীন।

সমিরুদ্দীকে দেখে ছল্ ছল্ চোখে মণ্ডল বলে—কাছারির স্যামনে কাজী পাড়ার কেউ নাইরে সমির। তুই এক কাম করেক। খবরডা কাজী পাড়ায় দিয়্যা আয়। বড় ভাল মানুষ ছেলো কলিম মিঞ্যা। ধার্মিক লোক। তাছাড়া একজন মুসলমানের মড়া আমার চোখির স্যামনে শ্যাল-শকুনে টানি-হিচ্‌ড়ে খাবি—তার দাফন-কাফন হবিনে,…সে বড় পাপের কথারে। যা-বাবা-যা। দেরি করিস্‌নে তুই।

সমিরুদ্দী কিরকম গম্ভীর। মাথা নিচু ক'রে, একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না। চলে গেলো সে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে। বিশাল দেহটাকে পেছন থেকে দেখে মনে হলো—একটা যেন ছন্দপতন ওর চলায়। হাত দোলানিতে।

মণ্ডল সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলে—ওই নবীন। কিরে, কি মনে হৈলো অ্যা! হারামখোর পাঁঠাটার মতি-গতি খুব ভাল ঠেকলো না য্যানি!

নবীন তখন খুব জোরে পাখা চালায়। সমিরুদ্দীর সঙ্গে তার মোটেও বনিবনা নেই। হাভু-গাভু যা-তা বলে সমিরুদ্দী তাকে। মালিকের কথা শুনে সেও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে দেয়—মরুকগা। অতো ছ্যামাক থাইকতো কনে, যদি আপনে তারে ছিচরণে ঠাঁই না দিতেন? ওরম আমিও লাঠিবাজি, ডাণ্ডাবাজি করতি জানি। চানোস্ ছ্যান একবার আমারে।

নবীনের কথায় হো হো ক'রে হেসে ওঠে মণ্ডল। আর কনুই দিয়ে কোঁৎ

ক'রে একটা জব্বর গুঁতো মেরে দেয় নবীনের পেটে—সমিরুদ্দী বাঘ, তুই বাগ্-ডাঁসা—বুঝলি!

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে অনাদি খাসকেল কাছারি ঘরে ঢোকে। ধুলো-বালিতে তার গা-মাথা একাকার। মাথার ধুলো ঝেড়ে জিজ্ঞেস করে—ওরম রাস্তার উপুর পৈড়ে থাকা মড়া দেখলি লোকে আপনের কিন্তু বদনাম দিবি। টাঁইস্‌লো কখোন?

: খানিক আগে। সমিরুদ্দীরে পাঠায়ছি কাজীপাড়ায় খবর দিতি।

: কেউ আসপে না। প্যাটের জ্বালায় যে যিদিক পারে ছিটকে গিছে। যারা আছে হেগরেও ওই কলিম মিঞার দশা।

: আরে, পাপে বাপেরও ছাড়ে না। ধর্ম তো আছে 'মাথার উপুর। শ্যামা আমার জেবন্ত হে খাসকেল। কাউরে ছাড়বিনে।

খাসকেল মাথা নেড়ে সায় দেয়। তার কাঁধের ঝোলা গদির একপাশে নামিয়ে রেখে বলে—টাকা লাগবি গে।

মণ্ডলের গলায় ব্যঙ্গ নাচে—টাকা মাটি, মাটি টাকা। কার কথা কওতো?

খাসকেল আমতা আমতা ক'রে মাথা চুলকে জবাব দেয়—রবীন্দ্রনাথের।

: তুমি শালো—জেবনে একটাই কাম কৈরছো। বউখান বাগাইছো। মাথায় আর কিছু নাই।

: তালি, মাওসেতুঙের। হেই তো ধনীগরে বিরুদ্ধি, টাকা পয়সার বিরুদ্ধি নকশাল্ গরে গলা কাটতি কয়ছে।

: তুমি শালো গাণ্ডু। এই জন্যিই বউরে একখান জামদানি দিতি পারো না।

চম্‌কে ওঠে অনাদি খাসকেল। চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। এক তার ভগবান ছাড়া একথা কেউ বলতে পারবে না। মণ্ডল জানে কি ক'রে পেটের কথা!

মণ্ডলও বেসামাল—মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে পড়ায়। তাড়াতাড়ি সে ভাবে আবিষ্ট হয়। তার চোখ নিমিলিত হয়। মাথাটা পেণ্ডুলাম। শরীরে সমুদ্র ঢেউয়ে দুলতে থাকা জাহাজের তরঙ্গভঙ্গ। একবার হাসে ফিক্ ফিক্ ক'রে, আবার মুখটা, ঠোঁট দুটি শিশুদের কান্না শুরুর পূর্বমুহূর্তের উলটে যাওয়া কাঁপনে থর থর করে। এইভাবে ধ্যানস্থ থেকে প্রায় পনেরো মিনিট পরে চোখ খুলে—ঘুমে বিভোর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায়। তারপর গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে:

মা-কি আমার বসন পরে
বসনে মার কি যায় আসে
জগৎ যেথা মায়ের ঘরে
আপন ইচ্ছায় বসত করে · ।
ঢাকাই বলো—জামদানি কও
লোক দেখানো ভড়ং যত
সেই ভড়ঙে খোয়াবি তুই
শ্যামা-মায়ের চরণ ওরে···।
মাকি আমার বসন পরে···।

গান শেষের ঘণ্টা বাজে । তার ঢলো ঢলো চোখে জলের ধারায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—তুই দিন কৈলকাতায় থাকতি কত খরচ হবি তুমার ?

: শ'খানেক। বললো খাসকেল। সে যতই মণ্ডলের দিকে দেখে, ততই কিরকম বিবশ হয়ে যায়।

: খাসকেল।

: কন।

: এই যে···তুই শো আছে। বলে বুকের জামার ভেতর থেকে তু'খানা একশো টাকার নোট বের ক'রে দেয় মণ্ডল।—হ্যাঁ, মনে রাইখো, রাইটার্সে কাজে যাতিছো। সোনাগাছিতে ঘুরতি যায়ো না।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে অনাদি মাথা নেড়ে বলে—কি যে কন।

: কী কই ? ও খাসকেল, কি কই আমি ?

: উপদেশ।

: খালি উপদেশ না। উপদেশবাণী।

: আচ্ছা। আমি তালি আসি। বাড়ির দিক এট্টু নজর রাইখেন কাউরে দিয়্যা।

: খুব গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ হাক মণ্ডল। ঢলো ঢলো চোখে ঝক্ ঝক্ ক'রে ওঠে আগুন—এই তো ও খাসকেল। তুমারে মাঝে মাঝে দাগা সাহেব যে খিটকেলবাবু কয়, তা কি জন্যে কয় ? বলতে বলতে নিজের কপালে বাঁ হাতে চটাস্ ক'রে চাটি মারে সে—আমারই পোড়া কপাল। যার জন্যি চুরি করি—হেরাই আমারে চোর কয়, সন্দেহ করে ··।

শুনে খাসকেলের বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ ক'রে ওঠে। সে ভয় পায় --'সন্দেহ'

কথাটা শুনে। হায় সর্বনাশের মাথা খারাপ। মণ্ডল বিমুখ হলে—ইহকাল-পরোকাল খতম। তাড়াতাড়ি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—আপনেরে যে সন্দেহ করে, হে শালা জারজ সন্তান মণ্ডলদা।

সাথে সাথেই ধমক দিয়ে ওঠে মণ্ডল—ওই-ব্যাটা, মণ্ডলদা কি কথা? কতবার কইছি, চারিদিকে আমার নামে শ্যামামার বিগ্রহ পূজা হতিছে। লোকেরা, ব্রাহ্মণ, কায়েত, শূদ্র-বৈশ্য বাছাবাছি নাই। আইসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতিছে। বাবাঠাকুর কয়া নির্মাল্য নিতিছে। আর তুমি শালো মণ্ডলদা চালায়া যাতিছো!

খাসকেল মাথা চুলকোয়—অভ্যেসটা পুরানা তো। ভুল হয়া যায়।

: আর য্যানি না হয়। তয় বাবাঠাকুর কোয়ো না। দাদাঠাকুর।

: আচ্ছা। তালি আসি।

: আইসো। মানুদারে কোয়ো—।

: আচ্ছা।

: নোটের দরকার হলি দেবো। রিলিফের মাল য্যানি এই হপ্তায় পাই।

: আচ্ছা।

: মাল নামবি বসিরহাটে। এইডে মনে রাখতি হবে। ভোমা নিজিই নামায়ে নিবি।

: আচ্ছা।

: মদ-টদ খায়ো না। মেয়েছেলের গাও-গতরে হাত-ফাত দিতি যায়ো না।

: আচ্ছা। যাই।

: যাই বলতি নাই। আইসো।

খাসকেল বেরিয়ে গেলে মণ্ডলের মনের পাখিটা উড়াল দিয়ে চলে যেতে চায়। এবং বিড়বিড় ক'রে নবীনের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বলতে থাকে—সাবিত্রী, ইবারে তুমারে পাবোনে। তারপর তার খেয়াল হয়, নবীন তার কথা শুনে ফেলেছে। ভেবেই নবীনকে পেছন থেকে সামনে আসতে বলে—নবীন। সামনে আয়।

নবীন হাসতে হাসতে সামনে আসে—আয়ছি।

: আমার চোখির দিক তাকা।

: তাকায়ছি।

: কি শুনলি!

: সাবিত্তিরি, ইবারে তুমারে পাবোনে।

: হু। সাবিত্রী কিডা?

: খাসকেলবাবুর বউ।

: দেখিছিস ?

: হুঁউ।

: কিরম দেখতি ?

: খুব সোন্দর। পিরতিমার চালি।

: চোপ। হারামখোর—শালো চরিত্রহীন—। সাবিত্রী তোর খাসকেলের বউ ? তালি সত্যবান কেডা ? ওই ল্যাক্‌প্যাকা অনাদি ? হারামজাদা গো-মূর্খ। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী শুনিস নাই ?

: হুঁউ। জানি।

: আমি তারই কথা কয়ছি। যা, নেড়েডা য্যানে মৈরছে—গঙ্গাজল দিয়্যা ধো। রক্ত-মক্ত পৈড়ছে নাকিরে ? কুনো দাগ-পাতারি য্যানি না থাকে।

নবীনের এখন নিজেকে বাহাদুর বলে মনে হয়। তার বুক ফুলে ওঠে। সরু গোঁফে তার তা দিতে ইচ্ছে করে। মনে মনে সমিরুদ্দীর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার বাসনা জাগে। মুখে একটা বিটকেল ভঙ্গি ক'রে বলে—দাগ্‌ পাতারি তো দূরে থাইক। মাটি শুদ্ধা তুইলে ফ্যালাবো। কোদাইল দিয়্যা চাইচে—গর্ত কৈরে—তারপরে এমনি জল দেবো। তারপরে গবর জল দেবো। তারপরে গঙ্গাজল দেবো। না হলি শ্যামা মা-র বেগ্যাহ অশান্তি বাধাবি। জ্যান্ত মা আমাগরে। ক্ষেইপে গেলি রসাতলে যাতি হবে। খুঁড়তি খুঁড়তি দহ বানায়্যা ছাড়বো। ফুল দেবো। তুলসি দেবো।

নবীনের বক্তৃতায় মণ্ডল বিরক্ত হয়। কিন্তু রাগ করে না। নবীনের কথা-গুলো তাকে পরম তৃপ্তি দেয়। ওতো তারই মনের কথাগুলিই বলেছে। একটু হয়তো বেশিমাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। ফেলবেই তো। নবীন তো তারই গায়ে গা লাগিয়ে থাকে। তার সদর অন্দরের খাস ভৃত্য। নবীন বেরিয়ে গেলে তার মনে হয়, জাফর কাজীডাও যদি কলিম মিঞার মতো এরকমই মাথা ঘুরে পড়ে মরে যায়। মরবেই। না হলে শেষ আঘাতের 'মৃত্যুবাণ' তো তার হাতেই মজুত। রাবণবধের পালা সাঙ্গ হবে। ভাবতে ভাবতে তার দীপক সান্যালের কথা মনে পড়ে। হারামজাদা। বেইমান। বজ্জাৎ। কনে গেলিরে তুই ? কনে গ্যালো তোর বুদ্ধির খেলা ? কনে গ্যালো তোর কিলিক্ করা ছবিডা ! ওরে হারামখোর। পার্বতী ডাক্তারের কাছে যায়া দেখাতিছিস তোর সেই পিরীতের ছবি ?

দেখারে দেখা। আমি বিউটিরে দেখি গিয়্যা।

কাছারির সামনে নেই এখন কেউ। কলিমুল্লাহ্‌র মৃত্যুদৃশ্য দেখে—যারা ছিলো—ভয়ে পালিয়ে গেছে। একবার ইচ্ছেও হয়, কি রকম ভঙ্গিতে রাস্তায় মৃডাটাকে ফেলে রেখেছে—গিয়ে দেখতে। আবার তখুনি ইচ্ছেটাকে দমন করতে হয। বাডাবাডি হয়ে যাবে। লোকে খারাপ কিছু সন্দেহ করবে। শালো লোকরে লোক। টুপি দিয়ে—ভুকা পেটকেও শান্ত করানো যায়। এলেই শুধু বলে দেওয়া—ওই যে, রিলিফের সুন্দরী মাস্তুলডা ছ্যাখা যাত্তিছে। পালে হাওয়ার জোর নাই তো। উজান বযা আসতি সোমষ লাগত্তিছে। আর এট্টু সবুর করো রসুন বুনিছি।

আকর্ণ হাসে মণ্ডল। তারপর ধুতির কোচাটা হাতে নিয়ে একবার মন্দিরের বন্ধ দরোজার সামনে এসে দাঁডায়। সিঁডিতে মাথাটা ছুঁইয়ে প্রণাম ক'রে মনে মনে বলে—মাগো-আমি যে তোর অধম ছেইলে। দেখিস্‌, স্বগ্যো থিকে ধপাস কৈরে ফ্যালায়া দিস না।

বিউটি স্নান-টান সেরে এসে প্রসাধনে বসেছে। তার আদুল গায়ের ওপর আলতো ক'রে আঁচল ছডানো। বড আয়নায় সে মণ্ডলের ছায়া দেখে। প্রতি-বিম্বিত আকর্ণ হাসিতে।

: রানা গো-রানী-সিনান করা সাঙ্গ হৈলো? বলে রানীর গাল টিপে আদর করলো মণ্ডল।—আহা রাধের আমার মান হয়েছে। চায়া ছ্যাখো—কালা এসিছে তুমার।

: অত রংঢং ভাল্লাগে না আমার।

মণ্ডল পেছনে দাঁডিয়ে রানীর ঘাড থেকে আঁচল সরিয়ে দেয়—কি তুমার ভাল্লাগে গো শ্রীরাধিকে? কও শুনি গো। ও! কুঞ্জে তুমার কেষ্ট নাই? তা কি কৈরবে, নাই তো নাই। আর হবিনে মানব জনম, ভাঙলি মাথা পাষাণে। তো—রাধিকে, আমি তো তুমার বিয়্যা করা সোয়ামী। না হই আয়ান ঘোষ। এট্টু আধটু রস দিলি ক্ষতি কি?

একঝটকায় কালনাগিণীর মতো ঘুরে গিয়ে ফণা তোলে বিউটি—কি কতি চাও—? যা কৈবে পষ্ট কৈরে কও। কিডা আয়ান-কিডা কিষ্ট-কিডা রাধে?

মণ্ডল ঠ্যাং তুলে নৃত্যরত গৌরাঙ্গ হয়ে গেয়ে ওঠে—রাধে লো তোর প্রেমের কেষ্ট মৈরেছে বেতবুনির ঘাটে।

: তুমি আমারে মারত্তি চালি-মারো। তো এই তিল তিল কৈরে দংশন জ্বালা সৈহ্য হয় না।

বিউটির ক্রোধ ক্ষুব্ধ কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে।

হা-হা ক'রে হাসে হারু মণ্ডল। হাসতে হাসতে বিউটির গালে টোকা দেয়—মারবো গো রাধে- মারবো। সোময় হলিই মারবো।

: না, অ্যাখুনই মারো।

: হায় রাধে। যে জ্বালায়, তুই মারলি শতীনরে সেই জ্বালায় তোর কেষ্ট বিদেয় হৈলো। কারে দুষপি তুই এসোময়?

ফুঁসে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বিউটি বলে—লোকে যা কয়, তুমিও তাই কৈলে? আমিই খুন করিছি তুমার সোয়াগী বড় বউরে। লোকে কয়, সাইন্যালের সাথে শুইচি, তুমিও তাই কতিছো। তালি আমার আর বাঁইচে থাইকে কি লাভ?

মণ্ডল তুড়ি বাজিয়ে বলে—কুনোও লাভ নাই।

: আমি অসতী। ডাকিনী?

: হ্যাঁ। তুমি অসতী। তুমি ডাকিনী।

: আমি সাইন্যালের সাথে···

: এক বিছানায় ন্যাংটো হৈচো।

: কিডা দেখিছে?

: আমি দেখিছি।

শুনে চিৎকার ক'রে ওঠে বিউটি—তখন কও নাই কি জন্যি?

মণ্ডল হেসে-ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—ইট্টু ইট্টু কৈরে, তিল তিল কৈরে তুমারে জ্বালায়া-পোড়ায়া আনন্দ পাবো বৈলে। তখন কৈলি এ স্বাদ কনে পাইতাম গো শ্রী রাধিকে? ইয়্যার যে আলাদা সোয়াদ গো। যারে মারতি হয়, তারে ইট্টু ইট্টু কৈরে মারার মোদ্দি যে মজা···আহা। কি মজাগো রাধিকে। তুমি যদি হারু মণ্ডল হৈতে গো · এ মজার কি বাহার বুঝতি পাইরতে। বলতে বলতে ছুটে এসে বিউটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। ঘুরপাক দেয়।

বিউটি নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে-চেঁচিয়ে ওঠে—আমি আত্মঘাতী হবো কতিছি। শুনে ধপাস ক'রে বিউটিকে নামিয়ে দিয়ে মণ্ডল ভুরু নাচায়—হওগো দেখি।

: তুমার হাতে দড়ি পড়বি।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে মণ্ডল—রাধে আমার মুচ্‌মুচে চানাচুর। ধরলিউ মুচ্‌মুচ্ করে। ছাডলিউ মুচ্‌মুচায়। বলে ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসে। ঠোকনা দেয়

শরীরের বিভিন্ন স্থানে। ফিস্‌ফিস্ করে—আমার হাতে দড়ি পড়বি? কি জন্যি? তুই আত্মঘাতী হলি? সোয়াগী লো আমার। হারানচন্দ্র মণ্ডল কিডা জানিস? এই তিমিরপুরের ভগবান। যারে চাই তারে রাখি। যারে চাইনে, তারে রাখিউনে।

: হায় ভগবান!

বলে অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদতে থাকে বিউটি। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মণ্ডলের খুব আরাম বোধ হয়। মেজাজ ফিরে আসে। তাই আর এগোয় না। হাসতে হাসতে বলে—যাইলো রাধে।

বলে তারপর একটা জোর হাসি দিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

তিন চার ঘণ্টা রোদে পুড়ে পুড়ে চিম্‌সে লেগে কুঁকরে গিয়েছিলো কলিমুল্লাহ্‌র লাশ।

বাঁ হাঁটুটা অর্ধেক ভাঁজ হয়েছিলো। মরার সময় সোজাই ছিলো। কে জানে, হারু মণ্ডলের হুকুমে সমিরুদ্দি যখন তার ঠ্যাং ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসে রোদ্দুরের মধ্যে ফেলে রেখেছিলো, হয়তো তখনো তার হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন রাখার মৃদু প্রয়াস চালুই ছিলো। শরীরটা ছি না তখনো উষ্ণ আর ভাঙচুর করার ক্ষমতাসম্পন্ন। তারপর সম্ভবত প্রাণটা নিষ্কম্প হয়ে এলে—রোদে পোড়া শিরায় টান লেগে বাঁ হাঁটুটা ধীরে ধীরে গুটিয়ে এসেছিলো। বাঁ চোখটা বন্ধ। ডান চোখ খোলা। বিস্ফারিত। ডান হাতটা মাথার কাছাকাছি। খালি গায়ের হাড়গুলি বজ্রের মতো। পেটটার কোনো খোঁজই নেই। আদৌ তার পেট ছিলো কিনা এখন দেখলে বোঝাও যায় না। সেখানে একটা বড় গর্ত। ব্লাডারহীন ফুটবল ভাজ ক'রে রাখার মতো দেখতে। পরণের আধ ছেঁড়া লুঙ্গিটাও খুলে গিয়েছিলো। তলপেটটা চিপটে লাগা নগ্ন।

ঠোঁটের ডান দিকের কষ বেয়ে চুঁয়ে পড়া রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। দুর্ভিক্ষের মাছিরা সেখানে তখন গুনগুন ভনভন গান শুরু ক'রে দিয়েছে। মাথার পেছনে খানিকটা চুল। কপালের সামনেটা তেলতেলে। শিরাগুলি দেখে মনে হয়,

কেউ সুতো দিয়ে অপটু হাতে সেলাই ক'রে রেখেছে। নাকটা মোটা। কপালের সঙ্গে যেটুকু অংশ, সেটা আগে এত সরু ছিলো না। এখন কি ক'রে ওরকম হলো, বলা মুশকিল। পান খাওয়া লাল রঙের দুটো দাঁত হাঁ হয়ে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে আছে। নিচের ঠোঁটের মাঝখানে ফাটা দাগ। সাদাটে। দেখে মনে হয়—প্রচণ্ড তামাক খেতে খেতে ওরকম সাদাটে দাগ সৃষ্টি হয়েছে।

পঁয়ষট্টির ওপরে বয়স কলিমুল্লাহ্‌র। এক সময় জমি জিরেত ছিলো। নিজেও প্রচুর খাটতে পারতেন। শৌখিন ছিলেন। গান-বাজনার প্রতি ছিলো দারুণ আকর্ষণ। যেখানেই আসর হতো, সে কবিয়াল হোক, জারি হোক, গম্ভীরা বা মারফতি যাই হোক, যাত্রাপালা, কৃষ্ণযাত্রা, ভাসান, শুনলেই ছুটে চলে যেতেন কলিমুল্লাহ্‌। তার তখন অনেক সঙ্গী-সাথী। তারা দল বাঁধতো তার সঙ্গে।

একে একে খরা-বন্যায়-অভাব অনটনে ভৈরব মণ্ডলের দ্বারস্থ হতে হতে—শেষ বয়সে তিন-চার বিঘে জমি ছিলো সম্বল। বাকি সব এখন হারু মণ্ডলের দাগ নম্বরে মিশে গেছে। দুই ছেলে ছিলো। মহামারী বসন্তে তারা বাপকে ছেড়ে চলে গেলো। এখন সংসারে বুড়ো বুড়ি দু'জন। বুড়িটা সারাদিন বন বাঁদারে ঘুরে ঘুরে শাক-শবজি-কচু ঘেঁচু খুঁজে পেতে নিয়ে আসে। ঘরের অবশিষ্ট সামান্য শস্যের বীজ। বা সামান্য একমুঠো চাল দিয়ে এক হাঁড়ি শাক-লতা-পাতা সেদ্ধ ক'রে বুড়োকে খেতে দিতো। ক'দিন তাও জোটেনি। বুড়ি জানেও না—তার বুড়োর এই পরিণতি

আজ কুকুরের মতো মরে পড়ে রইলেন।

তার নিখোঁজ পেটের গর্তের কোথাও ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান'কে দেখা গেলো না। কারণ সংবিধান তো মানুষের জন্যে। মানুদাদের মতো মানুষের জন্য। কলিমুল্লাহ তো এখন কুকুর। রাস্তায় নানাভাবে পিষ্ট হয়ে তো কুকুরদের মৃত্যু ঘটে। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মরে পড়ে থাকে। তারপর তার ওপর দিয়ে শতশত চাকা পার হয়ে যেতে যেতে মৃত কুকুরের হাড়গোড় পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক সময় মৃতস্থানে কোনো দাগও আর পড়ে থাকে না। তাদের ভাগ্যের জোর থাকলে ডোমেরা পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগারে ফেলে দিয়ে আসে। না দিলে ওইভাবে পিষ্টিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন।

কলিমুল্লাহ্‌ তো শহুরে কুকুর না। ভারতের 'গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মতে' গেঁয়ো কুকুর। শহুরে নেড়িদের তবু একটা ইজ্জৎ আছে। গেঁয়ো নেড়িদের সেরকম কোনো পৃথক লেবেল নেই। এখানে গাড়ি-ঘোড়াও নেই।

হারু মণ্ডলরা পাইলট। সমিরুদ্দী নবীনরা চাকা। এই চাকায় যতটা পিষ্ট করা সম্ভব—কলিমুল্লাহ্‌কে সেরকমই করা হয়েছে।

কণ্ঠার নিচে নখের অনেকগুলি দাগ। পুরোনো দিনের। একবার একটা পাগলা কুকুরের সঙ্গে খুব লড়তে হয়েছিলো তাকে। কলিমুল্লাহ্‌ যখন অর্ধেকটা মানুষ ছিলেন। গলার নিচে সেই পাগলা কুকুরের ক্ষ্যাপা-বিষাক্ত নখের ছোবল।

মাথার ওপরে ঝাঁঝালো সূর্য।

ধুলোয় ধুলোয় কলিমুল্লাহ্‌র উলঙ্গ দেহে নির্দয় প্রকৃতি যেন খানিকটা দয়া-পরবশ হয়ে ধুলোর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

জনশূন্য কাকের ত্রাসজাগা দুপুরে-একজন মানুষকে মাসুদাদের ভাষায় 'পুষ্টি-হীনতা'য় মরে গিয়ে রোদে-পুড়ে ভাজা ভাজা হতে হলো।

এই হলো মহান মানুষ !

তুমি সে কথা বলতে যাও, হাজার হাজার তথাকথিত শিক্ষিত বরাহরা বলবে, ধ্রুপদী সাহিত্যের নামে হরিদাস পাল কোন্‌ ইন্দুসাহা, যার চাল চুলো নেই, বিলেত ফেরত শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, সেই হরিদাস পাল ভারতীয় সংবিধানকে কলঙ্কিত করছে।

নেহরু, গান্ধীকে লাঞ্ছিত করছে। সাহিত্যের নামে এ হলো শয়তানী। তারা হারু মণ্ডলের মতো বলে দেবে—হটাও ময়লাগাড়ি। যাতে প্রচার আছে, শ্লোগান আছে—সেটা সাহিত্যপদবাচ্য বিষয় হতে পারে না।

ক্লাসিক, এপিক, এইসব শাব্দিক বিন্যাসে তারা হট্টরোল তুলে চেঁচাতেই থাকবে। তো তাদেরকে একটা কথাই বলা যায়—

ওহে পণ্ডিতমন্যের দল—

প্রেম যদি প্রচার পেয়ে—'প্রচারের প্রেম' বলে নিন্দিত না হয়ে নন্দিত হয়, তাহলে যে পেট বাঁচলে আমি আমার প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারি, তো সেই ক্ষুধাহরণের জন্যে কোনো প্রচারের কথা বলা হলে—তা সাহিত্যে তোমাদের হাত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হবে কেন ? তা 'প্রচার ধর্ম' বলে নিন্দিতই বা হবে কেন ?

তোমাদের মগজের পচন এখন কোন্‌ পর্যায়ে এসেছে—সেইটে যদি ধরতে পারো তো ক্ষুধাহরণের সাহিত্যের কথা—প্রচারের সাহিত্য বলে নিন্দা করার ধৃষ্টতা দেখাবে না।

ঘামতে ঘামতে মাথার ঘাম যখন ঠোঁট চুঁয়ে মুখে লাগে—তখন কাজীর চৈতন্য হয়। তিনি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কলিমচাচার লাশের পাশে। নিজের ঘামের নোনা স্বাদ তার সম্বিৎ ফিরিয়ে দেয়।

মজনু আর জয়নাল গেছে মসজিদে খাটিয়ার জন্যে। ওদের আসতে দেরি হলো। এবং ফিরে এলো শূন্য হাতে।

ইমাম সাহেব খাটিয়া ছুঁতে দেননি। তিনি বলে দিয়েছেন, জাফর কাজী কাফের। কম্যুনিস্ট! কলিমুল্লাহ্‌ও তাই। আল্লাহ্‌র ঘরের খাটিয়ায় ওঠার মতো নেকি কাজ তাদের জীবনে তারা করেনি। খাটিয়া পাবে না। মুর্দার দাফন কাফন হতে পারে না। ভাগারে ফেলে দিও কাফেরের মুর্দা। আর মুসলমান হলে তো জানতে হবে? কাফেরের মুর্দার জানাজা হয় না। মাটি হয় না। নিয়ম নেই।

মজনু খুব উত্তেজিত। সে গোলমাল পাকাতে চাইছিলো। কাজী তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তরুণ মজনুর মাথায় রক্তের তেজ এতই প্রখর যে, কোনোমতেই সে শান্ত হতে চাইছিলো না। মণ্ডলের কাছারি ঘরের সামনে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলো সমিরুদ্দী। সেই গিয়ে তাদের খবর দিয়েছিলো কাজী পাড়ায়। তবু তার ওপরেই সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মজনুর। সে কাজীর হাত ফস্‌কে নিজেকে মুক্ত ক'রে ছুটে গেলো সমিরুদ্দীর দিকে।

চিৎকার করতে লাগলো উন্মাদ যন্ত্রণায়—শালা, তুই, তোর প্রভু, হারামখোর হারু মণ্ডলরাই এই গিরামডারে শ্যাষ কৈরে দিলি। তুরা কতবড় বেইমান, কতবড় কুত্তারে, যে কলিম চাচার মতো না-খাওয়া মানুষের মুর্দাডা—পশুর মতো টাইনে হিচ্‌ড়া এই রাস্তার মোদ্যি ফ্যালায়া রাখছিস। বলতে বলতে নিজের বুকে দমাদম ঘুষি চালায় মজনু। লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সমিরুদ্দীর ওপরে—আয়, আয়, আমিও আইজ নাখাওয়া। হররোজ রোজা এখন আমাগরে। আয় শ্যাষবার—মরার আগে একবার বুঝাপড়া কৈরে নেই। কণে তোর ভণ্ড মালিক, শালা সুদ খোর, জমিখোর, হারু মণ্ডলরে ডাকেক। ডাকে নিয়্যা আয়··· যা···। ওই সমিরুদ্দী শালা মানুষ নামের কলৈঙ্ক—যা ··।

: মজনু। মজনু। আমরা মানুষ। আমাগরে বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, সততা আছে। এইরম ভাবে কুত্তার পায় আমরা মানুষের দাঁত বসাতি পারি নারে বাপ···

: কেডা। কেডা। সক্রোধে বিদ্রোহী মজনু ফিরে তাকিয়ে দেখে ঈশ্বর বাউল তাকে দুই হাতে পেছন থেকে জাপটে ধরে আছে।

আশ্চর্য সংযত দুর্ধর্ষ সমিরুদ্দীর কণ্ঠস্বর। অন্য সময় হয়তো খালি হাতেই মজনুর কোনজেটা টেনে উপ্‌ড়ে ফেলে দিতো। এই মুহূর্তে সে একটা পা-ও

এগুনোর চেষ্টা করলো না। তার চোখে কোনো হিংস্রতাও ফুটে উঠলো না। শুধু আঙুল তুলে ধীরে ধীরে বললো—মণ্ডল বাড়িতি নাই। থাকলি অঘটন ঘৈটে য্যাতো। তুমরা যাও। চৈলে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে মারমুখি হয়ে ওঠে মজনু—অ্যাই ও। কিসির অঘটন ঘটপিরে আর? তামাম তিমিরপুর মৈরে ফাউস হয়্যা গিছে। ইয়্যার থিকে বড় অঘটন আর কি আছে? অ্যাই সমিরুদ্দী, আঙুল নামা। আঙুল নামায়্যা কথা ক।

চিৎকার ক'রে ওঠে সমিরুদ্দী—মজনু।

লাঠি হাতে ছুটে আসে নবীন—হল্লা কিসির?

ঈশ্বর তখন মজনুকে টানতে টানতে ফিরে আসে কলিমুল্লাহ্‌র লাশের কাছে। —মজনু, এখন আমাগরে মার খাওয়ার সোময়।

গর্জে ওঠে মজনু—তার মানেডা কি? সবাই মার খায়্যা শ্যাষ হয়্যা যাবো?

ঈশ্বর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—যাগরে ঘামে ফসল ফলে, তারা দুই চার হাজার মরতি পারে, কিন্তু শ্যাষ তারা হয় না। পালটা ঘা য্যাখন দিতি পারবো—তখন ওই ফসল যারা লুঠ করে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়্যা যাবি। ইতিহাস কয় এই কথা। এখন চলো—কলিমচাচারে উঠাও। কাফনের কাজ সারো। তারপর মাটি দেওয়ার কাজটা সারি।

মজনু গোঙাতে থাকে। তার হাত-পা-বুক-মস্তিষ্ক অশান্ত। তীব্র হিংসতায় জ্বল জ্বল করে চোখের মণি। কাজী তাকে ভৎর্সনা করেন—এসব কি হ'তিছে মজনু? এইভাবে কতক্ষণ রৈ-দে-ধুলায় শুকায়ে কাঠ হবি কলিম চাচা? লাশ উঠাও। ধরো। আমি কাঁধে কৈরে নিয়া যাবো। লাগবিনে ইমামের খাটিয়া। সে যদি আল্লাহ্‌র ঘরের ম্যালিক হাতি চায় হৈক। আমরা জায়গিরদারি করতি চাইনে। উঠাও।

মজনু মাথা নেড়ে জবাব দেয়—আমি কাঁধে নেবো।

ঈশ্বর বাউল বলে—এভাবে মুর্দা নেওয়া যাবিনে। আমার এই চাদরে শোয়ায়া দ্যাও। আমরা চাইরজন আছি। চাইরপাশে ধৈরে নিয়্যা যাবো।

সবাই ঈশ্বরের যুক্তি মেনে নিয়ে কলিমুল্লাহ্‌র লাশ ওঠায় চাদরে। তারপর চারজনে চারপাশ ধরে ধুলোয়-ধরায় গৈরিক পথ ধরে চলে যায় কাজীপাড়ার দিকে।

মজনু পেছনে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে সবাইকে থামিয়ে দেয়। চার জোড়া চোখ দেখতে পায়-ধুলোর ঘূর্ণী ভেদ ক'রে ছুটে আসছে এক শুভ্রা নারী মূর্তি।

ঈশ্বর বাউল ধীরে ধীরে বলে—টিয়া।
কাজীর বুকের গভীরে হুহু ক'রে বয়ে যায় রক্তের রোদন।

আর কবরে লাশ নামানোর সময় সেই রক্তাক্ত আবেগ কাজীর দু'চোখ ছাপিয়ে সশব্দে চমকে দেয় চারপাশ ঘেরা মানুষগুলিকে।

কাজী আশমানের দিকে গ্রীবা টান ক'রে অসহনীয় চাবুক খাওয়া যন্ত্রণাকে নিক্ষিপ্ত করেন প্রচণ্ড আবেগে—। নতজানু তার সেই মূর্তি যেন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ হয়ে ওঠে। তিনি আবৃত্তি করেন—

"ইন্নামাল আ'মালু বিন্—নিয়্যাতি।'
ফলাফল সৎকাজের
সঙ্গে বাঁধা নিয়তের···
"আল মুসলিম মান সালিমাল মুসলিমুনা মিল্লিসানিহি
ওয়া ইয়াদিহী···"
সাচ্চা মুসলমান কহে সেই ব্যক্তিকে
জিভ আর হাত থেকে যার অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন বিধ্বস্ত হৃদয়াবেগে কাজী জাফর ইমাম। আর তিনি ভুলে যান তার পারিপার্শ্বিকতা কোন্ নিঃসীম আশমানের ভাসমান গ্রহলোকে তিনি ভাসছেন বেলুনের মতো। ভাসছেন আর বলছেন—কলিমুল্লাহ্, তুমি তো সারাজীবন ফলাফলের যোগফলে সাচ্চা আছিলে. খালি মুসলমান না, অন্য কুনো ধর্মের মানুষও তুমার কাছ থিকে অন্যায় পায় নাই···অথচ তুমি কুত্তার মতো ··

আর ওই ইমাম···যার জীবনধারা, যার জীবনাচরণ গুনাহ্গারির, চরম যোগফলে···

"লা য়্যাদ খুলুল জান্নাতা খাববুন—
ওয়ালা বখীলুন ওয়ালামান্নান··

প্রতারক— গঞ্জনাকারী, কৃপণ কখনো তো স্বর্গে যায় না। যাতি পারি না ··

তালি ইমামের ঘরে সুখ ক্যা? ইমাম তুমার মুর্দা বহনের জন্যি খাটিয়া ছায় না ক্যা?

কেডা ইবলিশ?

কাজীর সমস্ত দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। তিনি 'নাস' আবৃত্তি করেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
কুল আউয্ বিরাব্বিন্ নাসি মালিকিন নাসি।
ইলাহিন নাসি। মিন শাররিল অসওয়াসিল খান্নাস।
আল্লাযী ইউওয়াসভিস্ ফী ছুদুরিন নাসি মিনাল
জিন্নাত অন্নাসি।

শয়তান তালি কে?
কুমন্ত্রণা দ্যায় যে মানুষকে।
দুষ্ট চরিত্র যার
শয়তান নাম তার।

কেউ বুঝতে পারে না কাজীর অন্তরের বেসামাল বরফগলা ঢল কিভাবে তাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে যায়। টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

আলো।

আলোর দিকি যাতি চাও—না আন্ধারে, কবরের আজাবের মোন্তি?

মাছখানে কুনো পথ নাই। উপায়ও নাই।

জীবন্ত শরীলে শ্মশানের চিতায় জ্বলতি চাও—নাকি যারা তুমাগরে চিতার কাঠ বানায়া নিজিরা সুখের স্বর্গ বানাতিছে, অট্টহাসি হাসতিছে—তাগরে মুখোশ-গুলান টাইনে ছিঁডতি চাও…

পষ্ট কথা চাই।

পষ্ট জবাব চাই।

ঈশ্বর বাউলের কথা শুনতে শুনতে কাজীর ছাতিম তলার মাঠ যেন ফুঁসে ওঠে। পুঁটিরানী সরমারা কেঁদে ওঠে। জয়দেব মিস্ত্রী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

হাজার মানুষের অশ্রুভেজা চোখ আশমানে তাকায়। হাজার প্রার্থনার হাত বজ্রমুঠ হয়ে ওঠে। মনে মনে অপমানের তুষাগ্নি।

ঈশ্বর বলে—তুমরা কাজীদারে জোর কৈরে নিয়্যা গ্যালা হারু মণ্ডলের দরবারে। তারে অপমান কৈরলে। আওয়াজ দিলে। ভণ্ড-ঘুষখোর কয়া তাড়ায়ে দিলে। নিজিরা প্যাটের জ্বালায় লাইন দিয়্যা সাদা কাগজে টিপ ছাপ দিলে। কনে গ্যালো লঙ্গরখানা? কনে গ্যালো রিলিফের চাল-গম? তুমরা জানো—রামেশ্বরপুর বাজারে—মণ্ডলের তিন তিনটে গুদাম ঘরে হাজার হাজার বস্তা-চাল-গম মজুত। সেসব কন থিকে আসে? জানো না, কিস্সুই জানো

না তুমরা ? খালি—ভুকা প্যাটে হাত পাততি পারো সেই তাগরে কাছে, যারা তুমাগরে আইজ ভুকা-নাঙা কৈরছে। তুমাগরে মা-বৈনের ইজ্জৎ-এর উপুর দানবের মতো ছোবল দিছে। তুমাগরে জীবন, তুমাগরে সরলতা, প্রেম-ভালবাসা ছিনতাই কৈরছে দস্যুর মতো।

কলিমুল্লাহ চাচার মৃত্যুর কথা তুমরা মনে কৈরে ছাখো। যে ছাশে একদিন বারোমাসে তের পার্বণের ধুম দেখিছি, মানুষে মানুষে ভালবাসার দোস্তি দেখিছি, সেই ছাশে আইজ হিন্দু-মুসলমানের মোদ্দি যারা বিষ ছড়ায়ে—দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ম দিছে—তাগরে চিনতি ভুল কৈরলে—হাজার বছরেও আমরা এই ভাই-ভাইয়ের মোদ্দি হানা-হানি ঠ্যাকাতে পারবো না। কলিম চাচার মৃত্যুরে ঠ্যাকাতে পারবো না। ওইরম পশুর মতো অনাহারে—রিলিফ মাঙতি মাঙতি পথের মোদ্দি পৈড়ে মরা ছাড়া আর কুনো পথ থাকপিনে।

এইযে যোলোজন মানুষ খুন হয়া গ্যালো—কি জন্য ? ওই ভোমা, ছাত্র নেতা খুব নেতা ভোমারা আয়ছিলো মদমত্ত হয়া আমাগরে ঘরের মা-বৈন্‌রে টাইনে নিয়্যা তাগরে পশুবিত্তি মিটাতি। তুমরা বাধা দিলা। উরা তার বদ্‌লা নিলো।

এখন এই খরা। এই হাহাকার। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিলো অনেক বড। সে ছিলো যুদ্ধের অভিশাপ। যুদ্ধের ফল। যুদ্ধের সোময় ধনী ব্যবসায়ীরা খাদ্য-সামগ্রি লুকায়া রাখে। চড়া দামে বিক্রি করার আশায় বাজার থিকে জিনিস-পত্র উধাও কৈরে ছায়। আর আইজ এই অঞ্চলের এই আকাল খরার জন্যি। খরা না হলি অভাবের মাত্রা অ্যাতোড়া হৈতো না। সরকার ইচ্ছা, করলি এই আকাল সাত দিনিই ঠ্যাকায়া দি'তি পারে। সরকার তা করবিনে। লোক দেখ্যাত তারা যেটুকু সাহায্য রিলিফ ছায়—তাও আসে হারু মণ্ডলগরে হাত দিয়্যা। সে রিলিফ মজুত হয় গিয়া মণ্ডলগরে গুদামে। সেখেনে পুলিসের পাহারা থাকে। মণ্ডলের সাকরেদগরে পাহারা থাকে। মাস্তানরা ভাগ পায়। আর তুমরা ? যারা ফসল জন্মাও, ইমারত বানাও, ধনীগরে রাজার সুখের রসদ বানাও, মদ-মেয়েছেলে নিয়্যা ফুর্তির যে জগৎ তাগরে, তার সবটাই তুমাগরে শ্রমের ঘামে তৈরি। তুমরা মরো কলিমুল্লাহর মতো—কুকুরের মৃত্যু। তুমাগরে মুর্দা ঠ্যাং ধৈরে টাইনে নিয়্যা পথের উপুর চিৎপাত কৈরে ফ্যালায়া রাখে, আর ওই হারু মণ্ডলগরে দালাল, ইমাম সাহেবরা কয়, কলিমুল্লাহরা কাফের, তাগরে দাফন কাফন নিষেধ। কবর দেওয়া নিষেধ।

ঈশ্বর ঋজু হয়ে দাঁড়ায়। তার চোখে মুখে ইস্পাত পোড়া দীপ্তি।

মুকুন্দ দাস কয়ছে—দ্বেষ-হিংসা পায় দলে / আয় ছুটে আয় চলে / কোটি-কোটি হিন্দু মুসলমান / মরণ সাগর পার / হতে হবে সবাকার / ভাইরে দিন গেল বেলা অবসান।

দুঃখের রাত ভোর হবিরে ভাই।

মনড্যারে বাঁধো। শক্ত করো। তাগদ চাই ভুকা প্যাটে হিংসের উনোন জ্বালায়া রাখো। আশমানের দিক হাত বাড়ায়া ভিক্ষে চালি কিছু হবিনে।

তুমরা সাদা কাগজে সই দিছো।

ফিরায়া নিতি হবে সেই কাগজ।

না হলি—যার জমি আছে—তার জমি যাবি। যার জমি নাই, চালে টিন আছে, তার টিন যাবি। যার কিছুই নাই, ঘরে জোয়ান—ঝি-বউ আছে—তাগরে ঝি-বউরে ছিনতাই করবি।

কারো রেহাই নাই।

একটা গুঞ্জন ওঠে।

: আমরা যাবো মণ্ডলের কাছে যাবো দল বাঁইধে।

: যাবোই। ইবার মাঙামাঙির কথা নাই।

: ঠিক কথা। আমরা রিলিফ পাই নাই। লঙ্গরখানা হয় নাই, ফাঁকিবাজি কৈরে সাদা কাগজে সই নিছে।

: কাগজ ফিরায়া দ্যাও।

: কলিম মিঞারে ঠ্যাং ধৈরে কু·ার মত রাস্তার পর ফ্যালায়া রাখছিলা। হাড়বজ্জাৎ মণ্ডল। তুমি আমাগরে জানী-দুশমন।

: ওই হারামজাদা সমিরুদ্দা। হের শরীলে অ্যাতো চিক্‌চিকে ত্যাল কিসির ?

: সমিরুদ্দার হাতে বহু নিরীহ মানুষ খুন হইছে। আমরা ইবার হের গতরের ত্যাল খসাবো।

পঁচাত্তর পার মায়মুনা বিবি কেঁদে কেঁদে বলে—আমার বংশে বাতি দিবার কেউ থাইকলো না গো বাবারা। আকালে আমার দুই ছাওয়াল গ্যালো, নাতি গ্যালো। ঘরের বউডা কনে গ্যালো পাগলের মতো—আল্লা মালুম। আমার এই ছেলো নসিবে ।

মজনু লাফিয়ে ওঠে—চলো, চলো, সবাই, মণ্ডলের সাথে খ্যাষ বোঝাপড়া করি।

জয়দেব মিস্ত্রী চেঁচায়—আমার হাতে গড়া পালঙ্কে শুয়্যা বউ নিয়্যা আরামের

রাইত কাটায় সেই জানোয়ারডা আর আমি ভুকা মরি। আমার ঘর সংসার ভাইসা যায়। চলো—হে। অ্যাখোনো এই বুড়া গতরে—না খাওয়া পাঁজরে যেটুক জোর আছে…বাইস্‌লেডা ঠিক চালাতি পারবো। তছনছ কৈরে দেবো হের সাজাইনা বাগান।

উঠে দাঁড়ায় কলিমুল্লাহর কবরের চারপাশ থেকে হাজার কলিমুল্লাহরা।

কে জানে—কোন রসাতলে যাবে আজ তিমিরপুরের দানবীয় মসনদ।

সেইসময় নিথর হয়ে থাকা কাজী মাথা উঁচু করেন। তিনি সবেগে মাথা নাড়েন—না। তুমরা থামো।

: না। না। থামাথামি নাই আর।

: আমরা ভিক্যে মাঙতি যাতিছিনে।

: আমরা আমাগরে টিপ্‌ ছাপের কাগজ ফিরায়ে নিতি চাই।

কাজী উঠে দাঁড়ান রাশছেঁড়া জাগরিত ভুকা নরনারায়ণের মিছিলের সামনে। তিনি বুঝতে পারেন, এরা মানবে না কোনো প্রবোধবাক্য। কোনো সান্ত্বনার কথা। ওরা নিজেরা এই সংহার মূর্তি নিয়ে একবার মণ্ডলের সামনে গেলে—খুন হয়ে যাবে মণ্ডল। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে তার ঘর-বাড়ি। যার পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ। আরো হিংস্র।

মজুররা পা বাড়ায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার রোষদৃপ্ত অগ্রগতির সামনে এসে হাত তোলেন কাজী। চিৎকার ক'রে বলেন—আমি যাবো তুমাগরে সাথে। কিন্তু কিড়ে কাটতি হবি, কথা যা কওয়ার আমি কবো তুমাগরে পক্ষ হয়া। যদি অন্যায় কিছু কই, তখন তুমরা আমার কথা মাইনোনা। যা খুশি কৈরবে তখন। কিন্তু আমি যদি ন্যায়কথা কই, তালি তুমরা টু-শব্দ করতি পাইরবে না। তুমরা যদি কথা দিতি পারো—তালি আমি আছি। ঈশ্বরদা আছে। আর থাকপি—সেই তারা, যারা নয়া সমাজ গড়ার জন্যি ফেরার হয়া অপেক্ষা করতিছে সুযোগের।

জয়দেব মিস্ত্রী বলে ওঠে—কাজীদা, তুমারে আমরা চিরকাল মাইনে আয়ছি। আইজও মানবো। কিন্তুক কথা একটাই, আর কুনো ধানাই পানাই করলি মণ্ডলরে ছাড়া হবিনে।

: ঠিক। ছাড়া হবিনে।

কাজী বলেন—তালি আর একটা কথা মানো, এই ভর দুপুরবেলা যায়া কাম নাই। রৈদের তেজ এট্টু কম হৈক্। বিকাল-বিকাল যাবো আমরা সকলে একসঙ্গে।

: একসঙ্গে যাতি হবে। বলে মজনু।

: আমরাও যাবো গো বাবারা। বলে সরমা।

: আমিও তুইখান কথা কবো মণ্ডলরে। লাঠি ভর দিয়্যা ঠিক যাতি পারবোনে—নিবানা তুমরা আমারে? মায়মুনা বিবি তার পঁচাত্তরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সম্মতির অপেক্ষা করেন।

ঈশ্বর তাকে আশ্বস্ত করে—আমি নিয়্যা যাবো তুমারে।

খুব খুশি মায়মুনা। তার ঘোলাটে চোখে যৌবনের দীপ্তি ঝক্‌মক্ ক'রে ওঠে।

ঈশ্বর বলে—এই ছাতিমতলা থিকে একসঙ্গে যাবো। যে যার মতো চৈলে আসপে।

: আস্‌পো। আস্‌পো।

ফাঁকা হয়ে যায় ছাতিমতলা।

এতক্ষণ শোনা যায়নি একটা তৃষ্ণার্ত ঘুঘু অনেকক্ষণ থেকে ছাতিমের ডালে বসে ডেকে যাচ্ছিলো—ওক্‌কুরোও—ওক্‌কুরোও।

তার মানে কি?

হারু? হারু?

ও—ও তৃষ্ণায় জল চায়? চঞ্চুতে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে শস্য চায় ভুক মেটাবার?

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ঈশ্বর বাউল আর কাজী।

ঠা-ঠা রোদ। ঝল্‌সে যাওয়া দিগন্ত।

ছাতিম গাছের দক্ষিণ দিকে নাবালভূমি শুরু। তার কাছে বঁইচি গাছের ঝাড়। শেঁয়াকুল আর ধার ঘেঁষে নাটা-কাঁটার ঝোপ।

বর্ষার শুরুতে—বৃষ্টির মরশুম শুরু হতে হতেই প্রচুর ধানী ঘাস হতো। এবার মোথা হয়ে আছে। বুক সমান সেই ঘাসে খেকশিয়াল, ভোঁদড়, সজারু, ভামেদের আস্তানা হয়ে যায়। কখনো কখনো দলছুট দু'চারটে খরগোসও লাফ-ঝাঁপমেরে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলে যায়।

জঙ্গলে বনমোরগেরও একসময় খুব আনাগোনা ছিলো। এখন নেই। অভাবী হাত তাদের শিকার করতে করতে শেষ ক'রে এনেছে। এখন নেই।

চারদিকে তাকিয়ে দেখে ঈশ্বর কি একটা বলতে যাচ্ছিলো—তখনই চোখ পড়লো নাবালের দিকে।

বঁইচির ঝাড়ের আড়ালে কে যেন. ধুলোর ওপরে বসে আছে, এক চিলতে ছায়ায়। দেখে বুঝতে পারলো না।

কিন্তু অবাক হলো। কে ওই ঝাঁ-ঝাঁ রোদেলা দুপুরে একলাটি বসে আছে। কেন?

: কাজীদা। তুমি ঘরে যাও, আমি প্রাকিতিক কাজ সাইরে আসতিছি।

: দেরি কৈরো না।

: না।

কাজী চলে গেলেন মন্থর পায়ে।

ঈশ্বর এগিয়ে গেলো নাবালের দিকে। খানিকটা যেতেই চিনতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। আর তখনই মনে পড়ে গেলো—কাফনের কাপড়টা টিয়াই দিয়েছিলো কলিমুল্লাহর জন্যে। তারপর যে সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো। এইখানে এতক্ষণ আত্মগোপন ক'রে বসে আছে কোন্ অভীষ্ট নিয়ে কে জানে। আশ্চর্য মেয়ে ও। কথা বলে না। অথচ সব বিপদে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওকে ডাকতে হয় না। কোনো কিছু বলে দিতে হয় না। একসময় সে খুব গিয়েছে পার্বতী ডাক্তারের কাছে। উপকারের তো কোনো তুলনাই করা যায় না। রামেশ্বরপুর পোস্ট অফিসে পার্বতী ডাক্তারের একটা টাকা-পয়সার কিছু ছিলো বলে সে জানতো। কি ক'রে ওর চলছে, কেউ তা জানে না। কেনোদিন কারো কাছে কিছু বলেওনি সম্পত্তি তো সবই ভরু মণ্ডলের হাতে লোপাট হয়ে গিয়েছিলো।

ওকে দেখে বোঝা যায় না কিছুই। ভীষণ গম্ভীর আর স্বল্পভাষী। অথচ তল্লাটের সকলেরই প্রিয় মানুষ। কাছের মানুষ।

গেরঁদের লোকেরা বলে—মা লক্ষ্মী গো তিনি। উপকার করে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেয়। বাচ্চাদের সে খুব ভালবাসে। তারে তুখামোদ করতে হয় না। আপনি থেকেই আসে। দিনমান কাটিয়ে যায়। কারো ঘরের কিছু মুখে দেয় না। না-না। ঘিন্না-টিন্না হবি কিসি? ওইতার স্বভাব। ঘিন্না হলি কি আর চাষা-ভুষোর ঘরে আসেন গো মা-লক্ষ্মী?

কাজীদাকেও অনেকবারই বলেছে টিয়ার কথা। কাজীদা এড়িয়ে গেছেন। কখনো বলেছেন—তার মতো তারে চৈলতি দ্যাও। যে নিজিই দশজনের ভার বইতে পারে, তার ভার বহন করায় কুনো দরকার হয় না গো ঈশ্বরদা। এসব কথা থাইক। যদি পারো—তালি চিষ্টা কৈরে দেখতি পারো—তারে কুনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতি পারো কিনা। বই-পত্তর দিও। মনডা তো ভাল। আর ভাল বৈলেই জীবনডা আকাল হয়া গ্যালো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন কাজীদা—ভাল মানুষের জন্যি আজন্ম-আমৃত্যু আকাল হয়।

ঈশ্বর কিছু বলেনি আর।

একবার কথা বলেছিলো গিয়ে। টিয়া হেসেছিলো এক-তেপান্তর বিষণ্ণতার ছায়া ঘেরা হাসি। তার সেই হরিণকালো চোখের গভীরে যেন অসীম বেদনার লীলাভূমি।

ঈশ্বরদাদা···য্যামন আছি—ত্যামনই কাটায়া দেবো জীবনডা। ওসবে আর টানতি চায়ো না। আর আমারে টানতিই বা হবি ক্যা? আমি তো নাড়ির টানে ছুটে যাই গো। যাবোও।

ঈশ্বরের তখন অভিভূত দশা। কি ভাল কথা যে বলেছিলো সে। নাড়ির টান। সে তো আসল হে। অকৃত্রিম। শোক দেখানোর কোনো ভনিতা নেই আমাদের দেশের মন্ত্রী'দের মতো। তারা ফ্রায়েড রাইস, মাটন রিজলা, বা হাল্‌কা লাঞ্চে স্টাফড চিকেন আর মনোরম স্যালাড, স্যুপ খেয়ে বিকেলের ঘুম-ভাঙা আয়েসি ফোলা ফোলা চোখ মুখ নিয়ে মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। তার আগে তো কত বিশেষণ—দিল্লি থেকে—মস্কো ঘুরে, বাকিম হাম প্যালেস ছুঁয়ে, হোয়াইট হাউস ঘুরে—তবে তার জীবন কার্তন বর্ণনার সংক্ষেপ সার শেষ হয়। তিনি মাইকে দাঁড়ান। সাজানো গোছানো—মাছি-পিচ্ছিল মঞ্চ। সামনে বুলেটপ্রুফ বেরিকেড। আরো সামনে সিকিউরিটি। আরো সামনে শুয়ারের বাচ্চা জনগণ।

করতালিমুখর শুয়ারের বাচ্চাদের সামনে মন্ত্রী ও নেতামহোদয়গণ মাপা কোল্ড বিঅর সিপ্ করা ঠোঁট ফাঁক ক'রে হাসেন। ব্ল্যাকলেবেল বিঅর এর ঠোঁটে ´ ·ন্তু সুচিত্রা সেনের হাসি।

শুয়ারের বাচ্চা জনগণ সেই হাসির ক্লিকে হারিয়ে টারিয়ে--ময়দান বা ব্রিগেডের পাশে—শাড়ি তুলে হিসি করতে বসে ২.১ সার সার।

কেবা নারী। কেবা পুরুষ।

হিসি। হিসি। হিসি।

ঈশ্বর এসব নিজেই দেখেছে। দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে—ছুটে গিয়ে মঞ্চ থেকে সুচিত্রা সেন হাসিটাকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দেয়—নরনারী শুয়ারের বংশধরদের হিসির মিছিলে।

ভাখ শালা গাণ্ডুরাম···এই হলো জাতীয় পরিস্থিতি!

এই হলো জাতীয় সংহতি।

ঘুঘুটার কি মাথা-টাতা খরোপ নাকি? ওক্‌কুরোও ওক্‌কুরোও।

সেই যে ডাকছে—তার আর থামাথামি নেই। একটানা ডেকেই চলেছে। কে জানে, ও ওর তেষ্টার জল, চঞ্চুর শস্য না পাওয়া পর্যন্ত ডেকে ডেকে জানান দিয়ে যাবে একইভাবে। ঈশ্বর এগিয়ে যেতেই টিয়া উঠে দাঁড়ালো ত্রস্তে।

: তুমি একলা যে?

: ঈশ্বর দা।

ঈশ্বর কিরকম চমকে ওঠে টিয়ার মুখ দেখে। কি আছে সেই সন্ন্যাসিনীর মুখে? অযুত ক্রোধের নীল ছোবলের সঙ্কেত? সে কাঁপছে থর থর ক'রে। দু'চোখের তারায় খরতাপ সূর্যের বিস্ফারন ঝল্‌কে উঠেছে সুতীব্র গভীরতায়।

একবার ঢোক গিললো। আর খুব গম্ভীর অথচ দাঁতচাপা স্বরে—গ্রীবা টান ক'রে বললো—আমাকে একটা উপহার দিবা?

বিস্ময়াভিভূত ঈশ্বরের বিস্ময় তখনো শেষ হয়নি। সে জানতে চায়—আমি কি উপহার দিতি পারি তুমায়?

টিয়া তেমনি ঋজুময়ী—একটা পিস্তল চাই ঈশ্বরদা।

সারাজীবনভর অভিজ্ঞতার পাহাড় যার মাথায়, সেই ঈশ্বরেরও বুকটা আচম্‌কা দুলে ওঠে। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারে না। স্থির চোখে অবাক হয়ে শুধু টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে টিয়াকে। টিয়ার অন্তর আর বাহিরকে। তারপর একসময় মাথা নেড়ে যেন বিড় বিড় ক'রে নিজেকেই প্রশ্ন করে সে—ক্যাযে তুমি আত্মঘাতী হবে?

ফুঁসে ওঠে ছোবল দেওয়ার ভঙ্গিতে পদ্ম-গোখরা টিয়া—না।

: তালি?

: নিজির হাতে বদ্‌লা নিতি চাই।

: হারু মণ্ডল?

: সোময়মতো জানতি পারবে। ঈশ্বরদা, তুমি এই একটা বাসনা পূরণ করো আমার। আমি জানি তুমার কাছে সে জিনিস আছে। মাত্র সাত দিনির জন্যি দিবা। আবার ফিরায়ে দেবো তুমার জিনিস।

: না। আমার কাছে পিস্তল থাকপি ক্যা?

টিয়ার মধ্যে কোনো বিহ্বলতা জাগে না। কোনো ছায়াও পড়ে না নতুন ক'রে তার মুখে। সেই একছায়া। সন্ন্যাসিনীর বেশে এ কোন্ ত্রিলোক ত্রাসিনী

ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। যার চোখের দ্যুতির দিকে চেয়ে থেকে মিথ্যাচার করা যায় না বারবার। যে তার সর্বংসহা বাহিরের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে ধারণ করতে চায় সংহার মূর্তি। বদ্‌লা নিতে চায় শুদ্ধাচারী মানুষের বিরুদ্ধে যে পাপ-পঙ্কিল নিষ্ঠুরতা দেয়াল হয়ে'দাঁড়িয়ে আছে জীবন সংহারের প্রেতকায়ায়—তাকে বিধ্বস্ত ধ্বংস নির্মূল করার বাসনায় সে অস্ত্র নিতে চায় হাতে।

বদ্‌লা।

বদ্‌লা কি?

কৃষ্ণপ্রেমে, ভগবৎপ্রেমে সর্বংসহা চিত্তবৈকল্যনাশের উপায় কেউ অবলম্বন করলে—আবার তাকে ফিরে আসতে হয় এইভাবে—এক অসুরদলনকারী বাউল বেশী সমাজরূপান্তরের আদর্শধারী পুরুষের কাছে, পুরুষকারের সমীপে—অস্ত্রের জন্যে।

অস্ত্র চাই।

অস্ত্রহীন মানুষ বদ্‌লা নিতে পারে না।

অস্ত্রহীন মানুষ অর্থহীন।

অর্থহীন মানুষের অর্থ তার অস্ত্র।

ঈশ্বর তখন আপন মূর্তিতে তার সাধকের কাছে স্বরূপে উন্মোচিত হয়। আদর্শের জন্যে অস্ত্রের তপস্বিনী তার কাছে প্রিয়তম, শ্রেষ্ঠতম। কোনো দ্বিরুক্তিতে নিজেকে আড়াল না ক'রে ঈশ্বর বলে—সকল পীড়িত মানবাত্মার জন্যি বদ্‌লার অস্ত্র যদি তুমি ধারণ করতি চাও—আমি অস্ত্র দেবো তুমায়। তুমি নিশ্চিন্তি থাকতি পারো।

এই বলে ঈশ্বর হাসি মুখ তুলে ধরে তাকায়।

আর চাবুকের মতো আঘাত ক'রে তার সম্মুখে দাঁড়ানো মানবী—আশ্বাসে বিশ্বাস নাই ঈশ্বরদাদা। আমি জানি, তুমার একতারার ডুগডুগির মোদ্দি পিস্তল আছে। সেডা চাই আমি।

চম্‌কে দু' পা পিছিয়ে আসে ঈশ্বর।

দু'পা এগিয়ে আসে সংহাররূপিনী। হস্তপ্রসারিত তার—দ্যাও।

: তুমি কি সর্বদর্শিনী টিয়া?

: না। আমি জানি। গাজিয়ুল কয়ছে আমারে।

: আবার চম্‌কে ওঠার পালা ঈশ্বরের—গাজিয়ুল?

: হ্যাঁ। তার টিপ্‌ ফসকায়া গিছিলো। আমার ফস্‌কাবিনে।

: তুমি একলা পারবানা এতবড় কাজ করতি।

: পারবো। গাজিয়ুল কয়া গিছে, তার কথা কলি—তুমি আমারে না করতি পাইরবে না।

ঈশ্বর ঘামতে থাকে। ঘামতে ঘামতে সে তার প্রিয় একতারাটি ঝোলা থেকে বের করে। লাউয়ের বসের খোড়লে হাত দিতেই ধাতব মারণাস্ত্রের তেতে ওঠা শরীর ছুঁয়ে তার মধ্যে শিহরণ জাগে। বের ক'রে নিয়ে আসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। আলোয় তার শরীরে ঝিলিক খেলে যায়।

টিয়া হাত পাতে—দ্যাও। পাঁচদিন বাদে এডা কাজে লাগাবো।

: টিয়া।

: আমি কুনো অসম্মান করবো না ঈশ্বরদা।

: কাকপক্ষিও য্যানি জানতি না পারে।

: তুমি আমি দুইজন। গাজিয়ুল এর ব্যবহার শিখায়া দিছে। নিশ্চিন্তি থাকতি পারো।

ঈশ্বরের আর দ্বিধা থাকে না।—ছয়ডা গুলি আছে।

সমর্পিত অস্ত্র।—একটা খরচ করবো। বলে এক ঝলোক উপরি পাওনার মতো হাসি হেসে টিয়া তা কোমরে লুকায়। তারপর হন হন ক'রে হেঁটে চলে যায়।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে একসময় সে তার একতারায় ঝংকার তুলে গেয়ে ওঠে—"মরণ সাগর পার / হতে হবে সবাকার / দিন গেল বেলা অবসান·· / দ্বেষ হিংসা পায় দলে / আয় ছুটে আয় চলে / কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান।" গাইতে গাইতে এগিয়ে যায় কাজী বাড়ির দিকে।

কাজীর উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে ঈশ্বর—কই, কাজীদা কই?

বড় চারচালার আড়ালে কুয়োতলা থেকে নসিরণের গলা শোনা যায়—ও দাদা, এইদিক আসেন গো। এইখেনে।

ঈশ্বর এগুতে এগুতে বলে—বড় তিষ্টা পায়ছে গো ভাবী। এটুক্ জল খাবো।

নসিরণ হাত দিয়ে কুয়োর অন্ধকার তলায় ইশারা ক'রে দেখালেন—ওইখানে।

ঈশ্বর অবাক হয়ে বলে—এইসোময় কুয়োর মোদ্দি কি জন্য?

: তলাডা ক্যাদোয় ভরে গিছে গো। একফোঁটা জল নাই। ছাকতি হবে।

: একলা ছাকা যায়? মাটি তুলবি কেডা?

নসিরণ হেসে বলে—ক্যা, আমি তোলবো।

: তালিই হয়ছে।

: ওমা, আমি চাষীঘরের বউ, টানি তুলতি পারবো না কতিছেন?

: না। সেকথা নয়। কাজীদা এই সোময় না খায়া অত নিচে নামতি গ্যালো ক্যা? তুমি আমারে পানি খাওয়াও এট্টু। আমি মাটি তুলে দেই।

: পুকুরের পানি কৈল।

: হৈলেই হয়। গলডাতো ভিজাই আগে।

তখনই কাজীর গলা শোনা যায়—বালতি ভৈরে দিছি। টাইনে উঠাও।

ঈশ্বর ঝোলানো দড়ি হাতে কূয়োর মধ্যে মাথা গলিয়ে বলে—আমি তুলতিছি। বালতি ছাড়ো বলে সে বালতি টেনে ওঠায়। পচা মাটি টেনে তুলে ঢেলে দেয় কূয়োর পাশে। একটা প্যাচ্‌কা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। পলি মাটির গন্ধও এরকম। একটু চড়া সোঁদা আঘ্রাণ।

এইভাবে আধঘণ্টা ভরা বালতির পাঁক টেনে তুলে ঈশ্বরের ক্লান্তি লাগে। আসলে সকাল থেকে অনাহার। এখন সূর্যের অবস্থান মাঝ আকাশ থেকে অনেকখানি হেলে গেছে পশ্চিম আকাশের দিকে। তার মানে পড়ন্ত বেলার শুরু। পেটের নাম মহাশয়। তার দাবি অনেক। অনেককিছু। সে কেন শাসন মানবে। দুনিয়ায় সবকিছুই শাসন মানে। শাসনের অধীন। মনও। কিন্তু এই একমাত্র শাশ্বত বিদ্রোহী, যাকে শাসনের বশ করা যায় না। উলটো সে নিজেই শাসনের ছড়ি ঘোরায়। না মানলে দুর্বল ক'রে ফেলে পিষতে পিষতে।

এরমধ্যে বার দুয়েক ঢক ঢক ক'রে পুকুরের বিস্বাদ জল খেয়েছে। গরম। ওতে তেষ্টা মেটে না। বরং জলের প্রতি আরো আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

ঈশ্বর চেঁচিয়ে বলে—সাবধানে উঠে আসো কাজীদা।

: তুমি দড়িতে টান রাইখো

: রাখছি, রাখছি। বলে ডান হাতের থাবায় দড়িটাকে টান টান ক'রে ধরে ঈশ্বর।

কাজীর খুবই কষ্ট হয় উঠতে। পিঠের ওপর ভর থাকায় মেরুদণ্ডের হাড় মট্‌মট করে। নসিরণের চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে। তিনি ছটফট করেন দূরে দাঁড়িয়ে। তাই দেখে ঈশ্বর হেসে বলে—কাজীদা শক্ত মানুষ গো। উঠে আসপে ঠিক মতোন।

: পুরানা কূয়া তো। কুনোদিনও নামে নাই।

: পুরানা জিনিসে ভেজাল ছিলো না গো ভাবী। ভারি মজবুত জিনিস। বলতে বলতে দুই হাতে প্রচণ্ড শক্তিতে দড়ি টেনে তোলে ঈশ্বর। তার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়।

কাজী ধুঁকতে ধুঁকতে কুয়োর দু'দিকের পাতে হাত রেখে লাফিয়ে উঠে আসেন ওপরে। ঈশ্বর বলে—এই গাছতলায় বৈসে খানিক জিরাও গো কাজীদা। বিড়ি খাও।

সে বিড়ি এগিয়ে দেয়। নিজেও ধরায়। বলে—জানো তো, মণ্ডল তার জমিতে স্যালো মেশিন দিয়্যা জল দিতিছে। ডায়নামোর ঘর ঘর আওয়াজ শুনে ভোরবেলা ওই পথ দিয়্যা আসার সোময় আগায়া গ্যালাম। পাতাল থিকে জল উঠতিছে। ঘোলা জল। মণ্ডল ছিলো না। ডায়নামোর লোকটারে প্রশ্ন করতি কেলো—আমনের আবাদ করবি—। বান না হলি আমনের আবাদ স্যালোর জলে করা যায়?

কাজী মাথা নেড়ে বলেন—কেন যাবিনে। তারপর নসিরণের উদ্দেশ্যে বলেন—কি রান্না করিছো আইজ?

নসিরণ অদূরে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুলে উঠোনের মাটি খুঁটতে খুঁটতে যেন বহুদূর থেকে তাকালেন—গমের সাথে কলাই সিদ্ধ। একটা মানকচু ছিলো—রৈদে শুকায়া চাক চাক কৈরে ভাতের মোন্ডি দিছি। বলে তিনি যে দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারলেন না অনেক চেষ্টা করেও তা তার নাকের স্ফীতি দেখেই টের পায় ঈশ্বর।

তারপর কিছুতেই কাজী ও নসিরণের পীড়াপিড়ি আর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে কাজীর সঙ্গেই পুকুরের হাঁটুজলে স্নান সেরে এসে গম-কলাই আর কচু সেদ্ধ খেতে খেতে ঈশ্বর যেন ঈশ্বরের মতো মহৎ হয়ে যায়। মাথা নেড়ে, জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে চ্যাক্ চ্যাক্ আয়েসি শব্দের ব্যঞ্জনা তুলে বলে—খুব সোয়াদ গো ভাবী। সেই কবে মায়ের হাতে সখ কৈরে একবার গম-কলাইয়ের ভাত খায়ছিলেম। মুখি লাইগে ছিলো। সেইরম সোয়াদ।

ব্যস। খরার আকাশ ভেদ ক'রে অমনি বৃষ্টি নেমে গেলো নসিরণের দু'চোখে। তিনি ঈশ্বর ও কাজীকে হতচকিত ক'রে হু হু ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

হতভম্ব ঈশ্বরও নসিরণের দিকে তাকিয়ে তার অভিনয়ের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের চোখে জল!

এ যেন কল্পকাহিনীর দৃশ্য দেখছেন কাজী।

বুকের ভেতরে তার ভালবাসার উৎস। সেই উৎস থেকে, কে যেন নাড়া দিতে থাকে। নাড়া দিতে থাকে।

অবিরল নাড়া দিয়ে যায়।

ঈশ্বর বাঁ হাতের পিঠে চোখের জল মুছতে মুছতে হাসতে হাসতে বলে—ও ভাবী। তুমরা মায়ের জাত যে। বড় বেশি মনডা ভরা আদর আর সোহাগ গো…। কাঁদো ক্যা? এ আমার কাছে—এই পোড়া আকালের দেশে—অমেরতো। ভালবাসার দান—অমেরতোর চাইতিউ দামী গো। বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে ওঠে ঈশ্বর।

খরায় খরায় তৃষিত প্রকৃতির কোলে যখন বিকেলের রৌদ্রছায়া নামে একটু একটু ক'রে তখন মনের সুখে গুনগুন ক'রে গেয়ে ওঠে হারু মণ্ডল। কৃষ্ণের নৌকো বিলাসে রাধিকে এসেছে পারের ঘাটে। কৃষ্ণ বলছে:

ও যার কানে সোনা সে শোনে না।

ও যার মনে সোনা তারে পার ক'রে দেই

একমন হলে পার ক'রে দেই……

লক্ষ মণেও পার করি না…

শুধু একমন হলে পার ক'রে দেই।

ওহো। কি রঙের বাহার। ঝিলিক্ ঝিলিক্ হাসিমাখা কাঁচা হলুদের রং। পরণে গেরুয়া বসন। কপালে রক্ত তিলক। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। দু'চোখে অফুরন্ত প্রেমের ঢলো ঢলো নিদ্রালসতা।

মায়ের প্রসাদী কারণ সুধায় বেসামাল—টাল-মাটাল দেহ।

নীল রঙের ভেলভেটের চাদরমোড়া একটা বাসের ডালা উন্মোচন করতেই সোনার অলঙ্কারগুলি যেন খল্‌খলিয়ে হেসে ওঠে।

সাবিত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বড় সাবান কেসের মতো বাক্সটা তার নরম-কোমল বুকের উষ্ণতায়। অবাহ। কি তৃপ্তি। কি শান্তিরে। ওরে—ধৈন্য হলো মোর মানবজীবন…।

: কি বাহার। কি বাহার গো। তুমারে আমি সাত পরাণের মোদ্যি বাঁধায়ে রাখপো গো রাজা মশাই। রাজা আমার।

: সবই অনিত্য গো রানী। ঢলো ঢলো চোখে হারু মণ্ডল বলে।

সাবিত্রী তখন উন্মাদিনী। খলখল ক'রে হাসে। বাক্সটায় চুমু খায়। চুমু খেতে খেতে ধেই ধেই ক'রে নাচে। ঘুরপাক খায়। হারু মণ্ডলের কথায় সে ফোঁস ক'রে ওঠে তার কটাক্ষে—সব নেত্য। কিছুই অনেত্য নয় গো মশায়। তারপর ঘাড় দুলিয়ে ঠোঁট উলটে প্রশ্ন করে—সব গুলান আমার গো?

: সব।

: আহা, রাজাগো আমার। বলে ছুটে গিয়ে হারু মণ্ডলকে চুমু খেয়ে আবার দূরে ছিটকে সরে আসে সাবিত্রী।—তুমারে আমি কনে রাখপো গো রাজা।

হারু মণ্ডল হাত দিয়ে তার বুক দেখায়—এইখেনে। বলে খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বাঁ হাত নেড়ে ইশারা করে—আয়, আয়, কাছে আয়রে সোনা আমার। কি দেখিস তুই সোনার ঝিলিক্? আমি দেখি তোর আসল সোনার খল্‌বলানিরে। কী রং। কী গড়ন। কী মায়ামাখা বুকখান। সোনা তোর কাছে মিছে। তুচ্ছ। আয়—কত নিবি তুই সোনা। সব উজাড় কৈরে দেবো।

গলায় তারাহার। কানে ঝুমকো পাশা। নাকে সোনার মাছি। আয়নার সামনে চড়ুই পাখির মতো একবার আই-ঢাই বুক, আঁচল টেনে, আঁচল আল্‌গা ক'রে, কানের ডান দিক, বাঁ দিক, দেখতে দেখতে লাফিয়ে ওঠে। শিহরিত হয়। পুলকে তার অস্থির তনুমন।

বাইরে কাছে-পিঠে লাইসেন্স করা বন্দুক ঘাড়ে পাহারায় আছে সমিরুদ্দী। ব্যাটা কালাপাহাড়। হুকুমের দাসেরও রকমফের থাকে। সমিরুদ্দীর রকমফের নেই। হুকুম তো হুকুম। অমনি জান-প্রাণ দিয়ে তামিল করতে লেগে পড়ে। তাতে শ্রান্তি-ক্লান্তি আর বিন্দুমাত্র অনীহা নেই। অবজ্ঞা নেই। তাই সমিরুদ্দী থাকলে হারু মণ্ডল নিশ্চিন্ত। কাকপক্ষিরও প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। আর আশ্চর্য এই যে, ও যেখানে থাকে, তার কাছে-ভিতে কেউ ভিড়তেও সাহস পায় না। ও একটা অবতার ভগবানের। মুসলমান হয়ে ওকে দিয়েই সব থেকে বেশি মুসলমান ঠেঙিয়েছে সে। পয়সার হিসেবটা খুব ভাল বোঝে। স্পেশাল কাজে বাকি টাকির কারবার নেই। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। ঝুটমুট বোঝে না। ওকে হুকুম দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে মণ্ডল।

বুড়িটা কোথায় গেছে ঘুরতে টুরতে। আজকাল রোজই যায়। ফেরে সন্ধের পরে। রাত হয়ে এলেই যেন খাসকেলের বাড়ির গেটে এসে বসে সম্রিন্দী আর দরকার হলে—বন্দুক তো আছেই। খুব পাকা ব্যবস্থা মণ্ডলের।

বাইরে রাতের ছায়া নামছে।

সাবিত্রীকে দুই হাতে বেষ্টন করতে করতে এখন তার অনাদির মুখটা মনে পড়ে। কলকাতায় কোন্ হোটেলে নাকি কাজ শেষ করার জন্যে একে-তাকে ধরছে। ঘুরছে। কাজ শেষ না ক'রে ফিরে আসার সাহস ওর নেই। জানে, মণ্ডল তাহলে এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দেবে। তাই এখানে নিশ্চিন্ত সে। পা-চাটা কুত্তারা চিরকালই হুকুম তামিল ক'রে যায় একমুঠ ভাতের জন্যে। পরণের একখানা কাপড়ের জন্যে। মুখ ফুটে বলার সাহস তাদের কোনোদিনই হয় না। আর আফসোসই বা কি তাদের। চিরকালই তো তারা প্রভুর প্রসাদ পায়। নতজানু হয়ে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সোজা বাংলায় যাকে বলো এঁটো-কাটা। তো অনাদিও তাই খাবে। খাবে আর ল্যাজ নাড়বে। শালো কুত্তা।

সাবিত্রীর চোখে তখন সোনার নেশা। মণ্ডলের হাত গলিয়ে সুরুৎ ক'রে বেরিয়ে যায়। ঘরের থামে দুই হাতে মাথা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা দেয়—কি ?

মণ্ডল হাসে—আয়। ওই একখানা মুখ কত আর আয়নায় দেখপি ? খানিক আমার চোখির আয়নায় চায়া দ্যাখ।

: কী দ্যাখ্‌পো ?

: তোর যৈবন। গুনগুনিয়ে ভাটিয়ালি সুরে গেয়ে ওঠে সে—ধিক্‌ও ধিক্‌ও ধিক্‌ও মৈষাল রে / ধিক্‌ও তুমার হিয়া / আর কতকাল রাইখবো যৈবন / অঞ্চলে বান্ধিয়া মৈশালরে ॥

: ও রাজা। তুই তুকারি করতিছো ক্যা ?

: চিত্তের খৈল্‌সে নাচনে করিরে সোন্দরী। আয়। ম্যালা রাইত হয়া যায়।

: হৈক্ হৈক্। রাত্তির পহরে কেষ্টলীলে বড় মধুর হয়গো।

: চমেৎকার কথা গো। মনডা ছটফট করে।

সাবিত্রী তার বাঁ চোখ বুজে, ডান চোখের পাতা নাচিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে 'উ' 'উ' শব্দ ক'রে ভালবাসার সোহাগ জানায়।

মণ্ডল হাসে।

পার্বতী তার বুকে ঢেউ খেলায়। কোমরে বাঁক সৃষ্টি করে। ফিক ফিক ক'রে হাসে।

হাসতে হাসতে তার লোভের পশরা বাড়ায়—ও রাজামশায়, তুমার সিন্দুক ভরা গয়না গো?

: গয়নার পাহাড়।

: পাহাড় কতবড় গো? আমি কুনোদিন দেখি নাই।

: আকাশের সোমান। পাহাড়ের মাথাতেই তো ম্যাঘেরা ঠেক্না দিয্যা দাঁড়ায়া থাকে।

: তাই?

: হু। তুমারে নিয়্যা যাবো। দার্জিলিঙ। স্বগ্যের কাছে গো রানী।

আকুলি-বিকুলি ক'রে ছুটে আসে সাবিত্রী। নতজানু হয়ে মণ্ডলের হাঁটুতে মাথা রেখে আদর চায়। মণ্ডলও আদর করে তার গাল টিপে।

: রাজা।

: কও।

: আমারে সোনার মল গড়ায়ে দিবা?

: গড়াতি হবি কি দুঃখে। সিন্দুকেই আছে।

: আমারে দিও?

: দেবো। সবই তো দেবো। পাগ্‌লি, রাজা যার পীরিতি কাঙাল—তার কিসে থাকে আকাল?

সাবিত্রী স্বপ্নাবিষ্টার মতো মুখ উঁচু ক'রে তাকায় মণ্ডলের মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডল ঝুঁকে পড়ে।

সাবিত্রীর সুড়সুড়ি লাগে। পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মণ্ডল তাকে ছাড়ে না। টেনে বিছানায় নিয়ে আসে। সাবিত্রী ফিসফিসিয়ে বলে: রাত ফুরোতে ঢের দেরি গো। অতো ছট্‌ফটাও কি জৈন্যি?

মণ্ডল হাসতে হাসতে জবাব দেয়—ক্ষিদে বড় কঠিন যে। কেষ্টঠাকুরও এ ক্ষিদের জ্বালা সইতি পারে নাই গো। আমি তো মানুষ।

: ক্ষিদে পালি খাও। ইস্, কেষ্টলীলেরেও বাড়া কৈরলে। বলে কটাক্ষ হেনে, চোখের তারা নাচিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে সাবিত্রী। তার ছন্দ তারাহারের ঝিকিমিকিকেও ছাড়িয়ে যায়। সাবিত্রী খুব ক্লান্ত স্বরে বলে—পায়ের মল দিবা তো?

: শ্যামা-মায়ের কিড়ে। দেবো।

তখন সাবিত্রী উন্মুক্ত আবেগে আকর্ষণ করে হারু মণ্ডলকে। তারপর একসময় চূর্ণ—কুন্তলে বিধ্বস্ত সাবিত্রীকে বিছানায় ফেলে রেখে হারু মণ্ডল ভরু মণ্ডলের ছেলে হয়ে যায়। গেরুয়া ধুতিতে গলা ঘাড়ে আর কপালের অবিশ্রান্ত ঘাম মুছতে মুছতে সে বলে ওঠে—খোল্।

: কি খোলবো ?

: তারাহার। কানের ঝুমকো পাশা।

: ক্যা ? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে সাবিত্রী। সে মনে করে মণ্ডল তার সঙ্গে রসিকতা করছে। লোকটাতো আসলে খুব আমুদে। তাই কাপড় সামলাতে সামলাতে নাক কুচ্‌কে জিভ্‌ ভেঙচে আদর জানায়।

সেদিকে তাকিয়ে হায়েনার মতো হাসে হারু মণ্ডল। হায়েনার মতোই শব্দ হয়। চোখে তার খরিশের চাহনি। ফণা যেমন দোলে তেমনি মাথাটাও তার মৃদু মৃদু দুলতে থাকে। তারপর হঠাৎ-ই হিস্‌স্‌ ক'রে ওঠে—একদিন তুই আমারে ফিরায়া দিছিলি স্বৈরিণী। ওই তারাহার আর ঝুম্‌কা-পাশার জন্যি। কাম-কম্মো শ্যাষ। ফেরত দে ওগুলা।

: তার মানে ?

: সোনার হার চোখি দেখছিলি ? ঝুম্‌কা পাশা ? অ্যাতক্ষণ যে ব্যবহার করলি—তার ভাড়া মিটে গিছে। আবার য্যাখন আসপো—নিয়্যা আসপো।

: দুষ্টামি করতিছো রাজামশাই ?

: আমি তোর ভাতার, যে দুষ্টামি করবো ?

: কি কও। তুমি যে শ্যামা মার কিড়ে খেলে !

: শ্যামা মা আমার ঘরে বান্ধা। কাইল ভাল কৈরে ভোগ দিলিই শুদ্ধ হয়্যা যাবি। দে—তাড়াতাড়ি কর। ম্যালা কাম আমার।

: না দেবো না।

: দে। বলে হাত বাড়ায় মণ্ডল।

: না। কিছুতেই না। ধ্বক্ ধ্বক্ আগুন সাবিত্রীর চোখে। সে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো ছিট্‌কে সরে যায়।

: দে। হাঙ্গামা করলি ভাল হবিনে। সমিরুদ্দী বন্দুক হাতে পথে বৈসে রইছে। ডাকপো তারে ?

: না।

দ্রুতবেগে ভয়ে মাথা নেড়ে পিছু হটে সাবিত্রী।—তুমি, তুমি আমার সতীত্ব নষ্ট কৈরলে ফাঁকি দিয়্যা?

তুৎ তুৎ শব্দ করে মণ্ডল তার ঠোঁটে জিভ বাজিয়ে—সতীলো—সতীসাবিত্রী। নাম-খান দিছিলো তোর মা-বাপে।

: কুত্তা। শুয়ার। বলে গলার হার খুলে ছুঁড়ে দেয় সাবিত্রী।

: ঠিক। একশো ভাগ ঠিক। আমি কুত্তার কুত্তা। শুয়ারেরও শুয়ার। রামেশ্বরপুর, তিমিরপুর—বসিরহাটের মানুষও তাই কয়। কোতি থাক। দে—ঝুমকা-পাশা।

: ভণ্ড। বদমাইস। বলে কেঁদে ফেলে সাবিত্রী। ঝুম্‌কা পাশা খুলে ফেলে দেয়।

: নাকেরডা দে।

: নিয়্যা যা। নিয়্যা যা। থু থু। তোর মুখি থুক দেই।

মণ্ডল তাতে রাগ করে না। দূর ছেইও করে না। ছোট বাক্সটায় গয়নাগুলো ভরে পকেটে চালান ক'রে দেয়। দিযে দাঁত বের ক'রে হাসে—আবার আসপো।

সাবিত্রী থুথু ছিটিয়ে দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে জবাব দেয়—আসিস। ঝাঁটা মাইরে খ্যাদায়া দেবো।

: তালি অনাদিরে কবো?

: কি? কি কৈবে অনাদিরে?

: যা যা হয়ছে?

নিমেষে উদ্ধত ফণা নত হয়ে যায় সাবিত্রীর। তাড়া খাওয়া সাপের গর্তে ঢুকে পড়ার মতো তার দুই হাঁটুর ভাঁজে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

হারু মণ্ডল শব্দ ক'রে হেসে ওঠে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দুম্ ক'রে দরোজাটা টেনে দেয়।

সমিরুদ্দী গেটের সামনে পায়চারি করছিলো। বললো—আমি বড রাস্তার ধারে গিছিলেম খানিক আগে। আমাগরে ওদিকি খুব হল্লা হতিছে মনে হৈলো।

: পা চালা দেখি। হতি পারে। শালা জাফর কাজী য্যাদ্দিন বাঁইচে আছে—আমার কুনো শান্তি নাই। সবকিছু আমার হারাম। মান্নদার ঠ্যালায় পশ্চিম বাংলার ব্যাবাক্ গিরাম থিকে লালঝাণ্ডারা ভাগিছে। তিমিরপুর, রামেশ্বরপুর, হাসনাবাদ ফাঁকা। থানা? পুলিস-দারোগা, এম-এল-এ, এম পি ব্যাবাক আমার

হাতে—আর আমার শান্তি নাই ঘরে। দ্রুতবেগে হাঁটতে হাঁটতে মণ্ডল বলে ওঠে—সমিরুদ্দী।

: হু।

: কাজীর মাথার দাম কত নিবি?

নিঃশব্দ সমিরুদ্দী।

: কিরে?

: হুঁ।

: কত নিবি?

জবাব নেই সমিরুদ্দীর।

দ্রুতবেগে হেঁটে যায় সে।

ধমক দেয় মণ্ডল—কিরে? কথা নাই কি জন্যি?

: ওই একজন ছাড়া—আর সব পারি আমি।

: কি?

ক্রোধে কেঁপে ওঠে হারু মণ্ডল। একবার থমকেও দাঁড়ায়। সমিরুদ্দী দাঁড়ায় না। অন্ধকারে তার দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা হয় না। সেও পা চালায়। হনহনিয়ে হেঁটে এসে সমিরুদ্দীকে ধরে ফেলে—কি কলি তুই?

সাফ জবাব সমিরুদ্দীর—একজন বাদ।

: ক্যা? বাদ ক্যা?

: মদন।

: কি? কি কলি তুই? কার নাম কলি? যেন ভূত দেখে আঁৎকে ওঠে মণ্ডল—।

সমিরুদ্দী থামে না। পায়ের গতি বেড়ে যায় তার। জবাবে বলে—মদন মরে নাই।

: মরে নাই?

যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে হারু মণ্ডল। তার হাঁটুতে শক্তি ফুরিয়ে যায়। তবুও টল্‌তে টল্‌তে এগুতে এগুতে জিজ্ঞেস করে—তুই জানিস?

: হু।

: কার কাছে শুনলি?

: তোমাদের এক সাকরিদের সাথে কাইল রামেশ্বরপুরে দেখা হয়ছিলো। সে কয়ছে। চাকুডাও সেই মারছিলো।

: আগে কৈস নাই ক্যা ?

: মনে আছিলো না। তোমারা মদনরে নিজির চোখি দেখিছে কৈলকাতায়। ধরতি সাওস পায় নাই। সাথে ম্যালা লোক আছিলো।

: ও। তার মানে আমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে ?

: সাবধানে থাকতি হবে।

: থানারে জানাতি হবে। ইস্। মানুদাডা কুনো কামের না। কৈলকাতায় মদনরা দিনিরবেলা দলবল নিয়্যা ঘুইরে বেড়ায়, আর হে ব্যাটা মেয়েমানুষ নিয়্যা কিচ্ছা করে রাইটার্স বিলডিঙে। চরিত্রহীন নিয়্যা স্থাশ চলে না। হারামজাদারা।

কাছারির মাঠ জনারণ্য। চিৎকার চেঁচামেচি। কাজী দাঁড়িয়ে আছেন কাছারির বারান্দার নিচে। তার সাথে ঈশ্বর। মজনু, জয়নাল। জয়দেব মিস্ত্রী। সরমারা দল বেঁধে। পঁচাত্তুরে বৃদ্ধা মায়মুনা বিবিও ঠায় লাঠি পেতে বসে। কাজী দেখছিলেন জয়নালের উন্মাদনা। জয়নাল তারই বাড়ির মানুষ একরকম। ছোট থেকে মানুষ। বছর দেড়েক আগে নিজেই মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। কোনোদিন মুখ ফুটে কথা বলেনি তার মুখের ওপর। ওর নিজেরও কিছু জমি আছে। সেই জমির সাথে তার আট দশ বিঘে জমিও একসঙ্গে আবাদ করতো। মিতব্যয়ী বলেই খানিকটা সচ্ছল। এতদিন গোপনে কাজীকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তারা সংসারের খরচ যুগিয়ে এই আকালে নিজেও নিঃসম্বল—কপর্দকহীন হয়ে গিয়েছিলো। সেই জয়নালও সেদিন সকলের সাথে লাইন দিয়ে সাদা কাগজে টিপ-ছাপ দিয়ে গেছে। বোধহয় সেই পাপবোধ ও লজ্জায় আজ মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে জয়নাল।

সেরেস্তাদার, রঙ্গলাল দাগা ও আরো দু'তিনজন বিকেল থেকে ঘেরাও হয়ে আছে কাছারি ঘরের মধ্যে। কারোই বেরুনোর সাহস হয়নি। এতক্ষণ দরোজা আগলে দাঁড়িয়েছিলো নবীন। জয়দেব মিস্ত্রী ও জয়নাল বারবার দু'জনেই চিৎকার করতে করতে ছুটে গেছে নবীনের দিকে। তাদের ঠেকিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়েছেন কাজী ও ঈশ্বর।

নবীন প্রথম দিকে খুবই লম্ফ ঝম্ফ করেছিলো। এখন চুপ ক'রে গেছে অবস্থা বেগতিক দেখে। ভেতরে দাগা একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকছে। কিন্তু কোনো টু শব্দ করেনি। বার দুই সেরেস্তাদার হাত জোড় ক'রে ছুটি চেয়েছিলো। সেই জানিয়েছিলো, ঠাকুরবাবা শ্মশানে গিছেন। প্রতি মঙ্গলবারই তিনি শ্মশানে যান, মায়ের ধ্যান করতে।

কেউ শোনেনি। জয়দেব মিস্ত্রী রুখে গিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে। সেরেস্তাদারও ভয় পেয়ে সেই যে ঢুকেছে আর তার মুখ দেখা যায় নি একবারও।

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে সমিরুদ্দী ভিড় হটিয়ে—মণ্ডলকে কাছারিতে ঢোকার পথ ক'রে দিলো আর মণ্ডল প্রায় ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লো কাছারি ঘরে। পেছনের দাঁড়ানো মানুষ বুঝে ওঠার আগেই। যখন বুঝতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হট্টগোল।

কাজী তখন কাছারির উঁচু বারান্দায় উঠে গেলেন। এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—কুনোরকম হৈ হট্টগোল চলবি না। হারুবাবু এইমাত্তর আয়ছেন। আমি তার সঙ্গে কথা কতিছি। আশা করি কেউ টু-শব্দ কৈরবেন না।

জনতা নীরব হলে কাজী নবীনকে বললেন—হারুবাবুরে কও, আমি দেখা করবো।

নবীন ভেতরে ঢুকে গেলে, ঘরের ভেতরে বন্দুক রেখে, তেলপাকানো লাঠি হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সমিরুদ্দী।

নবীন ঘুরে এসে বললো—বাবাঠাকুরের শরীল খারাপ।

কাজী রুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ করেন সাথে সাথে—কওগে, কেউ খায়া খারাপ, কেউ না খায়া খারাপ। আমদ্ম না খায়া—পাঁচ ঘণ্টা ধৈরে বসি আছি। যাও।

নবীন আবারও ঢুকে যায়। একটু পরেই ফিরে এসে বলে—আপনে একলা। যান।

কাজী ভেতরে ঢোকেন।

সঙ্গেসঙ্গেই হারু মণ্ডল গর্জে ওঠে—কি চান ?

কাজী নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলেন—রিলিফ দেওয়ার কথা কয়া সাদা কাগজে যাগরে টিপ ছাপ নিছিলেন সেই কাগজগুলান ফেরত দ্যান।

: ফেরত দেবো কি কতিছেন ? কিসির কাগজ ?

: জালিয়াতি কৈরছেন। ভুল হয়া গ্যালো এরই মধ্যে ?

: জালিয়াতির প্রমাণ ?

: প্রমাণ আপনি নিজি।

: তার মানে কি ? হারু মণ্ডল হিস্‌স্‌ ক'রে ওঠে।

: তার মানে গরীবের শ্বাষরক্তটুকুনও নিংড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র।

হারু মণ্ডল উত্তেজিতভাবে ক্যাশবাক্সে ঘুষি মারে—সীমা ছাড়ালি বিপদ হবি কাজী।

: বিপদের ভয় দেখাতিছেন ক্যা? বিপদের মোচ্ছি যার জন্ম, তার আবার বিপদের ভয় কা। আর ওসব ছাড়েন। কাগজ ফেরত ছান।

: কাজী। খুব সাবধান।

সেই সময় কাজীর সঙ্গে মণ্ডলের তুমুল বাক বিতণ্ডার খবর বাইরে পৌঁছে গিয়ে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। তারা হই হই ক'রে কাছারির বারান্দায় উঠে পড়ার চেষ্টা করে। হারু মণ্ডল ঘর থেকেই চিৎকার ক'রে ওঠে—সমিরুদ্দী!

সঙ্গে সঙ্গে সমিরুদ্দীর হাত উঠে যায় লাঠি সুদ্ধ আকাশের দিকে। কাজী দ্রুতবেগে লাফিয়ে পড়ার মতো হাত বিস্তার ক'রে তাকে বাধা দিলেন।

: খবরদার সমিরুদ্দী। না খাওয়া মানুষের গায়ে-গতরে হাত দিলি কারবালা হয়া যাবি আইজ। বলতে বলতে তিনি সমিরুদ্দীর লাঠি চেপে ধরেন—হটাও লাঠি।

সমিরুদ্দী থম্‌কায় মুহূর্তের জন্যে। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার কাছারি ঘরে ঢুকে পড়েন কাজী। উত্তেজনায় তিনি তখন কাঁপছিলেন। তার রণমূর্তির হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে কাছারি ঘর—মণ্ডল, আমি যদি মাথা খারাপ করি, যদি বদ্‌লা নিতি চাই, তালি কিন্তু চোখের পলোকে এই সব রোশনাই এক লহমায় ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হবি। তাই ভালোয় ভালোয় কই, কাগজগুলান ফেরত ছান।

পালটা হুঙ্কার ছাড়ে হারু মণ্ডল—কাজী!

কাজীর আজ পৌরুষের বীর্য্যে উত্তাল জোয়ার বহে যায়। তিনি তর্জনি তুলে হারু মণ্ডলকে চিহ্নিত ক'রে বলেন—মণ্ডল। দেওয়ালের পরে আর নড়ার জাগা থাকে না। আমরা দেওয়ালে ঠেকিছি। পরিষ্কার কতিছি, কাগজ ফেরত দিয়া ছাও। ইয়ার পরে তুই তুকারি করবো। সামনে আগাবো। তুমার ক্ষ্যামতা হবিনে ঠ্যাকায়া রাখো।

হারু মণ্ডল প্রথমে হতবাক, পরে অপমানের জ্বালায় উন্মত্তভাবে ক্যাশবাক্সটাই দুই হাতে তুলে আছাড় মারে। একটা বিকট শব্দ হয়। আর নিজের বুক চাপড়ে চিৎকার করতে থাকে—ওই শালো, ওই শালো, শালো পাকিস্তানের গুপ্তচর। জাতীয় সংহতির দুশমন। শালো শুয়ারকি বাচ্চা—কিসির কাগজ? বলতে বলতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চেঁচায়—খুন কৈরে ফ্যালাবো। খুন

কৈরে ঠ্যাং ধৈরে টানতি টানতি ভাগাড়ে নিয়্যা কুত্তা দিয়্যা খাওয়াবো। হট্, শালো ময়লাগাড়ি।

রঙ্গলাল দাগা হারু মণ্ডলকে সামলাতে সামলাতে বলতে থাকে—রাম কহো। ই সব কী হচ্ছে। আরে সিয়া-রাম। পাকিস্তানকো এজেণ্ট—হিন্দুস্থানকি অন্দরমে বসিয়ে ইতনা রংবাজি দিখাতা? তো হম সব কাহা যাবে? আরে ভেইয়া, হিন্দু শালোরা ভি···দিমাগ খারাপ করিয়ে ফেলছে।

: দাগা সাহেব! খুব সাবধানে কথা কবেন।

: সমিরুদ্দী, নোব্‌নে···হারু মণ্ডল চেঁচায়।

: আরে এ সমিরুদ্দী, হটাও ইসব ঝামিলা। লাঠি মার মারকে হটাও।

অকম্প্র কাজী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে জবাব দেন—একটা লাঠি চললি—এই ঘর বাড়িতে হাজার হাজার লাঠির ঘা পড়তি পারে। আমিও ঠ্যাকাতি পারবো না মণ্ডল। তাই কই, কাগজ ফেরত দিয়্যা ছাও। আমরা তুমার কাছে খয়রাত চাতি আসি নাই। ভিখ্ মাঙাতে আসি নাই। সাদা কাগজে সই নিছো··· ফেরত দিলি ঝামিলা মিটি যাবে।

হারু মণ্ডল লাগামহীন ক্রোধে ভুম্ ক'রে ঘুষি চালায় কাজীর নাকে। চোখে অন্ধকার দেখেন কাজী। পড়ে যেতে যেতে দেওয়াল ধরে তিনি নিজেকে আপ্রণা চেষ্টায় খাড়া ক'রে রাখেন। তখন তার নাক দিয়ে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়ছিলো। ভেসে যাচ্ছিলো জামা—। ঠোঁটও ফেটে গিয়েছিলো। তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো।

কাছারির মাঠে আগুনের শিস্ বেজে ওঠে। জয়নালের কণ্ঠ শোনা যায়—জাফর কাজীর গতরে হাত উঠায়ছে হারু মণ্ডল।

জয়দেব মিস্ত্রীর বাঘের গর্জন—ভাঙো, ভাইঙে ফ্যালো কাছারি ঘর।

জনস্রোত তখন একযোগে স্ফীত হয়ে বারান্দায় উঠে আসে। টলতে টলতে রক্তাক্ত কাজী দুই হাতে কাছারির দরোজা বেষ্টন ক'রে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠেন—খবরদার। খবরদার। যে যেখেনে আছো, এক পাও নৈড়বে না। তুমরা কসম খাইছো, কথার অবাইধ্য হবে না। মারতি হলে আমারে মারো। ভাঙতি হলি আমার ঘর বাড়ি ভাঙোগে—কথা না শুনলি আইজই এই গিরাম ছাইড়ে চৈলে যাবো আমি। —সামাল। সামাল হে।

কি আশ্চর্য।

উগ্র গলন্ত লাভার স্রোত মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ টু শব্দ করে না।

শুধু ব্যর্থ-ক্রোধে, ক্ষুধার্ত জঠোরে—হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে জয়নাল।

চারদিকে থম্‌থমে মৃত্যুর নৈঃশব্দ্যে শুধু জয়নালের কান্নার শব্দ—আগুন ছড়িয়ে যায়।

সরমা এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখে।

মায়মুনা বিবি লাঠি ঠুকে ঠুকে একবার কাছারির বারান্দায় ওঠার চেষ্টা করেন। কাজী ছুটে গিয়ে তাকে ধরেন। মায়মুনা লাঠিটা ছেড়ে দিয়ে কাজীর মুখ থেকে নিজের অাঁচলে রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

জয়দেব মিস্ত্রীর হাতে ধারালো বাসলে। সেটা মাটিতে বিদ্ধ করে দাঁত দিয়ে খুব জোরে নিচের ঠোঁট চেপে ধরে। আর বাঁ হাতে টানতে টানতে পট্‌পট্‌ শব্দে ছিঁড়তে থাকে মাথার চুল।

সেই অতল নৈঃশব্দ্যের সিঁড়ি বেয়ে মায়মুনার হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে কাছারির বারান্দা থেকে নেমে আসেন কাজী। তারপর থমথমে আক্রোশে গুমরাতে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তার অন্তরঙ্গ আবেগ প্রকাশ করেন—এভাবে হবিনে। কিভাবে হবি, ভাবতে হবি তাই। চলো—।

আক্রোশবিদ্ধ মানুষের স্রোতে একটা ঢেউ তুলে ওঠে। ঈশ্বর এসে কাজীর কাঁধে হাত রাখে। জয়নালকে ওঠায়। ওরা ফিরে চলে যায়। চলে যায়। সারা পথ কেউ একটা কথাও বলে না।

কে জানে এই স্তব্ধতা, এই নৈঃশব্দ্য কোনো মহাবিস্ফোরণের সঙ্কেত কি না।

ঘুম হয় না হারু মণ্ডলের সারা রাত। মদে মাতাল হয়ে সে বিউটিকে ন্যাংটো ক'রে বেদম পেটায়। পিটিয়ে ফর্সা শরীরে রক্তের দাগ ফুটিয়ে তোলে—নকশার চিত্র-বিচিত্র। তারপর আবার মদ খেতে বসে। খেতে খেতে আচম্‌কা দুম্‌ ক'রে নিজের চোয়ালে ঘুষি চালায়। বিউটি ভয় পেয়ে দরোজার দিকে ছুটে যায়। মণ্ডল মদের বোতল তুলে গর্জে ওঠে—খিল খুলতি চেষ্টা করলি এক ঢ্যালে মাথা তোর দুইখান কৈরে দেবো।

বিউটি ভয়ে ভয়ে ফিরে আসে বিছানায়। মণ্ডল ভাবতে থাকে। ভাবতে থাকে একের পর এক। না, থানা দিয়ে, তোমাদের দিয়ে সবকাজ হবে না।

তাকে অন্যপথ ধরতে হবে। তাকে ঈশ্বরত্ব পেতে হবে। তামাম চব্বিশ পরগনার মানুষ যেন তাকে দেবতা—অবতার, নয়া পরমহংস বলে মাথা নোয়ায়। ওদের অনেক সুবিধে—বালক ব্রহ্মচারী, অনুকূল চক্রবর্তীরা কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেছে। শত শত গাড়ির মালিক। লক্ষ লক্ষ ভক্ত শিষ্যকে টুপি দিয়ে যা কামিয়েছে, তার তুলনা হয় না। ওইতো একটা সামান্য লোক—অনুকূল চক্রবর্তী। ওপারের পাবনা জেলার হেমায়েতপুর থেকে চাটি-পাটি গুছিয়ে চলে গেলো বিহারের দেওঘরে। কিছুই তো ছিলো না। একটা 'দরিদ্র ঘর' করেছিলো। তাও ভাড়ায়। এখন সেখানে 'সৎসঙ্গ নগর'। কি নেই, চিড়িয়াখানা পর্যন্ত ক'রেছে। এখন ওরা বংশপরম্পরায় অবতার হতে থাকবে। সারা ভারতব্যাপী ওরা মন্দির করছে, সৎসঙ্গের শ্রীমন্দির। যত মন্দির, তার চার ডবল টাকা দিচ্ছে টুপি খাওয়া শিষ্যরা। অনুকূল চক্রবর্তীর বউএর অভাব পড়েনি কখনো। বিবাহেরও'কোনো প্রয়োজন নেই। 'অবতার' হতে পারলে নিজের হাতেই আইন তৈরি হয়ে যায়। অনুকূলের ছেলে পিলেরাও—বউ-এর ঢল নামিয়েছে 'সৎসঙ্গ নগরে'। চক্রবর্তী এখন ঠাকুর। এই সেদিন টেঁসেছে সে ব্যাটা। তার নিজের পরিবারে আমেরিকান কালচার। ভক্তদের লঙ্গরখানা মার্কা খিচুড়ি! সে এক মহা ভেল্‌কিবাজি!

কি পাবলিক এদেশে! মাটির চাইতে এদেশের মানব-জমিন উর্বরতায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ। আর ওই বালক ব্রহ্মচারী। আহা, কি জীবন। ইচ্ছে-বিহারে মধু আহরণ। মুখে বলো মা—। কাজে করো মেনকা-উর্বশী-রম্ভা। দর্শন দাও যখন যাকে চোখে ধরবে। রাতের ঘোরে একবার দরোজায় টোকা দাও। কে এলো অতিথি হে। বাবা ঠাকুর। অবতার। তো দরোজা ঘুচিয়ে বাবা হয়ে যায় রমণ পুরুষ। ভেসে যাও হে। বাবাকে নিয়ে কন্যাদের এই রমণখেলা, অহো। সাধু সাধু। কি একটা মজার খেলা হে।

কিন্তু অবতার হতে গেলে একটা শ্লোগান দরকার। বালকব্রহ্মচারীর শ্লোগানটা বেশ মনোগ্রাহী। সুরটাও। কি যেন। মনে না করতে পেরে মদে চুমুক দেয়। তখুনি মনে পড়ে। 'রাম নারায়ণ রাম।' দলে দলে মা জননীরা, কুলু কুলু যুবতী কিশোরীরা হররোজ গেয়ে যায়···। অহো···।

বিউটি বসে বসে কাঁদছিলো। সারা গায়ে চাক-চাক দাগ। দাঁত আর নখের। দেখে খুব আরাম বোধ করে •মণ্ডল। একটা অতুলনীয় তৃপ্তি বোধ করতে করতে—নিজের শ্লোগানটার খোঁজ করে। এই পথই তার

শ্রেষ্ঠ অস্ত্র – কম্যুনিস্টদের ঘায়েল করার। ওরা হলো—'মারিলে না মরে অ্যারি এ কেমন বৈরী।' গুলি বন্দুকে ওরা মরবে না। মরেও না। মদনডা বেঁচে গেছে। একদিন আবার ফিরে আসবে। কোনোরকমে মানুদা ফস্‌কে গেলেই—। উহ্‌। ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে মণ্ডল।

শ্লোগানটা মাথায় আসে তো মুখে আসে না কিছুতেই। দারুণ একটা উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে মাথার চুলে আঙুল চালায়। হাঁটে। থম্‌কে দাঁড়ায়। বিউটিকে দেখে। দেখে ফিক্‌ ফিক্‌ ক'রে হাসে। তারপর মুখের মদ—ফুরুৎ ক'রে উগ্‌রে দেয় বিউটির চোখে মুখে।

ছট্‌ফট্‌ করে বিউটি।

অহো, কা দৃশ্য।

প্রচণ্ড ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে—মানুষের অভ্যুত্থান সংঘটিত করতে হবে। সেই মানুষের ঢলে, ভাসিয়ে দিতে হবে নেড়েদের। কম্যুনিস্টদের।

চট্‌ ক'রে মুখ গলিয়ে বেরিয়ে আসে—গাহো মন অবিরাম / হারু নাম / প্রভুনাম। প্রভু নাম / অবিরাম।

চমৎকার। চমৎকার হবে। গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে মণ্ডল :

গাহো মন অবিরাম
হারু নাম
প্রভুনাম
প্রভুনাম,
অবিরাম।

অহো। অহো। ছল্‌কে ছল্‌কে ওঠে মণ্ডলের চিত্তচাঞ্চল্য। সে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। নৃত্যের তালে তালে তার সগু আবিষ্কৃত শ্লোগানে সুরারোপ করে। একবার। দু'বার। তিনবার। গাইতে গাইতে, ড্রয়ার খুলে পিস্তল বের ক'রে দেখে নেয়—গুলি আছে কি না। আছে। সব কটা ঘরই পূর্ণ। পাহারা ঘরে সমিরুদ্দীর হাতে লোড করা বন্দুক। তারপর কি ভেবে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে বড় একটা হুইস্কির বোতল নেয়। এক প্যাকেট ডালমুট নেয়। ছোট দুটি গেলাস। এসব নিয়ে একবার বিউটির দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে—দরোজা আটকায়া শুয়ে থাক। তারপর দরোজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

গম্ভীর রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে—মাথার ওপরে তারাভরা আকাশ নিয়ে মণ্ডল

টলতে টলতে পাহারাঘরের দরোজায় টোকা দেয়। দু'বার টোকা দিতেই সমিরুদ্দীর সাড়া মেলে।

: কেডা ?

১ : ঠাকুরবাবা।

: অ্যাতো রাতি? দ্রুত দরোজা খুলে বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে সমিরুদ্দী।

মণ্ডল বলে—ঘরে তালা মার।

সমিরুদ্দী তালা আটকায়। মণ্ডল তার হাতে প্লাষ্টিকের ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে বলে—খাসকেলের বাড়ির দিক চল।

সমিরুদ্দী আদেশ পালন করে। তার হাতে টর্চ।

মণ্ডল নিষেধ করে—লাইট জ্বালাবিনে।

: আন্ধার যে।

: চেনা পথ। খালি নজর রাখস—গরমের মোস্তি রাতির বেলা পথের পর ওরা জোড় লেগে থাকে। পা-পড়লি নিস্তার নাই।

সমিরুদ্দী আগে আগে হাঁটে। সে জানে 'ওরা' মানে সাপের কথা বলছে তার মালিক।

মণ্ডল ঘাড় দেখে। তার রেডিয়াম ঘড়ি। অন্ধকারেও ঝক্ঝক্ করে।

এখনো দু'ঘণ্টা রাত। ঝিঁঝিঁরা ক্লান্ত হয় না বুঝি। শুধু ডেকে যায়। ডাক দিয়ে যায়।

এসময় এমনিতেই একটু ঠাণ্ডা থাকে প্রকৃতি। হাওয়াটা নরম। ধুলোটা ভারী হয়ে থাকে। হালকা হাওয়ায় ভেসে উঠতে পারে না।

বারোয়ারিতলা ছাড়িয়ে ওরা কাঁচা পথ ধরে।

একটা শেয়াল ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় শরখড়ির ঝোঁপের পাশ থেকে। তার ধূর্ত চোখের মণিতে আগুন জ্বলে। সমিরুদ্দী আচমকা টচ মারে শেয়ালটার মুখে। কি যেন খাচ্ছিলো। আলোর ঝল্কানিতে ছুটে পালিয়ে যায় সুঁদরির জঙ্গলের ভেতরে।

মণ্ডল জিজ্ঞেস করে—কি খাতিছিলোরে ?

সমিরুদ্দীর হাতের টর্চ আবারও জ্বলে ওঠে।

একটা হাড় জিড় জিড় বছর খানেকের শিশু। গালের একপাশ থেকে, পেটে নাভির বাঁ পাশ থেকে, ডান দিকের থাই থেকে খাবলা খাবলা মাংস তুলে নেয়া।

এতক্ষণ শেয়ালের মহাভোজ চলছিলো। ওটা হয়তো কাছে ভিতে কোথাও ঘাঁপটি মেরে আছে। তারা চলে গেলে আবার আসবে। রাতভর আরামে মুচ্‌মুচ্‌ ক'রে কচি হাড-গোড় চিবিয়ে খাবে।

মণ্ডল হেসে বললো—কাজীপাড়ার মুর্দা নাকিরে?

: কি কৈরে কবো।

: শেয়ালের মহাভোজে বাদ সেধে কাম নাই। চল।

ওরা এগোয়।

মণ্ডলের মাথায় মদের দাপাদাপি। তার হাঁটতে অসুবিধে হয়। পা হড়কে যায়। সে নিরুপায় হয়ে সমিরুদ্দীকে ডাকে—ওই সোম্‌রে। আস্তে হাঁট।

: চলতি পারেন না?

: পারি রে। পারি। চল। ওই পৌছি গেছি।

দু'জনে খাসকেলের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। অন্ধকার ঘুটঘুটে। মণ্ডল ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে—ওইদিক—এই ঢেঁকিঘরে বসি চল।

সমিরুদ্দী একবার টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের মেঝেটা দেখে নেয়। তারপর বসে দু'জনে।

: সোম্‌রে। পিলাষ্টিকের ব্যাগ থিকে মাল বার কর। বতোল—গিলাস—ডাইলমুট সব আছে। ছিপিডা খুলতি পারবি তো?

: পারবো।

এক মোচড়ে—কট্‌ কট্‌ শব্দে বোতলের সীল ভেঙে ফেলে সমিরুদ্দী। অন্ধকারে আন্দাজ ক'রে গেলাসে তার মালিককে ঢেলে দেয়।

মণ্ডল বলে—আরাকটা আছে গিলাস। তুই ঢাল। খা-খা। লজ্জা কিসির? তোর জন্যিই তো নিয়্যা আয়ছি। আমার এই এক গিলাসেই হবি। ঘরে বৈসে বৈসে এক বতোল খায়ছি।

: না খাইক। সঙ্কোচ করে সমিরুদ্দী। তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। সে সারাপথ ভাবতে ভাবতে এসেছে, হঠাৎ এই মাঝ রাতে মণ্ডল এখানে কেন। সন্ধেবেলাই তো একবার এসে ফুর্তি মেরে গেছে। নাকি—খাসকেলের বউডার আলাদা কিছু আছে। মণ্ডলকে তো সে চেনে। এতডা বেসামাল না। কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে মণ্ডল বারবার কোথাও ছোটে না।

ধমক দেয় হারু মণ্ডল—কিরে ঢাল।

সমিরুদ্দী গেলাসে মদ ঢালে—তারপর গলায় ঢালে।

মণ্ডল ডালমুট এগিয়ে দিয়ে আদরের সুরে বলে—ডাইলমুট খা। ঘিয়ে ভাজা। খা। আর বতোলডা তাড়াতাড়ি শ্যাষ কর। আমি এট্টু পিচ্ছাপ কৈরে আসি।

মণ্ডল ঢেঁকি ঘর থেকে নেমে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে চ্যাড চ্যাড ক'রে পেচ্ছাপ করতে থাকে। তারপর উঠোনের এ মাথা থেকে সে মাথা পায়চারি করে। বেশ টন্‌টনে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠোন। ঢেঁকি ঘরের পাশে খুব ঝুপসি হয়ে একটা পুঁইলতা চালে উঠে গেছে।

একটা ছাপরা ঘর দক্ষিণে কুয়োতলা ঘেঁষে। ওটায় হাড বজ্জাৎ বুড়িটা থাকে। মণ্ডল একবার অনাদির ঘরের দরোজায় কান পাতে। না কোনো শব্দ-টব্দ নেই। সাবিত্রী বিভোরে ঘুমোচ্ছে হয়তো। সহসা তার ভেতরে আবারও যৌনতৃষ্ণা জেগে ওঠে বুকে মোচড় দিয়ে।

ডাকবে?

না থাক।

ঘরের সিঁড়িতে বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস ক'রে টানতে থাকে। ঢেঁকি ঘরটা সামনাসামনি। খুব ভাল ক'রে নজর করলে সমিরুদ্দীকে দেখা যায়। ছায়া ছায়া। টপাটপ ডালমুট চিবোচ্ছে। আর ঢোকে ঢোকে হুইস্কি যাচ্ছে। খুব খেতে পারে ও। পুরো বোতল না হলে ওর নেশাই হয় না। কঠিন স্নায়ু। সহজে ঝিম্ ধরে না।

খা। আরাম কৈরে খা। বতোল শ্যাষ হলি তারপর যাবো। মনে মনে বিড় বিড় ক'রে চলে হারু মণ্ডল—নেশা না জমলি—কাজের কথাডাও জমানো যাবিনে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলো। পিস্তলের অস্তিত্বটাই একটা আলাদা মেজাজের। রক্তের ভেতর একটা চন্‌মনে শিহরণ জেগে ওঠে। জেগে ওঠা ঠিক না। খেলা করে। খেলা কথাটায় খুব আনন্দ পায় সে। তো সাবিত্রীকে নিয়ে তার খেলার ইচ্ছেটা ক্রমশই মাতাল হয়ে ওঠে বুকের গভীরে।

পরক্ষণেই তার নয়া আবিষ্কৃত শ্লোগানটা মনের ভেতরে গুনগুনিয়ে ওঠে। সে গাইতে থাকে। গাইতে গাইতে নেশার ঘোরে হঠাৎই হা হা শব্দে হেসে ওঠে।

ঢেঁকি ঘর থেকে সমিরুদ্দীর চাপা কণ্ঠ ভেসে আসে—কি হয়েছে।

: কিছু না।

মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে মণ্ডল। শাসনও করে। এ সময় মতিভ্রম হলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। শালো রঙ্গলাল দাগা—শালো মেড়োর বাচ্চাটা .তার দু' চোখের বিষ। তবু সেই যে, যে গরু দুধেল, তার লাথ খাও, ঝাম্‌টা খাও, ভাল লাগবেই। তো শালো দাগাটাও দুধ দেয়। কথা শোনে। তোমার সাথে লাইন মেরে রিলিফের বেবাক মাল হাপিস ক'রে দিলো। কিন্তু পয়সার হিসেবটা ঠিকমতো গুছিয়ে দিয়ে গেছে বাড়ি বয়ে। না দিয়ে উপায় কি। হারু মণ্ডলের সাথে ধানাই পানাই করলে তার যে কী পরিণতি—দাগা তা জানে। শালোর মেড়োরা ওইরকমই। কোথায় শালোর বিকানোর। সেখেন থেকে পাকিস্তান। ঘটি-লোটা-কম্বল। তাই দিয়ে শালোরা ইমারত বানায়। বাংলা মুলুকে-বাঙালিদের গোলাম বানিয়ে রাখে। হুকুম ক'রে, চোখ রাঙিয়ে খাটিয়ে মারে। যত কল-কারখানা—মালটিন্যাশনাল লাইন, বিগ বিজনেস, বাংলায় শালো বাঙালিরা চোট খেয়ে যাচ্ছে মেড়োদের কাছে। এই শালো দাগাটাও পাকিস্তান থেকে তাডা খেয়ে মরবি তো মর শালো এই রামেশ্বরপুরে। কি ছিলো। ভিখেরি। দশ-পনেরো বছরে রামেশ্বরপুরের সেরা শেঠ হয়ে গেলো। ও ব্যাটা বলেছে—জাফর কাজীর ভিটেতে যখন ফ্যাকটরি বানাবে, তখন দরকার মত সব কিছু সাপ্লাই দেবে। ঠিক দেবে ও। তারপর একদিন শেয়ারের একটা অংশও পটিয়ে পটিয়ে হাতিয়ে নেবে। নেবেই।

ওটা মেড়োর ধর্ম।

হারু মণ্ডল ভাবে, আর হাসে। হাসে আর মাথা নাড়ে। শালো মেড়ো। তোগরে নিঃশ্বাসেও বিশ্যাস নাই। য্যাতো ধম্মোশালা খুইলছে ব্যাটারা, সব গোলাম বানানের ধান্দা। ধম্মোশালামে রহো, রাম নাম কহো, আর ভিক্ মাঙো।

বুদ্ধি আছে শালোদের। বাঙলায়—বাঙালিদের ভিক্ মাঙতে বলে নিজেরা শেঠ বন্ যাতা হায়। বাঙালি ভিখেরি না হলি তোগরে শালো শেঠ হওয়ার অসুবিধা। বহোৎ ঝুট-ঝামিলা। তো সেই জন্যি ধম্মোশালা খুইলে বাঙালি পাবলিকগরে আচ্ছামতো টুপি দিয়্যা দানসাগর বন্‌তা হায়।

বাঙালিরা জিন্দাবাদ মারতিছে।

শালো গাণ্ডু পাবলিক। ভাবতে ভাবতে অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু হাসে না আর। এবার টুপির খেলায় কপালঠুকে বাজি ধরবে সে নিজেই। তার জন্যে প্রথম দরকার সমিরুদ্দীকে। একজন বিধর্মীকে। যার কথা পাবলিক

বিশ্বাস করবে। মেনেও নেবে। আর একবার বিশ্বাস করা মানে কিল্লা মার দিয়া হো।

কাছেই একটা কুকুর খুব জোর ঘেউ ঘেউ ক'রে ওঠে। হারু মণ্ডল চম্‌কে উঠে দাঁড়ায়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে—যে কাউকে দেখা মাত্র মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবে। কিন্তু কেউই আসে না। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে দূরে চলে যায়।

টুম্ব্, টুম্ব্, টুম্ব্।

পাখি ডাকছে। হঠাৎ নিশুতি রাতে কানে এলে হৃৎপিণ্ডে রক্তের দাপানি বেড়ে যায়। দূর নক্ষত্র-পুঞ্জের এখন হারিয়ে যাওয়ার পালা। আকাশের শেষ প্রান্তে গোটা চারেক তারা পাশাপাশি। দপ্ দপ্ করছে।

হারু মণ্ডল উঠে দাঁড়ায়। তখুনি একটা ক্ পাখি কু কু ক্ কু ক'রে ডেকে ওঠে। রাত যে ফুরিয়ে আসছে, এ তারই সঙ্কেতধ্বনি। আঁধারটাও কিরকম ফ্যাকাসে।

সমিরুদ্দীর সামনে হুইস্কির বোতলটা উলটে পড়ে আছে। একপাশে বন্দুকটাও। ডালমুট ছড়ানো ছেটানো। বিভোরে ঘুমোচ্ছে সমিরুদ্দী মাটিতে শুয়ে শুয়ে। তার নাক ডাকছে। ঝিঁঝি র তান আর ওর নাক ডাকা একসঙ্গে মিলে মিশে অদ্ভুত একটা কোরাশ তৈরি করেছে।

প্রচণ্ড রাগ হলো হারু ম ণ্ডলের। ইচ্ছে হলো ওর তলপেটে পা দিয়ে খুব জো রে একটা খাড়া লাথি মেরে জাগিয়ে দেয়। এই নাকি পাহারার নমুনা। যে কোনো সময় তার বিপদ হয়ে যেতে পারে। কেউ ঢুকে এতক্ষণ যে বন্দুকটা ধাঁ ক'রে দেয়নি, এই তার বাপের ভাগ্যি।

: সমির। অ্যাই সোম্‌রে। সোম্‌রা।

: অ্যা? বলতে বলতে একলাফে বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ায় সমিরুদ্দী। দাঁড়িয়ে মণ্ডলকে সামনে দেখে সে মাথা নত করে।

মণ্ডল তার রাগ চেপে যায়। না, কালাপাহাড়টাকে কিছুতেই চটানো যাবে না। বিগড়ে গেলে তার নিজের মাথায় বজ্রপাত। ও হলো দাবার ঘুঁটি। যেমন ইচ্ছে চাল দিয়ে যাও। চমৎকার পাবলিক এই কালাপাহাড়। সে তাই কণ্ঠে দরদ ঢেলে দেয়, সমিরুদ্দীর কাঁধে হাত রেখে বলে—শরীল খারাপ করে নাই তোরে?

সমিরুদ্দীর গাও-গতরে তখন জমে ওঠা নেশা। হাওয়ার টানে ভেসে যাওয়া

পাখির পালকের মতো উড়ু উড়ু। মাথাটা তার বাদশাহী মেজাজে পরিপূর্ণ। তার ওপরে খোদ মালিকের মদে আপ্যায়ন, কাঁধে হাত রেখে কুশল জিজ্ঞেস করা—সমিরুদ্দী নিজেই বাদশাহ্ হয়ে যায়। হারু মণ্ডলকে তার ইচ্ছে হয় দুই হাতে জাপটে ধরে চুমু খায়। মাথা নেড়ে সে হেসে বললো—শরালে·বেজায় ফুর্তি লাগতিছে। কি করতি হবি কন।

হারু মণ্ডল হাসতে হাসতে এইবার কাজের কথায় পৌছুনোর জাল বিস্তার করে—হ্যাঁ কবো। কিন্তু সোম্‌রা। তুই বিশ্বাস করিস তো · ·· আমি তোরে য্যাতোটা বিশ্বাস করি, দুনিয়ায় আর কাউরে তা করিনে? করিস তো?

শিশুর মতো হেসে ওঠে সমিরুদ্দী তার খোশমেজাজে—জানি।

: একটা কাজ করতি হবি।

: কাজীরে ছাডা আর ব্যাবাকেরই কল্লা কাটতি পারি।

: না-না। কল্লা টল্লা নিতি হবিনে।

: তালি?

: খুব তুচ্ছ কাজ। গাও-গতরে কুনো খাটাখাটি নাই। এই যে—দ্যাখ্—বলে ঢেঁকিঘরের কোণের উনোন থেকে মুঠি মুঠি ছাই তুলে আনে মণ্ডল। তারপর জামা খোলে। পরণের গেরুয়া ধুতিটা লুঙ্গির মতো ভাঁজ ক'রে পরে। জামা-গেঞ্জি—খালি বোতল সব প্লাষ্টিকের ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলে চটপট। তারপর সমস্ত শরীরে উনোনের ছাই মাখতে শুরু করে সে। মুখে পযন্ত।

সমিরুদ্দী তো হতবাক। এ তার কোন্ খেলা মালিকের? দেখতে দেখতে তার খুব মজা লাগে। সেইসঙ্গে কৌতূহল।

ছাইমাখা মণ্ডলকে তখন ফ্যাকাসে হয়ে আসা অন্ধকারে অন্যরকম দেখায়। আর ভস্মমাখা শেষ হলে মণ্ডল ভুরু নাচিয়ে হাসতে হাসতে বলে—এ হৈলো নতুন খেলা। কিছু বুঝতি পারলি?

সম্মিরুদ্দী মাথা নেডে জানায়—না।

: শোন্। এই নতুন খেলায় তুই হবি রেফারি। ফুটবল খেলায় রেফারি দেখিস নাই?

: হু।

: রেফারিই সব। ঠিক ঠিক গোল হলিউ, রেফারির তা পছন্দ না হলি—বাতিল কৈরে দিতি পারে। অফসাইড, ফাউল, হ্যাণ্ডবল, এইসব যে কুনো একটা অজুহাত তুইলে গোল ক্যান্সিল। তো তুই আমার রেফারি।

: হু।

: গায় ভস্ম মাইখলাম ক্যা ? তুই আর আমি আইজ রাইত বারোডা থিকে ভোর পৈর্যন্ত বেতবুনির শ্মশানে ছিলাম। গোকের কাছে কতি হবে এসব। তুই কৈবি।

: হু।

: সারা রাইত শ্মশানে যে কালীমন্দির, সেখেনে ধ্যান করিছি। তুই বাইরে খাড়ায়া আছিলি।

: হু।

: হঠাৎ দেখলি --আমার সামনে মড়ার খুলিডা লাফ দিয়্যা শূন্যি উইঠে গ্যালো। দেইখেই তুই ঐজ্ঞান হয়া মাটিতি পৈড়ে গেলি।

: হু।

: জ্ঞান ফির্যা আলি কি দেখলি ? খুব মন দিয়্যা শোন্। দেখলি, আমারে কোলে নিয়্যা মা-কালী আসনের পর বৈসে বৈসে চুমু খাতিছে।

: বাঃ খুব ভাল কথা।

: তোরে হু-তে পায়ছে

: হু।

: যেই দেখলি মা-কালী আমারে আদর করতিছে, কি তার আলো। যানি হাজার হাজার পুণ্যিমের চাঁদ সেই মন্দিরি। অ্যাতো রোশনাই ! দেখতি দেখতি তোর হাত-পাও কাঁপতি লাইগলো। তুই আবার ফিট হয়া গেলি।

: হু।

: ফের জ্ঞান ফিরলি দেখলি, মা-কালী তার আসনে মূর্তি হয়া খাড়ায়া আছে। আর সেই মড়ার খুলিডা শূন্যির পর নাচতি নাচতি আমার স্মামনে, য্যানে ছেলো, সেইখানডায় চুপ কৈরে বেসে পৈড়লো।

: খুব ভাল কথা।

: তুই আমারে কাঁধে কৈরে নিয়্যা যাবি। আরে না, বাড়ির কাছাকাছি যায়া একটা জঙ্গলের মোদ্যি লুকায়া থাকপো না। মানুষজন উঠতি শুরু করলি— আমারে কাঁধে নিয়্যা মন্দিরের বারান্দায় নামায়ে দিবি। আমি ধ্যানে বসপো। আর তুই চাইরদিক ছুটাছুটি করবি। ভেউ ভেউ কৈরে কাঁদবি। হাত জোড় কৈরে অনেকক্ষণ খালি চিক্ক্যার পারবি।

: হু।

: খালি কৈতি থাকপি—ওরে, আমি যবন হয়া কি দেইখলেম। আমি কি দেইখলেম। ওরে আমি কি দেইখলেম—বেতবুনির শ্মশানে। বুঝলি ?

: বুচ্‌ছি।

: অনেকক্ষণ পরে অ্যাতোক্ষণ যা যা কৈছি, তাই কৈবি। পারবি?

: পারবো।

: কানতি পারবিনে?

: হু। পারবো। কত ট্যাকা দিবেন?

মণ্ডলের মাথায় ধাঁ ক'রে আগুন জলে ওঠে—শুন। তুই একটা ইয়্যা, খচ্চর। একটা ধম্মোকম্মের কাম করবি

: আমি অধম্মো করবো না। ট্যাকাডা কত দিবেন, কয়া ন্যান।

: একশো।

: না।

: দুইশো।

সমিরুদ্দী রেগে যায়—শ' ট' মানতিছিনে। কয় হাজার তাই কন।

: যা—দুই দেবো। চল।

: হাজার তো?

: হু, হু। ইংরিজি বুঝিস। টু থাউজেন। গাণ্ডু কাহিকা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সমিরুদ্দী—পারবো 'না আপনার কাম করতি। গাণ্ডু কৈলেন ক্যা?

মণ্ডলের মাথায় হাত। সে অনুনয় করে—আরে গাণ্ডু হৈলেম আমি। আমার বাপ গাণ্ডু। আমার চৌদ্দপুরুষ গাণ্ডু। হয়ছে?

: হু। সমিরুদ্দীর দাঁতের ঝিলিক দেখা যায়। সে খুব খুশি।

আর হারু মণ্ডল তার মনে মনে গর্জাতে থাকে। এ শালো কালাপাহাড়ডাই তাকে দিনের পর দিন টুপি পরিয়ে যাচ্ছে। সে দ্রুত হাঁটতে হাটতে বলে—চল্। যা যা কৈছি—সব ঠিকঠাক মতো থাকে য্যানি।

ঠিক সেই সময়।

ভীষণ জমকালো। পাকা জামের রঙে শরীর রাঙিয়ে বিশাল একখণ্ড মেঘ উত্তর আকাশ থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে তিমিরপুরের আকাশে এসে আচম্‌কা সহস্র বাঘের মতো গর্জন ক'রে ওঠে।

গম্ গম্ গম্ গম্—গুমোম্ গুমোম্।

গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু—গুম্ গুম্ গুমোম্—গুমোম্।

ও কিসির শব্দ গো ?

উড়াজাহাজ ?

না। না। উড়াজাহাজ না।

ম্যাঘ। ম্যাঘ ডাকে। বিজ্‌লি চমকায়। কি ঝিলিক্। কি ঝিলিক্ :

থর থর কৈরে মাটি কাঁপে হে।

আশমানে লৈক্ষ লৈক্ষ হীরে-মাণিক চম্‌কায়।

মানুষ কান পেতে শোনে।

অমৃতের সন্ধান জানায় আশমান।

উত্তুরে ঘন কালো, মিশমিশে বাহার মেঘের। কি রং! কি তেজ!

বাতাস উড়ায়ে দিবিনে তো ?

না হে। বাতাস নাই। চাইরদিক থম্ থম্। এ ম্যাঘ ওড়ে না।

গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্।

গুম্ গুম্—গুমোম্ গুমোম্।

বহুদূর থেকে একটা মেঠো সুর ভেসে আসে। বাঁশীর মতো ভেসে বেড়ায় সেই সুর।

'দেওয়ারে তুমি অঝোরে ঝোরে নামো।

লাফিয়ে বেরিয়ে আসে জয়দেব মিস্ত্রীরা। দাসপাড়ায় হৈ হৈ। কৈবর্ত্যরা বরুণের নামে মানত মানে। কেউ মা গঙ্গাকে।

সেই উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে কাজীপাড়ায়।

জারি গানে মুখর এপ্রান্ত, সে প্রান্ত।

ওই যে। ওই যে···

ম্যাঘ। কি সোন্দর। পানিভরা টুপ্‌টুপা পানি। নামলি নদী হয়্যা যাবি।

হৈক। নদী হৈক। সাগর হৈক। যা হয় হৈক।

আমাগরে নদী চাই। সাগরও চাই।

নদী না হলি ফসল হবিনে। সাগর না হলি নদী সাগরে হাতি পারবিনে।

বৈন্যা হবি।

ফের আমরা বানভাসি হবো।

আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে…
আশমান হৈল টুটা-টুটা, জমিন হৈল ফাটা
ম্যাঘ রাজা তোর লুকায়া আছে
ম্যাঘ দিবো কেডা—
আল্লা ম্যাঘ দে।

রাত আড়াইটে নাগাদ মেঘের যখন অতো ঘনঘটা ছিলো না, কিন্তু দূরে তার সাড়া ছিলো। বিদ্যুৎ চমকানি ছিলো, সেই সময় ঈশ্বর এসে দাঁড়ায় ছাতিম তলায়!

একটু পরেই কাজী আসেন। তারপর মজনুর সাথে জয়নালের বউ রাজিয়া।

জয়নালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রিতে যখন হাক মণ্ডলের কাছারি থেকে সবাই ফিরে আসে। সাথে জয়নালও ছিলো। একে একে সবাই ঘরে ফিরে গেছে। কিন্তু জয়নাল ফেরেনি। রাজিয়ার সকাল থেকে উপোস। কিছুই রান্না হয়নি ঘরে। কারও কাছে এক ছটাক চাল-বা গমও ধার পায়নি। জয়নাল তা জানতো। সকালে ও নাকি খুব কেঁদেছিলো ঘরের ভেতর লুকিয়ে লুকিয়ে। রাজিয়াকে বলেছিলো, শহরে চলে যাবো। কুলিগিরি করবে যতদিন চাষের আশা না থাকে। রাজিয়া কাঁদছিলো অবিরাম শব্দ ক'রে।

শুনে কাজী বললেন—তুমি আমার ঘরে আসো নাই কি জন্যি। চারডে গম—আর কলাই আমি দিতি পারতাম। জয়নাল আমার জন্যি যা করিছে—

রাজিয়া কাঁদতে কাঁদতে জানায়—হের মানা ছেলো। খালি কৈতো, আহারে, ফেরেশতার মতো মানুষটা না খায়া মৈরে যাবি। কিছু চায়ো না তার কাছে। তার ঘর ফাঁকা। মাথার মোদ্দি দশজনের চিন্তে-ভাবনা। তার কাছে হাত পাতলি শুনা হবি আমাগরে।

ঈশ্বর চিন্তিত মুখে বলে—শহরে গেলি তো তুমারে অন্তত কয়া যাবি।

রাজিয়া সবেগে মাথা নাড়ে—না-না। খোদার কসম, আমি কিছু জানিনে। বিকাল বিকাল বারায়া আইলো।

: হু। কাজী গম্ভীর হলেন। বললেন—মজনু, তুই বউমারে চাচির কাছে দিয়্যা আয়। চাড্ডে গম-কলাই যাই হৈক ফুটাতি ক। না খায়া আছে সারা দিনমান।

আপত্তি জানায় রাজিয়া প্রবলভাবে—না-না। আমি কিছু খাবো না গো। আগে তার খোঁজ খবর করেন আপনেরা।

কাজী এগিয়ে এসে রাজিয়ার মাথায় হাত দিয়ে আশ্বাস দেন—কথা শুনতি হয়। বলতে গিয়ে কাজীর কণ্ঠ ভিজে আসে—খুব চাপা ছাওয়াল ও। কুনোদিন মুখ ফুইটে কিছু কয় না। অভিমানিও। আছে কোনোখানে। আমি য্যামন কৈরে পারি, ভোর রাতির মোদ্ধি খবর সংগ্রহ করবোনে। তুমি যাও মজনুর সঙ্গে। আমিতো লোকজন ডাকতি পাঠাইছি।

: যাও বেটি, যাও। কনে যাবি। কাছে ভিতিই আছে। বললো ঈশ্বর।

কিন্তু স্বচ্ছন্দে যেতে চায় না রাজিয়া। গড়িমসি করে। আর কাঁদতে থাকে। মজনু তাকে ডাকে—ও ভাবী চলো। তুমারে রাইখে—আমরা বারাবো খোঁজ করতি।

অনিচ্ছায় রাজিয়া মজনুকে অনুসরণ করে। আর ঘাড়ের পেছনে বাঁ হাতের চাপ দিতে দিতে ক্লান্ত ঈশ্বর ছাতিমতলায় বসে। কাজীও বসেন।

: বিড়ি আছে ঈশ্বরদা ?

: আছে।

ঈশ্বর বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয়। কাজী বিড়ি ধরিয়ে কষে কষে টানতে থাকেন। হঠাৎ দমফাটা কাশিতে আক্রান্ত হন তিনি। কাশতে কাশতে মাথাটা নুয়ে পড়ে মাটির দিকে।

: কি হৈলো ?

কাজী হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় বলেন—মরণ হলি বাঁচি ঈশ্বরদা। অ্যাতো সোমেস্যা আর মাথায় কুলায় না গো।

: তা ঠিক। যে মরে সে বাঁচেই। কিন্তু যারা বাঁইচে থাকপি—সেই নিঃসহায় সম্বলহীন মানুষের কি উপায় ? একসাথে তো সবসুদ্ধা মরা যায় না।

: কি করবো কও।

: এট্টু এট্টু কৈরে আগাতি হয় কাজীদা। ধৈর্যডা আসল পরীক্ষ্যা। তুমি ধৈর্য হারাইছো কি খতম।

: জয়নালভাইবা কনে গ্যালো।

: আশ্চর্য ছেইলে ও। কিরম কানতিছিলো যখন তুমারে ঘুষি মারছিলো শুয়ারের বাচ্চাটা। আমার কি মনে হয় জানো ?

: কি ?

: তুমি মণ্ডলের পর চড়াও হতি ছ্যাও নাই, সেই রাগে বা দুঃখ কও, অপমান কও জয়নাল সৈহ্য করতি পারে নাই। কেন্দে ফ্যালাইছিলো।

: তখুনি বুঝছিলেম। কিন্তু কি করার আছিলো আমার? মণ্ডলের পর হামলা হলি—অ্যাতক্ষণ এই তিনপাড়ায় কুনো মনিষ্যি থাকতি পাইরতো না। রামেশ্বরপুর বাজারে তো সি. আর. পি মজুতই আছে। যে কুনো ছুতা-নাতায় ঝাপায়ে পৈড়বে। আমি কি তাগরে সুযোগ কৈরে দেবো ঈশ্বরদা?

: তা ঠিক। কিন্তু মণ্ডল তো ভবিষ্যতে শয়তানি করতি ছাড়বিনে। তার কাছে টিপ-ছাপ দেওয়া সাদা কাগজ তো এগরে মৃত্যুবাণ।

: ও আর আদায় করা যাবিনে। ভবিষ্যতে সেরম কিছু করতি আলি তখন লড়াই করতি হবে। সেই লড়াইডা যাতে করা যায়—তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার এখন থিকে।

ইতিমধ্যে মজনু ফিরে আসে। দাস পাড়া, কৈবর্ত্য পাড়া থেকে লোক আসে। কাজী পাড়া থেকেও। প্রায় পনেরো-কুড়িজন।

কাজী বললেন—সবখানে খুঁজতি হবে। মাঠ-ঘাট পৈর্যন্ত। আমিও তুমাগরে সাথে যাতি পারি।

মজনু মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়—না। আমরা অনেক মানুষ আছি। পথে আরো দুই চারজন পাবোনে। আপনে ঘুমান গিয়্যা।

ঈশ্বর তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠতে উঠতে বলে—চলো, আমি যাই।

মজনুর এক জবাব—আমরা জোয়ান ছেলেরা থাকতি আপনেরা কি জন্যি? বিশ্রাম ন্যান গে। এইতো আমরা দুই দলে ভাগ হয়্যা খোঁজ খবর করতি যাতিছি।

কাজী বললেন—সাবধান-সতর্কমতো খোঁজ নিস বাবা। কারো সাথে য্যান ঝগড়া বিবাদ না হয়। আর এই দক্ষিণ মাঠের ওইদিকটাও দেখিস। মানুষ ডুবির খালের অনেকই তো কিচ্ছা কাহিনী আছে।

ওরা চলে যায় লাঠি সোটা নিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে ঈশ্বর বলে—ও কাজীদা চায়াই ছ্যাখো—ওইযে। ঈশ্বর উত্তরের আকাশ দেখায়।

: ম্যাঘ? আরে তাইতো? কুন্‌দিক যায়?

: যায় না। ইদিকেই গতি। আগায়া আসতিছে।

: বিজলিও চমকায় দেখি।

: গুড়ু গুড়ু ডাকটা শুনতি পাও না?

: ম্যাঘের ডাক। বহু দূরের আওয়াজ।

: ক্রমে কাছায়া আসপে।

: তালিতো বাঁচি ঈশ্বর দা।

: ওই ছ্যাখো। ছ্যাখো। ওই যে—মানুষ ড্ুবির খালে লম্ফ হাতে কারা। উরা গান গাতিছে না? মনে হয় লাফাতিছে। ছায়া-ছায়া মূর্তি। অনেক মানুষ।

কোরাশ ভেসে আসে। অস্পষ্ট। কিন্তু বোঝা যায়।

আল্লার কাছে ভুকা মানুষের প্রার্থনাসঙ্গীত।

আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই

আল্লা ম্যাঘ দে—

সেই কোরাশ কখনো স্পষ্ট। কখনো অস্পষ্ট। সেদিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমাগরে ছ্যাশে এখনো মানুষ ঈশ্বরের কাছে হাঁ-পিত্যেস ক'রে ভিক্যে চায়। চীন-রাশিয়ায়—মানুষ আইজ আর প্রকৃতির দয়ার উপুর ভরসা করে না। তারা বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে, মানব শক্তিকে কাজে লাগায়া উষর মরুভূমিতেও ফসল ফলায়। বিদ্যুত্যের উৎপাদন করে। আর এই পোড়ার ছ্যাশে-মানুষ মানুষকে গিলে খায়। বর্বরের মতো অত্যিচার চালায়। ধর্মের দোহাই দিয়্যা লুটপাট করে গরিবের যথাসর্বস্ব। এ যে কবে ঠ্যাকানো যাবি, বন্ধ করা যাবি মানুষের বাঘ হয়ে ওঠা। মানুষ মানুষকে গিলা খাওয়ার এই কলটা—কবে বিকল ৈকরে সাগরে নিক্ষেপ করা সম্ভব হবি—।

কাজী সে কথার কোনো জবাব দেন না। তিনি আকাশ দেখেন। মেঘের গতিবিধি দেখেন। জয়নালের জন্যে বুকের ভেতরে উদ্বেগ। সেই সাথে মদনের কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে ফেরার হলো। সুদীপ-সৈকত ওরা কবে ফিরতে পারবে। গাজিয়ুলটা নাকি এখন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। একেক সময়—একেক জায়গায় আচমকা নরখাদকদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রখান ক'রে দিচ্ছে। ওর ছায়াও কেউ দেখতে পায় না। মদন-সুদীপ-সৈকতরাও শ্রমিকদের মধ্যে গোপনে কাজ করছে। কেউ নাকি বসে নেই।

নসিরণ প্রায়ই মদনের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। শত হলেও গর্ভজাত সন্তান। ছেলের জন্যে মা-তো কাঁদবেই। সব মা-ই কাঁদে। কাঁদে আর ধোয়াশায় ছাওয়া চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে ভবিষ্যতের দিকে। সুদিনের আশায়।

ঈশ্বর নীরবতা ভাঙে—কাজী দা। এই নিশি জাগরণের তো শ্যাষ আছে। সব কিছুরই য্যামন আরম্ভ আছে, তার শ্যাষও আছে। কি, আছে তো?

: বিড়ি নাই আর ?

: আছে।

: দ্যাও।

বিড়ি ধরালেন কাজী। আবারও নৈঃশব্দ্যে ডুবে গেলেন তিনি।

ব্যাঙ ডাকছে। মাঠের চারপাশ থেকে সমস্বরে ডাক। এতক্ষণ ওদের কোনো সাড়াশব্দ ছিলো না। এবার সত্যিই তাহলে জল নামবে আকাশ ফুঁড়ে ? ব্যাঙেরা নাকি বৃষ্টির গন্ধ পায়। বুঝতে পারে। আর তাই এমন ক'রে মহানন্দে চারদিক থেকে একজন আরেকজনকে আহ্বান জানায় আসন্ন জল বিহারের। দূরের লম্ফর আলো নিভে গেছে।

ঘরে খাদ্য নেই। লম্ফর তেল কোথায় ? কিন্তু তখনো মেঘের জন্যে, বৃষ্টির জন্যে আকুল প্রার্থনাসঙ্গীত চলেছে।

হঠাৎ জোর-উদ্দাম হাওয়া ছুটে আসে। খুব গরম ধাপ। গম্ গম্ শব্দে মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের ঝিলিক। ধুলো-বালিতে ঢেকে যায় চোখ মুখ।

বড়-বড়-ফোঁটা

অমৃত অমৃত।

চারদিকে হই-হই-আনন্দ ধ্বনি, কাজী পাড়ায়, কৈবর্ত্য পাড়ায়, দাস পাড়ায় ·· পাশাপাশি লাগোয়া এই তিন পাড়ার মানুষের উল্লাস আর আনন্দের কলোরোল ভেদ ক'রে নেমে আসে বৃষ্টির ধারা। তার সাথে উন্মাদ হাওয়া।

বৃষ্টি, হাওয়া, আর মানুষের উল্লাস, বিদ্যুতের ঝল্কানি·

ঈশ্বর কাজীর হাত ধরে টানতে টানতে বলে—ঘরে চলো, ঝড় আসতিছে।

ঝড় আসে না।

হাওয়ার ঝাপটা থেমে যায়। পৃথিবীর তৃষিত বাসনাকে পরিপূর্ণ করার জন্যে নেমে আসে অবিশ্রান্ত ধারায় কোমল জলধারা। গাছ-গাছালির শরীর ধুয়ে, মানুষের বসতের চাল গড়িয়ে, পোড়া মাঠের বুক ভাসিয়ে নামতে থাকে ঝর ঝর, ঝর ঝর· ·রাশি রাশি মুক্তোকণা।

সোঁদা-মিষ্টি-মেঠো সুগন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে মন। বকুলের গন্ধ কী এত মিষ্টি ? রজনীগন্ধা কি এত মিঠেল আদর ঢালে ?

সেই সময় 'অবতার' হারু মণ্ডলকে কাঁধে ক'রে—ভোরের আলোয় ছুটতে ছুটতে আসে সমিরুদ্দী। তার ঘাড়ে ঝোলানো বন্দুক। বুকের সাথে জাপটে ধরা হারু মণ্ডলের থাই আর প্লাস্টিকের ব্যাগ। ব্যাগের ভেতরে তখন জামা আর পিস্তল।

চারদিক থেকে বিস্ময়কর প্রশ্ন, উদ্বেগ, কৌতূহল ভেসে আসে। সমিরুদ্দী কোনো দিকেই দৃকপাত করে না। মণ্ডলকে এনে বসিয়ে দেয় মন্দিরের পাদদেশের চারা বেল গাছটার নিচে—যেটাকে দেবার 'বোধনবেদি' বলা হয়।

মণ্ডল বৃষ্টির ধারায় ভিজতে ভিজতে মাতম শুরু ক'রে দেয়। ট্রেনের দ্রুত ঝাঁকুনির মতো তার মাথা ও শরীর দুলতে থাকে। সে চিৎকার করে, জয় শ্যামা, জয় শ্যামা, জয় শ্যামা, জয় শ্যামা

থেকে থেকে বিকট অট্টহাসি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

জয় শ্যামা, জয় শ্যামা, জয় শ্যামা, জয় শ্যামা···।

সমিরুদ্দী তার পাহারাঘরে বন্দুক-পিস্তলের ব্যাগ রেখে তালা লাগায়। তারপর ছুটে চলে যায় অন্দর মহলে আর সবাইকে বলতে থাকে—ওরে তুরা যে যা পারিস, ঠাকুরবাবা অবতার হয়ছে, চরণে পর গিয়্যা। মাথায় ছাতা ধর গিয়্যা· দেরি করলি ঠকপি ·। যা-যা ছুটে যা··।

সঙ্গে সঙ্গে গলগ্রহের দল ছাতা নিয়ে, দল বেঁধে ছুটে যায়। সমিরুদ্দী কাছারি ঘরের দরোজায় ধাক্কা দেয়।—ওরে গুনাহ গারিরা ওঠ্, ওঠ্। বলতে বলতে দুম্‌দাম্ দরোজায় আঘাত করে। হুড়্‌ড় ক'রে বেরিয়ে আসে কর্মচারীরা ঘুম ভাঙা চোখে।

সমিরুদ্দী আঙুল তুলে দ্যাখায়—ওই, ওই, ঠাকুর অবতার হয়ছে। বলতে বলতে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে সমিরুদ্দী। তারপর পাগলের মতো দুইপাশে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠোনের জল কাদায় আছাড়ি-বিছাড়ি করতে করতে মণ্ডলের শেখানো কল্পকাহিনী নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে। বর্ণনা করে আর চিৎকার ক'রে কাঁদে। বুক চাপড়ায়। মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে। হা-হা ক'রে হাসে। নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা ঠোকে।

গলগ্রহরা ভিড় ক'রে শোনে। মেয়েরা উলুজোকার দিয়ে ওঠে। কেউ একজন শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করে। মণ্ডলের মাথায় তখন ছাতার মেলা। বৃদ্ধ সেরেস্তাদার অকৃতদার মানুষ। সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মণ্ডলের পায়ের নিচে—হুমাড় খেয়ে পড়ে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারাকে কেউ পরোয়া করে না।

সেরেস্তাদার হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। চেঁচিয়ে সবাইকে বলে—ওরে, ওরে পাপী-তাপিরা শোন্, বাবাঠাকুর 'অবতার' হয়ছে. বলে—দেবতারা আনন্দে এই সহস্র আনন্দধারা বর্ষণ করতিছেরে। না হলি এই মরুভূমিতে হঠাৎ এই বর্ষণ হয়রে বোকারা?

মণ্ডল তখন উন্মাদ মাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তার সর্ব শরীরে ভূমিকম্প। মুদিত চোখ।

জয় শ্যামা-জয় শ্যামা-জয় শ্যামা-জয় শ্যামা—।

সেই সময় আবার জোর বাতাস শুরু হয়।

প্রলয় ঝড় ওঠে।

অসহ্য উগ্রতেজা খরার উত্তাপ ডুবিয়ে হাড়ে কাঁপন ধরানো শীত নামে। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে ভক্তেরা। কিন্তু মণ্ডল কাঁপে না। তার শরীরে তখনো পুরো বোতল হুইস্কির উষ্ণতা। সে সমান তালে মাতন চালিয়ে যায়।

রাশি রাশি জবাফুল আসে। বেলপাতা আসে।

ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সমিরুদ্দীর বিকট চিৎকার সবাইকে চাঙ্গা ক'রে তোলে—চারদিক খবর দে। খবর দে। যে য্যানে পারিস খবর দেরে তুরা। বাবাঠাকুর বুঝি আমার বাঁচপিনেরে। ওরে কী দেখলাম, কী দেখলাম আমি—এই পোড়া চোখি কী দেইখলাম। ওরে বেতবুনির শ্মশান ঘাটে—মা শ্যামা বাবা ঠাকুরকে কোলে নিয়্যা আদর করতিছে। চুমু খাতিছে রে—।

যাও। ছোটো। রামেশ্বরপুর যাও। হাস্নাবাদ যাও—।

খবর দ্যাও। খবর ছড়ায়্যা দ্যাও।

শুনতে শুনতে মানুষ প্রথমে হক্‌চকিয়ে যায়।

গুজব। গুজব।

না হে না। গুজব না। একজন মুসলমান মিছে কথা কতি পারে না। সমিরুদ্দী নিজির চোখে দেখিছে। শোনো গিয়্যা তার কাছে।

আরে—মরুভূমি হয়্যা গিছিলো তিমিরপুর, রামেশ্বরপুর। হঠাৎ আইজ এই বিষ্টি ক্যা? এই ঝড় ক্যা? দেবতারা আনন্দধারা বর্ষণ করতিছে বাবা ঠাকুরের মস্তকে।

ঠিক। ঠিক কথা।

হঠাৎ এই ঝড় বিষ্টি কি জন্যি?

আরে বিশ্বাসে মিলায় কিষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

হুঁ। হুঁ।

ছুটতে ছুটতে রঙ্গলাল দাগা এসে হাজির সেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। তার পেছনে বাজারের দোকানীরাও দোকানে তালা মেরে ছুটতে ছুটতে আসে।

এসে দেখে শঙ্খ বাজছে। মন্দিরের পুরোহিত নামাবলী গায়ে ধ্যানমগ্ন তাপস হারু মণ্ডলের সামনে ধ্যানস্থ।

সমিরুদ্দী এক হাঁটু জল-কাদায় বসে রামভক্ত হনুমানের মতো জোড় হাতে উপবিষ্ট।

ফল আসছে।

আতপ চাল আসছে।

ফুল। বেলপাতা। চন্দনধূপ জ্বলছে।

শঙ্খনিনাদ।

মুহুর্মুহু: উলুজোকারের কোরাশ।

সেরেস্তাদারের কাছে রঙ্গলাল দাগা সমিরুদ্দীর কথিত গল্প আরো রং-চং লাগিয়ে শোনে। শুনতে শুনতে ফুকুৎ ফুকুৎ শব্দে, শিশুর মতো ঠোঁট ভেটকে কাঁদতে থাকে দাগা সাহেব।

ফুকুৎ ফুকুৎ শব্দের কান্নায় সে বলতে থাকে, জয় মা শ্যামা, এহি তোর কিরপা হ্যায়? বাবা ঠাকুরকে কোল দিলি, ইকটো মুসলমানকে ভি দিখা দিলি, এহি কিরপা। হা-হা—আব সমঝা, সমিরুদ্দী তো বাবাঠাকুরকো বহুৎই পিয়ারের বান্দা। ছায়া কি তরা হামেশাহি সমরুদ্দী বাবা নাকুরকো সাথ ঘুমতা-ফিরতা। ইস্ লিয়ে শ্যামা মাইকি দর্শন মিলা। বলে আবার ঠোঁটে ভেটকে ফুকুৎ ফুকুৎ ক'রে কাঁদতে থাকে দাগা সাহেব। তারপর ছুটে গিয়ে সঙ্গে আসা তার বাঙালি কর্মচারীকে কি যেন অনেকক্ষণ ধরে বলে। হাত নেড়ে নেড়ে বোঝায়। তারপর খুব খুশ মেজাজে তার পিঠে একটা চাটি মেরে বলে—যাহ্ ভেইয়া। এক ঘণ্টে কা অন্দর সব কুছ্ রেডি চাই।

কর্মচারীটি হাসিমুখে ছুটতে ছুটতে চলে যায়।

দাগা সাহেব করজোড়ে এসে দাঁড়ায় মণ্ডলের সম্মুখে।

বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারায় ভেসে যেতে থাকে আঙিনা। কল্ কল্ শব্দ ওঠে মন্দিরের পেছনের খালে। জলপ্রপাতের মতো তার ধ্বনি।

দাগা করজোড়ে আপনমনে বলতে থাকে—জয়মা শ্যামা। তুর মর্জি কে বুঝবে বেটি।

ক্রমে মানুষের জমায়েত বাড়তে থাকে। অহো। অহো। কেডা বুঝবি মার মর্জি।

ওদিকে বসিরহাটে টেলিফোন চলে যায় দাগার গদি থেকে।

দু' ঘণ্টার মধ্যে ভোমা-পাঁচ-সাতখানা মোটর বাইক হাঁকিয়ে তার দলবল নিয়ে চলে আসে। অনাদি খাসকেল এসেই সব শুনে মালকাছা মেরে—সেই যে জয়মা শ্যামা বলে দাগা সাহেবের কর্মসূচী পালনে লেগে পড়ে—বাড়ির কথা তার মনেও থাকে না। কাজ করতে করতে একেক সময় 'বোধনবেদির' কাছে ছুটে আসে আর কাঁদতে কাঁদতে বলে—ওরে, শ্যামার দ্যাখা পাবি বলেইতো দাদার আমার সংসারে মন নাই। বিষয়-আশয়ে মন নাই। খালি সব সময় গুনগুন কৈরে গায়—চাইনে মাগো রাজা হতে / রাজা হবার সাধ নাই মাগো / দু'বেলা যেন পাই মা খেতে—। আহারে দাদা, সমিরুদ্দীরেও তুমি ধৈন্য কৈরলে। ওরে অ্যাতো দিন তো বুঝি নাইরে, দাদা আমার ভাবের ঘরে চুরি করা শুরু করিছে। জানতি পারলি আমি হতভাগা কি পাছ ছাড়ি তুমার।

এই সময় আবার শঙ্খ নিনাদ শুরু হয়।

উলুজোকারের তুমুল কোরাশ।

পুরোহিত ধ্যান সমাপ্ত ক'রে—পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে শ্যামা মূর্তির সামনে আরতি করে। তারপর এসে দাড়য়ে মণ্ডলের সামনে। মণ্ডল তার মুদিত চোখে বিড়বিড় ক'রে বলে চলেছে শ্যামা নাম। শরীর তার স্থির।

চারদিক থেকে নর-নারীর ভক্তি গদগদ ধ্বনি। রামেশ্বরপুরের বেনিয়ারা সমানে টাকা ছুঁড়ছে। কেউ সিকি, কেউ আধুলি, কেউ কাঁচা টাকা।

ভোমার দল বিশাল বিশাল তাম্রপাত্র ভরা টাকার পাহাড় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার শূন্যপাত্র এনে রাখছে মন্দিরের বারান্দায়।

পুরোহিত সহসা দৃপ্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে :

পরিত্রাণায়ং সাধুনাম্ বিনাশায়চঃ দুষকৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামী যুগে যুগে।

অনাদি জলে-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে—দাদা গো, চরণের ধুলি দ্যাও গো দাদা। তুমি যে তিমিরপুরের আঁধার দূর করতি, নরলোকের পাপ খালন করতি নব অবতার হয়ছো। নয়া পরমহংস হয়ছো··· দাদা ···দাদা···দাদা···।

ভোমা তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে কাছারির বারান্দায় ঢুম্ ক'রে ফেলে

দিয়ে বলে—শালা বাড়ানির ছেলে, অবতারকে দাদা দাদা ক'রে শালা জমানো আসরটা মাটি ক'রে দিচ্ছিস্!

অনাদি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে ভোমার মুখের দিকে। ভয়ে সে একটা কথাও বলতে পারে না। শুধু আপন মনে বিড় বিড় করে আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

বৃষ্টির তোড় কমে এসেছে। ঝির ঝির ইলশেগুড়ি ঝরছে মাঝে মাঝে। ভোমা অনাদিকে ছেড়ে দাগার কাছে আসে। দাগা তখন আঙিনার উলটো দিকে ত্রিপল টাঙিয়ে আচ্ছাদন গড়ার তদারকিতে ব্যস্ত।

কাছারি ঘরের পেছনে জল-কাদা ঝেটিয়ে সেখানেও ত্রিপল টাঙানোর কাজ চলছে। ভোমা এসে দাগাকে ধরলো। ইশারায় তাকে নির্জনে নিয়ে এসে বললো—মাল খিচ্‌নে অসুবিদা আছে। আপনি শালা মেড়োর ব্রেন চালিয়ে বিজিনেস খিচার তাল মারছেন। সে আমি বাধা দেবো না। লেকিন বাৎ ইয়ে হ্যয়, রাতকো হিস্যা ঠিক ঠিক্ মিলনা চাহিয়ে।

দাগা হতভম্ব হয়ে বলে—আরে ভোমা ভেইয়া, এহি কই বিজিনিস কা মওকো হতে পারে? ঠাকুরবাবা কো মাকি দর্শন মিলা—

ঃ ধুস্‌ শালা। ঠাকুরের পাইন মারি আমি। ভণ্ডামী। ওসব ঢের অবতার ভোমার মুঠে পয়দা হয়েছে। আমি এসেচি। থানা-টানা বিলকুল হেল্‌প করবে। পাবলিসিটি আরো জোর চালাবার কায়দা ক'রে দিচ্চি। আপনি শালা ওহি ফুকুৎ ফুকুৎ ক্রাইংটা চালিয়ে যান।

ঃ হাঁ হাঁ। ঠিক হ্যয় ভেইয়া।

ঃ বেশ ঝোলা খিচুড়ি আর ঘ্যাট পাকাতে বলুন। এক সপ্তা এইসে চলবে। আমি আছি। আমার দল আছে। শাল-পাতার ঠোঙা আনিয়ে নিন। সিগারেট দিন।

দাগা সাহেব ভোমার হাতে এক প্যাকেট সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে—ফুকুৎ ফুকুৎ ক্রাইং করতে করতে ছুটলো তদারকির কাজে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সূর্য মাথার ওপরে মেঘের ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে থাকে। কুসুম রঙের রোদ ছড়িয়ে পড়ে সারা আঙিনায়। কোমল-সবুজ-ঝকঝক্ করে গাছ-গাছালির পাতায়-লতায়। ডালে ডালে। পাখিরা কাকলি করতে থাকে।

সূর্য মেঘে ঢেকে যায় আবার। ঝির ঝির ক'রে হালকা নরম ইলশেগুড়ি

নামে। দু'তিন মিনিট। তার পর আবার থেমে যায়। চার-পাঁচ মিনিট পরে ফের মেঘের ফাঁকে উঁকি দেয় সূর্যের হাসি হাসি মুখ। কুসুম কুসুম রোদ।

মণ্ডলের দেহ তখন ভাবে অচৈতন্য হয়ে বোধন বেদিতে শ্লো মোশানের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে শায়িত হয়। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে যায়।

দাগা সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সমিরুদ্দীর কাছে। হাত জোড ক'রে সমিরুদ্দীর কাছে নিবেদন করে—তুম্‌ভি অব্‌তার কো সাথী হো। শ্যামা মাইকি দর্শন মিলা তুম্‌কো ভি। তো ইথোন আদেশ করো ঠাকুরকো কা কিয়া যায় ?

সমিরুদ্দী মনে মনে হাসে। দাগাকে খিস্তি দেয়। ওরে শালা হারামীর হাত বাক্‌সো। শালা এতদিন তো সোম্‌রে কতিস। বাইনচোৎ কতিস। নেড়ে নেড়ে কৈরতিস। অ্যাখন হাত জোড। অবতার। সে চোখ মেলে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে—ঠাকুরবাবারে অন্দরে নিয়্যা যাও।

ছোট অবতার সমিরুদ্দীর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের জনারণ্যের ভিড় ঠেলে ভোমা তার কাঁধে ফেলে হারু মণ্ডলকে। তারপর বেদিতে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিয়ে ওঠে—জয়শ্যামা।

হাজার ভক্তের কণ্ঠে নিনাদিত হয়—জয় শ্যামা।

ভোমা চিৎকার ক'রে ওঠে আকাশে হাত তুলে—হারু নাম কেবলম্‌।

সঙ্গে সঙ্গে ভক্তারণ্যে ধ্বনিত হয়—হারু নাম কেবলম্‌।

তারপর হাসিমুখে ভক্তের অরণ্য ভেঙে ভোমা মণ্ডলকে কাঁধে নিয়ে অন্দরমহলে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা ছুটতে থাকে। ভোমার দল তাদের আটকায়। ভক্তেরা কাতর অনুনয় করে। ভোমার দল তাতে কর্ণপাত করে না। তারা ভক্তদের ঠেকাতে ঠেকাতে ধ্বনি দিতে থাকে—হারুনাম কেবলম্‌।

ভক্তেরাও ধ্বনি দেয়—হারুনাম কেবলম্‌।

সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামিত সেই ধ্বনির মাতন শুরু হয়ে যায় সারা আঙিনায়। পথে-পথে। হারুনাম কেবলম্‌। হারুনাম কেবলম্‌।

বিউটি ভয়ে ভয়ে ঘরের দরোজা আটকে মণ্ডলের সেবা-শুশ্রূষা করে। পোশাক বদলে দেয়। হারুমণ্ডল ঘোরের মধ্যে থাকে। সে ধরা দেয় না বিউটিকেও। নিজের স্বরূপকে উন্মোচিত করে না কিছুতেই। সে এখন পরিপূর্ণ অবতার।

বাইরে ক্রমশ বাড়তে থাকে ভিড়ের চাপ। দূর দূরান্তে কি ক'রে ঝড়ের বেগে

খবর পৌঁছে যায় কেউ তা জানে না। শুধু মোটর বাইক নিয়ে ভোমাকে দেখা যায় কিছুক্ষণ থানায় বসে টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।

তারপর ফোর্স নিয়ে সে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসে মণ্ডলের আঙিনায়।

নবীন এখন সমিরুদ্দীর পরিচর্যায় ব্যস্ত। তাকে বেলের সরবৎ দেয়। নতুন-কাপড়-জামা এনে পরায়। হাত পা টিপে দেয়। আর আফসোস ক'রে নিজের পোড়া কপালের। নিজের হাতে কিলোখানেক সন্দেশ খাওয়ায় জোর ক'রে। হাতে-পায়ে ধরে।—তুমি ছোটঠাকুর। খাও। খাও। ও ঠাকুর, তুমি অপরাধ ক্ষ্যামা কৈরে দ্যাও আমার।

সমিরুদ্দীর ঠোঁটে আকর্ণ হাসি।

চোখে দেবতার দীপ্তি।

জোয়ান ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যায় নিজেরাই। খিচুড়ি রান্না শুরু হয়ে যায়। চার-পাঁচটা উনোনে কড়াই—ডেচ্‌কি চেপে—ঘ্যাট খিচুড়ির সুগন্ধি বাতাসে মউ মউ করে।

বেলা যত বাড়ে, খবর তত ছড়ায়—ভিড়ের ঠেলায় তখন আঙিনা পরিপূর্ণ হয়ে রাস্তা, কাছারির মাঠ—উপ্‌চে পড়ে।

আঙিনার মাঝখানে—ত্রিপলের নিচে বড মাপের জলচৌকি রাখা হয়। তাতে ফরাস ধব্‌ধব্‌ করে। সেখানে সমিরুদ্দীকে নিয়ে এসে বসানো হয়। তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে ভোমার গ্রুপ।

বোধনবেদির সামনের দু'তিনটে তাম্রপাত্র চার-পাঁচ মিনিটে ভরে উপ্‌চে পডছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে খুচরোর বৃষ্টিধারা। সেখানেও ভোমার গ্রুপ।

ইতিমধ্যে মাইক এসে যায়।

ভোমা মাইক নিয়ে বসে যায় চেয়ারে। মাইক্রোফোন তার হাতে। সে অনবরত, কোন বিরতি না দিয়ে হারুমণ্ডলের দেবী দর্শনের কাহিনী প্রচার করতে থাকে। বলতে থাকে—দেবী যখন ঠাকুরবাবাকে জিজ্ঞেস করে—তুই কি চাস? দুটো বর দেবো তোকে।

শুনুন! ঠাকুরের মহত্ত্বের কথা শুনুন।

ধন দৌলত না। ব্যবসা বাণিজ্য না। মন্ত্রী-টন্ত্রী না। কি চাইলেন বাবা-ঠাকুর, জানেন?

বললেন—মা শ্যামা, জগত্তারিণী তুই। আমার দেশটা শ্মশান হয়ে গেলো খরায়। তুই বর্ষণ দে।

মা বললেন—তথাস্তু।

দুই নম্বর বর কি চাইলেন জানেন ?

না, না। ধনদৌলত না। সুন্দরী বউ টউ না।

মহান ঠাকুর বললেন—ভারতের সংহতি ও শান্তি।

শ্যামা মা অবাক।

একি বলছে ঠাকুর। নিজের জন্যে কিচ্ছু চাইলেন না, এ কেমন ভক্ত। জীবনে তো শ্যামা মা লাখ লাখ লোককে বর দিয়েছেন। সবাই নিজের সুবিদেটাই বাগিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের ঠাকুর কি চাইলেন ?

এক নম্বর—বৃষ্টি।

দুই নম্বর—ভারতের সংহতি আর শান্তি।

আর ওই সমিকদ্দীবাবু যাকে আঙিনার মাঝখানে আমরা আপনাদের দর্শনের জন্যে রেখেছি, তিনিও দেবার দর্শন লাভ করেছেন। কি সৌভাগ্য ভাবুন।

আপনারা, মা বোনেরা, মাসিমারা, পিসিমারা, মেসোমশাই, পিসেমশাইরা, আমার সাথে সাথে··

এই সময় ভোমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলো দাগা সাহেব। ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো—বাবাঠাকুর পাঠ্ইয়ে দিলেন। পাবলিসিটিটা জোর্সে করিয়ে।

ভোমা কাগজ খুলে দেখলো। দেখে একবার হাসলো আপন মনে। তারপর মাইকে বলতে লাগলো—হ্যাঁ—এই কীর্তনটা সবাই জপ করুন—বলে সুর ক'রে গাইতে আরম্ভ করলো—বারবার :

গাহো মন অবিরাম
হাক নাম
প্রভু নাম,
প্রভু নাম
অবিরাম।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ এইভাবে ভোমা বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগলো যতক্ষণ না পর্যন্ত উপস্থিত জনারণ্য করতালি দিতে দিতে—তার সাথে সুর মেলালো। আর সুরের সংক্রমণ ঘটিয়ে ভোমা আবার অন্য প্রসঙ্গে বক্তৃতা শুরু করলো—এই মহাপুণ্য তিথিতে, আপনারা মা শ্যামা পেসাদ না নিয়ে যাবেন না।

কেউ যাবেন না।

পাপ হবে।

অপরাধ হবে।

ঠাকুর ব্যথা পাবেন।

হুঁশিয়ার।

তখন সমিরুদ্দীকে দেখার জন্য মানুষের লাইন পড়ে যায়। পুলিস শৃঙ্খলা রক্ষা করে লাইনের। রাশি-রাশি-টাকা নোটে খুচরোয়, ফলে-ফুলে সমিরুদ্দী ভেসে যেতে থাকে। তার জল চৌকির নিচে নত হতে থাকে ভাবোন্মাদ নরনারীর মাথা। মেয়েরা সমিরুদ্দীর মুখে একটু সন্দেশ তুলে দিতে চায়। কেউ কেউ চোখ বোজা মুখটায় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে মুঠ ভরা সন্দেশ।

বাধা দেয় ভোমার গ্রুপ।

সমিরুদ্দীর বিষম লাগে।

সে কাশতে থাকে।

ভোমার গ্রুপ চিৎকার করে :

হুঁশিয়ার।

জোর ধাক্কাধাক্কি। ওরা সামলায়। ধমকায়। ঠেলে সরিয়ে দেয় পাবলিকদের।

সমিরুদ্দী-দর্শন শেষ ক'রে মানুষ ছোটে বড় ঠাকুর দর্শনে। বড় ঠাকুর অন্দরে। অন্দর মহলে। বড় ঠাকুরের শরীর খারাপ।

মানুষ—নর-নারী উন্মাদ হয়ে ওঠে।

ঠাকুরের আবার শরীর কি? শরীর খারাপ কি?

এ সব চালাকি।

চালাকি হতিছে আমাগরে সাথে। আমরা অবতারের দর্শন চাই। মেলা দূর থিকে আয়ছি আমরা।

আমরা খালি পেসাদ খাতি আসি নাই।

আমরা মাথা খোঁড়বো দর্শন না পালি।

মাঝে মাঝে এই হৈ হুল্লোড়ের তালে হারুনাম-কীর্তনে ভাটা পড়লে, ভোমার গ্রুপ সমস্বরে গেয়ে ওঠে—গাহো মন অবিরাম / হারুনাম / প্রভুনাম।

সাথে সাথে চারদিকে সেই সুর জেগে ওঠে নর-নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে।

দাগা সাহেব ভোমাকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জানিয়ে যায়—বলিয়ে, কাল ঠাকুরবাবা কো দর্শন মিলবে।

ভোমা সে কথা মাইকে প্রচার করা মাত্র আবার ক্ষোভে ফেটে পড়ে দর্শনার্থীরা। তারা চিৎকার করতে থাকে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা হত্তিছে।

ভোমা চেঁচায়—মা-গণ, বাবাগণ, ভাইগণ ও ভগ্নিগণ, আপনারা শান্ত হোন।

না। ওসব শান্তি ফান্তি শুনিনে। মানিনে।

ঠাকুরকে আনো।

আনো।

ভোমার স্বর ভ্রষ্ট হয়ে যায় চেঁচাতে চেঁচাতে—বাবাঠাকুরের শরীর ঠিক নেই। আপনারা কি চান যে, বাবার একটা কঠিন অসুখ হোক? দয়া ক'রে আপনারা সমীরুদ্দীবাবুকে দর্শন করুন। শ্যামা মা-র মূর্তি দর্শন করুন। মা তো মহাজাগ্রত বিপত্তারিণী।

ও মশাই, বক্তিমে থামান। এটা ময়দান না।

চালাকি-ফালাকি ছাড়ুন।

হুঁ হুঁ। মশকরা করা হত্তিছে আমাগরে সাথে।

সেই হট্টগোল, কলোরোলের ভেতরে সেরেস্তাদার মশাই ছুটে এসে দাগাকে জানায়—কৈলকাতা থিকে রিলিফ ডিভিশনের দুইজন বাবু আয়ছেন—।

: কা? দাগার চক্ষু চরকগাছ। রাগে তার সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপে। সে ছুটে যায় ভোমার কাছে। ভোমার কানে কানে কি সব বলে।

ভোমা একটা লাফ দেয়। রণমূর্তি তার। এক সাকরেদের হাতে মাইক দিয়ে সে তখুনি দাগাকে নিয়ে কাছারি ঘরে হাজির।

চারদিকে ভক্তকুলের খিচুড়ি খাওয়া—শালপাতা ছড়ানো। রোদ আর মেঘে, মানুষে আর শালপাতার এঁটো চাটা কুকুর বেড়ালে, তারপর মাইকে হঠাৎ তারস্বরে হিন্দি ফিল্মের গান,...

গাহো মন অবিরাম / হারুনাম / প্রভুনাম...কোরাশে, স্বেচ্ছাসেবকদের ছুটোছুটি, খিচুড়ির লাইনে হাতাহাতি, ঠেলা ধাক্কা—চিৎকার, পুলিসের অকারণ চিৎকার ক'রে শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলা, যুবতী মেয়েদের টিজিং আর গায়ে কনুই মারা, তার প্রতিবাদ, অযথা চেঁচানো, হুমকি, পাল্টা হুমকি...

মহাঠাকুর হারু মণ্ডলের মহাজাগরণ...

সেই সময় রিলিফ কমিটির লোক, খোদ রাইটার্স থেকে।

ক্ষমাহীন অপরাধ এ।

ভোমা ঘরে ঢুকেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। দু'জনই মধ্যবয়সী।

একজনের ধুতি-পাঞ্জাবি, অন্যজনের প্যান্ট-সার্ট। কাঁচা-পাকা চুল। চুপচাপ বসে বসে সিগারেট টানছিলো। তারা ভোমাকে দেখে-মুখ তোলে। ভোমা তাদের সরাসরি শাসানো গলায় প্রশ্ন করে—রিলিফ কমিটির লোক? কে পাঠিয়েছে? কেন পাঠিয়েছে? আমি তো মানুদাকে সবকিছু জানিয়ে এসেছি? তারপর আবার তদন্ত ফদন্ত কি? বলতে বলতে রিলিফ কমিটির ধুতি পাঞ্জাবির চেয়ারের হাতল চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ে সে—এই যে মশাই, সত্যিগিরি ফলাতে এয়েছেন? শুনুন, এয়েছেন—ভালকথা। দু'জন শালপাতায় শ্যামার ভোগ মেরে দিয়ে কেটে পড়ুন সড়ুৎ ক'রে। মানুদাকে তো কিছু বলার হিম্মৎ নেই, সে জানি। রিপোর্টটা লিখে দেবেন। সব ঠিক ঠিক মতো বণ্টন করা শেষ। বুঝেছেন তো কি বলছি? আর হ্যাঁ, আমার নাম ভোমা। ভোমা বাড়ুজ্যে। যুবনেতা। ছাত্র নেতা। শ্রমিক নেতা অল টুয়েন্টি ফোর পরগনাস। নামটা শুনেছেন তো? বলতে বলতে চেয়ারের হাতলে একটা ঠেলা মেরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দাগা সাহেবকে বলে—দু'খানা শালপাতায় ভোগ ধরিয়ে দিন। ও মশাইরা, চেটে পুটে মেরে দেবেন। শুনেছেন তো, শ্রী শ্রী হারু ঠাকুর কাল রাত্তিরে শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে মায়ের হাপুস-হুপুস চুমু খেয়েছে নিজের গালে। বলতে বলতে সে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানায়—পেসাদ মেরে দিয়ে, মায়ের দর্শনটা সেরে যাবেন। পুণ্যি হবে। ঘুষ টুষ খেয়ে মেরে তো কোলাব্যাঙ সেজেছেন। আর হঠ্যাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে—জয়শ্যামা।

এইভাবে এক নাগারে বক্তৃতা ঝেরে—ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যায় ভোমা।

রিলিফ ডিভিশনের আগন্তুকরা পরস্পরের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়। দাগা সাহেব তখন একটু নরম সুরে বলে—কুছু মাইণ্ড করবেন না। ভোমা দাদা—একটু উস্‌দা দিলের লোক। লেকিন খাটি বতোৎ। ঝটপট বাৎচিত চালায়। আপনারা বসুন, আমি ভোগ আনায়ে দিচ্ছি।

প্যান্ট সার্ট পরা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়—না। না। ভোগের যা ছিলো হয়ে গেছে। আমরা চলি।

ধুতি পাঞ্জাবিও তাকে অনুসরণ করে—দর্শনেই ভোগ সারা। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্।

দু'জনে প্রায় পড়ি-মরি ক'রে কাছারি থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় দ্রুত-পা

চালায়। পালিয়ে যায়। পেছনে দাঁড়িয়ে দাগা সাহেব অট্টহাসি হেসে ওঠে। কিন্তু তার সে অট্টহাসির ঝঙ্কার আলাদা কোনো ক্রিয়া সৃষ্টি করে না কানফাটা ধর্মোন্মাদদের তাণ্ডবে।

ভোর ভোর, বহুদিন পরে পাশাপাশি তিন পাড়ার রোদে পোড়া আকালে পোড়া মানুষের চোখে ক্লান্ত ঘুমের ছোঁয়া লেগেছিলো বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারায়।

. সেই সময় কাজীর ঘরের মেঝেতে আঁক কাটতে কাটতে গুমরে গুমরে কাঁদছিলো রাজিয়া। শুধু তার ফোঁপানো, তার বুক ভাঙা যন্ত্রণার সেতার—ছর্ ছর্ ক'রে ফুলে ফুলে উঠছিলো। অবিরল সুরে কে যেন পাঁজর ভেঙে—তাকে কাঁদিয়ে যাচ্ছিলো।

দেওয়ারে তুমি অঝোরে, অঝোরে নামো।

কত স্মৃতি। স্মৃতিরে। ভালবাসা। স্বপ্নের ভালবাসা। টুপ্ টুপ্ ক'রে শিশিরের মতো গলে গলে—ঝরে ঝরে পড়া—খসমের বুকের উষ্ণতায়।

দস্যি জয়নাল। ছটফটানি তার। কি গরম আবেগ। উদ্দামতা। ঘরে ঢুকে আড়াল পেলেই জড়িয়ে জাপটে চুমু খেতো। হাঁস-ফঁস ক'রে দম আটকে যেতো।

গালে দাগ। ঠোঁট কেটে রক্ত। কোনো রাখ-ঢাক নেই। মানামানি নেই। বেপরোয়া। ভয়ানক দস্যিপনা।

সেই দস্যিপনার মনটা, মানুষটা যে কি ধৈর্যশীল আর পরিশ্রমী ছিলো, মাঠের কাজে, চাষের কাজে, যোগালে ভেবে অবাক হতো রাজিয়া। কাজীর দুই বলদ, নিজেরও একটা নিজের গোয়াল ছিলো না বলে কাজীর গোয়ালেই রাখতো। দু'জন যোগালে নিয়ে ভোর ভোর বেরিয়ে যাওয়া—একপেট পান্তায় শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে, পেঁয়াজ লবণ দিয়ে—খেয়ে দেয়ে—মাঠে ছুট। ফিরতো বেলা শেষ ক'রে। নিজের তো দু' বিঘে জমি। কাজীর জমিগুলি ছিলো ভরসা।

আধাআধি হিস্যা। কাজী কোনোদিনও খোঁজ করেন নি। দেখতেও যাননি। হিসেবেরও প্রশ্ন তোলেননি। সবই জয়নাল করতো। রাতে শুয়ে শুয়ে ভিন গাঁয়ের নতুন বউকে কাজীর কিংবদন্তীর গল্পকথা শোনাতো। অবাক হতো রাজিয়া। নিজের কথা না। কাজীর কথা। কাজীর গল্প। আর ওই মানুষডুবির বিলের কথা। কাজী যাকে দক্ষিণের মাঠ বলেন। মানুষডুবির বিলে বোবা ঢেউ উঠতো বর্ষাকালে। উঁচু উঁচু—দু'তিন মানুষ সমান ঢেউ। দূরদুরান্ত থেকে সে সময় বড় বড় কিস্তি নৌকো নিয়ে আসতো নেয়েরা। মহাজনরা। নানান চালানি সামগ্রি নিয়ে। বাঁধাই মালপত্র নিয়ে। রবিশস্য। সুন্দরবনের কাঠ। কাজীপাড়ার ঘাটে তিন চার মাস সরগরম কারবার।

ছোট ছোট ছিপ নৌকো নিয়ে আসতো ফড়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে। তারাই বড় কেনাল। দরদাম ক'রে, মাল বোঝাই ছিপ্ নিয়ে, বিলের তাজা টাটকা মাছ ভাজা আর খিচুড়ি খেয়ে হুকোয় দম দিতে দিতে চলে যেতো।

জ্যৈষ্ঠের-আষাঢ়ের তুমুল ঝড়ে—মানুষডুবির বিলের উন্মাদ মূর্তি। ঢেউ হয়ে যায় ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া। বিশাল। তীক্ষ্ণ। তখন মাঝ বিলে নৌকো থাকলে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেতো মেয়েদের। কোনোদিকে এগুনোর কায়দা থাকবে না। বোবা ঢেউ যে। তার গতিবিধির ঠিক নেই। উত্তর থেকে একটা ঢেউ নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়তে না পড়তেই, দক্ষিণ থেকে, পুব থেকে, পশ্চিম থেকে ঢেউ ভেঙে পড়ে। সেই চাপে নৌকো ভেঙে যায়। তলিয়ে যায়। মানুষও। এমন কত বেদনার ইতিহাস মানুষডুবির বিলের চারদিকে।

জলদস্যুদের উৎপাত ছিলো খুব। তারাও লম্বা ছিপ্ নিয়ে—জানান দিয়ে, হাঁক-ডাক করতে করতে ডাকাতি করতে আসতো।

খুব উৎপাত সেসময়। পাড়ে চাষাদের ঘুম নেই তারা হাতে বর্শা-বল্লম নিয়ে ঝাঁক বেঁধে হাঁক-ডাক করতো রাতভর।

হেই জাগো জাগো—জাগো হে-এ-এ-এ-এ।

সারারাত এই হাঁক-ডাক। তখন আমোদও হতো। পালা ক'রে তিন পাড়ার মানুষ—কোনোদিন জারী, কোনোদিন ভাসান, কোনদিন কবি গানে মাতিয়ে রাখতো রাত্রিটাকে। দস্যুরা মাঝবিল থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ক'রে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে ডাঙার মানুষকে। ডাঙার মানুষ গেঁটে বাজি ফাটিয়ে ওদের দ্বিগুণ আওয়াজে প্রত্যুত্তর জানিয়েছে।

কাজী তখন জোয়ান। এই শরীর। তাগড়া। কিন্তু ছটফট করেন না।

একটা পাস দিয়ে কি নাম-ডাক চারদিকে। তামাম গের্দের কেউ কোনোদিন এত ভাল পাস দেয়নি। তখন থেকেই কাজী গম্ভীর। মানুষের বিপদে আপদে নিজের জানটারও পরোয়া নেই। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রাজিয়া শুনেছিলো স্বপ্নের মতো কাহিনী সব। পার্বতী ডাক্তারের মেয়ে কুয়োতে পড়ে গিয়েছিলো। সবাই কায়দা কানুন নিয়ে ব্যস্ত। ছোটাছুটি। কাজী চাচার ওসব ধার ধারা নেই। লাফিয়ে নেমে গেলেন অন্ধকার কুয়োতে। না হলে টিয়া ফুফু বাঁচে? কিছুতেই বাঁচে না।

একবার ডাকাতদের পেছনে ছিপ নৌকো নিয়ে ধাওয়া ক'রে, দুই আড়াই মাইল ছুটে, তিন মোহনায় গিয়ে পাকড়াও করেছিলেন দু'জনকে। সাত-আটজন জলে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। এই গাঁয়ে ওদের দু'জনকে ধরে এনে, ওই যে ছাতিম গাছটা? তার সাথে সারাদিন বেঁধে রেখেছিলেন। তারপর থানায় চালান।

. ভরু মণ্ডলকে রাজিয়া দেখেনি। সে নাকি বাঘ ছিলো। তো কাজী চাচা ছিলেন সিংহ গো। জমিন নিয়ে বিবাদ। জোর মোকদ্দমা। দখল নিতে এলো বেআইনিভাবে মণ্ডলরা তাদের ষণ্ডা-পাণ্ডা গুণ্ডাদের নিয়ে।

কাজী চাচার বাজান খুব ঠাণ্ডা মানুষ। তিনি কাজী চাচাকে বিবাদে যেতে দিতে নারাজ। তার এক কথা, আল্লার দুনিয়ায়, সব জমিন মানুষের ক্ষিদে মেটানোর জন্যে বরাদ্দ করা। তাতে যে অন্যায় ভাবে হাত দিবে, আখেরে তাদের পস্তাতে হবে। ওরাও একদিন কেঁদে কুল পাবে না। তিনি খুব আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। পীর-মুরিদী ছেড়ে দিয়েছিলেন। চাচাকেও বলতেন, এসব ভণ্ডামীরে। মানুষ কখনো মানুষের গুরু হতে পারে না। গুরুগিরি করে ভণ্ডেরা। যারা পরিশ্রম করে না। চাষাবাদ করে না। অন্যের শ্রমের, দুঃখের, ঘামের ফসল নিজেরা পায়ে পা তুলে ভোগ করে আর গুরুগিরি করে। ইসলাম ধর্মে পীরের কোনো বাখান নেই। এসব মানুষের তৈরি। নিজেদের সুবিধের জন্যে করেছে।

তিনি বলতেন, ধর্ম মানে নিজের মনের শুদ্ধাচার। আল্লার প্রতি ঈমান রাখো। তোমার কর্মে কাজে শুদ্ধাচার রাখো, তাহলেই হবে। আল্লাহ্ তো দুষ্ট আর অলস লোককে পছন্দ করেন না। সীমা লঙ্ঘনকারীকেও না।

পীর মুরিদী করা তো আলস্যের চূড়ান্ত।

কাজী চাচা তো তারই ছেলে। শৈশব থেকেই তার শুদ্ধাচার। বাড়িতে মসজিদ ছিলো প্রপিতামহদের আমল থেকে। কাজী চাচা শৈশবে আরবী

শিখেছেন মসজিদে। নমাজও পড়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত। বড় হলে, ম্যাট্রিক পাসের আগের বছর থেকেই শুধু দুই ঈদের জামাতে নমাজ পড়তেন। পেরাইভেট পরিক্ষে দিয়্যা আরও দুটো পাস দিছিলেন কাজী চাচা। বি. এ পাস। ভাবো ? তো তারপর এই নতুন ইমাম সাহেব একবার মসজিদে কাজী চাচাকে জামাতে দাঁড়াতে বাধা দিলে, চিরদিনের মতো তিনি নমাজ পড়াও ছেড়ে দিলেন।

তো ভরু মণ্ডলরা সেবার ষণ্ডা-গুণ্ডা নিয়ে কাজী চাচাদের জমিন দখল নিতে এলে, তার বাজানের মানা শুনলেন না কাজী চাচা। বাজানকে বলে দিলেন, তুমিই তো বলেছো, সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। তো আমি তার বান্দা হয়ে কেন পছন্দ করবো ! আর পছন্দই যদি না করি, তাহলে রুখে দাঁড়াতেই হয়। ফরজ এটা।

দাঁড়িয়ে গেলেন কাজী চাচা বন্দুকের সামনে খালি হাতে। ভরু মণ্ডলের মুখোমুখি। ষণ্ডারা ধান কেটে নিয়ে যাবে। তারা ভরু মণ্ডলের হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

কাজী চাচার মাথায় গামছা। কোমরে গামছা। মুঠ পাকানো। ভোরের আলো আঁধারিতে তার খোদাই করা বলিষ্ঠ শরীরের ধব্‌ধবে ফর্সা রং ঝিলিক্ দিচ্ছিলো পাকা ধানের মাঠে।

গুমোট গরমে মুখোমুখি দাঁড়ানো ভরু মণ্ডল। সামনে সিংহ কাজী চাচা। ভরু মণ্ডল ইয়ার্কি মেরে হাসছিলো। তার খানিক পরেই মণ্ডল চেঁচিয়ে হুকুম দিলো—কাট্ ধান। যে শালো ঠ্যাকাতি আস্‌পে, তার গলায় কাচির ফ্যাস্ মারবি।

ব্যস্।

ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্।

ধান কাটতে শুরু করলো মণ্ডলের লোকেরা।

চাচার সামনে মণ্ডল দাঁড়িয়ে।

চাচা একটা আওয়াজ দিলেন। শিস্ দেওয়ার মতো আওয়াজটা আলো-আঁধারির মাঠে একটা মাতাল শিহরণ বাজিয়ে দিলো।

প্রায় তিন চারশো মানুষ। হাতে লাঠি। তিন পাড়ার মানুষ। সকলের

নেতা কৃষ্ণ বাগ্‌দি। তো কৃষ্ণ বাগ্‌দীর সাথে আলী-আলী-আলী ক'রে চারদিকের ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে আগুনের গোল্লার মতো মার মার ক'রে ছুটে আসতে লাগলো।

: ই আল্লা গো···বলে ভয়ে রাজিয়া জয়নালকে জাপটে ধরেছিলো।

: আরে পাগ্‌লি। ইডা তো কিচ্ছা। কি যে ভয় তোর বউ।

রাজিয়া আদরে খাম্‌চে ধরেছে জয়নালের শরীর। কুঁই কুঁই করেছে বুকের গভীরে তরঙ্গ তুলে। আর ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলেছে—চাচার কিছু হয় নাই ?

খুব হেসেছে জয়নাল। বুকের গভীরে আত্মস্থ করেছে তার ভালবাসাকে—দূর পাগলি। আর থাকে সেই বন্দুকঅলারা ? তখন তো চারদিক ভাল কৈরে দিনই হয় নাই। আচম্‌কা হল্লা শুনতি পায়া হেগরে আত্মারাম খাঁচাছাড়া। পিট্টে দৌড়। দৌড়। দৌড়।

সেবার ধান কেটে এনেছিলেন চাচা। কিন্তু সেই শেষ। পরেরবার পুলিস এসেছিলো। তারা কোর্টের ছাপ মারা কাগজ দেখিয়ে বলেছিলো—সাত বিঘের এই দাগের সব জমি ভক্ত মণ্ডলের।

কাজী চাচা ছাড়বে না। কিন্তু চাচার মা তার ছেলের হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেটে কসম দিয়েছিলেন, তুই যদি বিবাদে যাইস, তালি আমার মাথা খাইস।

ব্যস তো ব্যস।

কাজী চাচা পালটে গেলেন।

আর ভক্ত মণ্ডলরা তার জন্ম জন্মান্তরের শত্রু হয়ে গেলো। সেই শত্রুতা আজ এই পর্যন্ত চলতে চলতে আসছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না।

জয়নাল বলতো—রাজিয়া, খুব অবাক কথারে। তামাম গের্দের ব্যবাক গরীব মানুষ, সে হিন্দু হৈক, আর মুসলমান হৈক, কাজী চাচা য্যানে—হেরা সেনেই থাকে। ন্যাংটো কাল থিকে এই দেকাতছি। মদনরেতো দেখছো। কী শরীরডা। গণ্ডারের মতো গোঁয়ার।

রাজিয়া প্রথম দিন জিজ্ঞেস করেছিলো—মদন নাম কি জন্যি গো ?

হেসেছে জয়নাল—কাজী চাচা, চাচিও এখন মদনই কয়। আসলে মহিউদ্দীন।

সেখেন থিকে মদান। মদীন থিকে মদন। আমরা মদন্া কই। বন্ধুরাও মদন্া কয়। ও:র একদিন গরু বাঁধার খুঁটা দিয়্যা চাচা মারিছিলো। তিন মাস বিছানায় পৈড়েছিলো মদন।

রাজিয়া আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে খসমের শরীরে : তুমি বুঝি ভাল ছিলে? দুষ্টামি করো নাই?

জয়নাল অমনি চিম্‌টি কেটেছে কুট্‌ ক'রে—ফাজিল কনেকার।

তো মানুষড্‌ুবির বিল।

ডাঙার মানুষের তার পরেও রাতের আঁধারে আঠারো দাঁড়ি বৈঠার টানে জল ভাঙার সঘন ছন্দও কানে বেজেছে।

অমনি ডাঙার জাগর মানুষের জিকির।

জাগো-জাগো-জাগো-জাগো-হেঁ-এ-এ-এ-এ-এ।

অথৈ জল। কেউ কখনো চরা দেখেনি। জাগলে তো দেখার কথা? বেশি খরায় কোমর পর্যন্ত নেমেছে। কোথাও কোথাও। মাঝে তো থৈ নেই।

আর মাছ। কত তার বাহার। চোখে যে দেখেনি, তার বিশ্বাসই করার কথা নয়। ঢাউস ঢাউস—মানুষ সমান বোয়াল। পুরনো দিনের মানুষ বলে—রাঘব বোয়াল। কেন, রাঘব বোয়াল কেন? কেউ তার মানেও জানে না। মাথা ব্যথাও নেই। নিজেরাই মানে ক'রে নিয়েছে, রামকে রাঘব বলে ডাকতো গুহক চণ্ডাল। তো রাম ছিলো বিশাল শক্তিশালী পুরুষ। সেইরকম রাঘব বোয়াল মানে মানুষের মাথা ছোঁয়া বোয়াল মাছ। আর ছিল মস্ত মস্ত শোল, গজাল, চেতল, কাৎলা আর রুই।

পনেরো দিন আগেও এসব পুনরাবৃত্তি করেছে জয়নাল। দুঃখে তার ছল ছল চোখ। আর দীর্ঘশ্বাস—বউরে। কি কবো! কনে যে গ্যালো সেই মাছেরা। পানি শুকায়া চরা পৈড়ে গ্যালো, তো মাছগুলান তো থাকপি—দেখলামও না। উধাও তারা দল ধৈরে। হাঁটু পানি খুঁইজে-পাইতে-দুই চারডে শৈল-গজাল, আর তিঁতো পুঁটি—। খা খা করে, ধু ধু করে সারা মুল্লুক। বাদল নাই, ম্যাঘ নাই—। মৈরে যাতি ইচ্ছে করে বউ—আর যে সৈহ্য হয় না। মানুষের জানে কত আর সৈহ্য হয়?

রাজিয়া তার শরীরের উত্তাপ দিয়ে ভুকা মানুষটাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছে। ওম দিতে চেয়েছে শিথিল পৌরুষকে। কিন্তু পুরুষত্ব তাতে জাগেনি। আশ্বস্ত হয়নি।

: মরবো রে বউ। মরবো।

: না। আল্লার কিডে। ও কথা কলি আমি যেদিক দুই চোক্ষু যায়—চৈলে যাবো।

মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে—লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো পায়চারি করেছে। আর হু হু ক'রে কেঁদে উঠেছে—কি কৈরলাম রে বউ। জেবনভর—যে মানুষটার চোক্ষুর দিক চোক্ষু মিলাই নাই। যে আমারে সর্বেস্ব ছাইড়ে দিয়্যা বাঁচায়া রাইখছে—তারে অপমান কৈরলাম প্যাটের জ্বালায়। কুত্তার মতোন লাইন দিয়্যা মণ্ডলের সাদা কাগজে সই দিল্যাম। ওহ্। আল্লার গজব নামবি, ধ্বংস হয় যাবো বউ।

পরশু রাতেও ঘরে ঢুকলে রাজিয়া শোয়া থেকে উঠে বসেছিলো। আঁধার ঘর। কিছুই বলেনি রাজিয়া। কোনো প্রত্যাশার কথাও না। সে জানতো, জয়নাল এখন মনে মনে খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে। যে কোনো সময়—মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে। কিন্তু পরশুদিন ও ঘরে ঢুকেই চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠলো—শুয়্যা আছিলি, শুয়্যা থাক। তোর জন্যি ছালা ভৈরে চাল-ডাইল আনি নাই যে গিল্‌বি। হারামখোরের দল। সব শালা বজ্জাৎ। খুন কৈরে ফ্যালাবো সব শালোরে খুন কৈরে ফ্যালাবো ইবার।

রাজিয়ার বুক ভরা ভয়। সে নিঃশব্দে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিলো। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটাও ক্ষিপ্ত উগ্রমূর্তি মানুষটার কানে না পৌছয়। অবিরাম, দু'তিন ঘণ্টা ওইভাবে যা-যখন মুখে আসে বকে বকে একসময় নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো জয়নাল।

তো ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যেই মানুষডুবির খালের সেই প্রকাণ্ড বটগাছের ডালে অবশেষে আবিষ্কৃত হলো ভারতের বৃহত্তর গণতন্ত্রের ঝুলন্ত ফলকনামা। নেহেরু-ওয়ালাদের মানুষ সেবার উৎকর্ষ প্রমাণ। কী ?

জয়নালের লাশ।

টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা-ডালমেয়া দের-তীর্থাশ্রমের পুণ্যপ্রতীক !

লাশ।

কার লাশ ?

কার লাশ ? কে চিৎকার করে ? কারা চিৎকার করে ? কারা তোমরা ? কার নাম বললে ?

জয়নাল।

জয়নালের লাশ।

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে চায় রাজিয়া। চৌকাঠে ডান পাটা প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খায়।

: ওই আল্লা। আল্লারে……

একটা ঘুরপাক খায় তার ছিলা ছেঁড়া ভুকা শীর্ণ দেহটা। হাই জাম্পের ভঙ্গিতে উলটে পড়ে বারান্দায়। বারান্দা থেকে উঠোনে নামার পৈঠায়। সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা যায় রাজিয়া।

তখন চিৎকার, চেঁচামেচি।

নসিরণের বুকফাটা আর্তনাদ। সেই সময় মত্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতিও।

ঝড় শুরু হয়ে যায়। সেই ঝড়ের হাওয়ায় খবর পৌঁছে যায় ভোর ভোর। —লাশ। লাশ। লাশ।

কার লাশ ? কার ? কেডা ?

জয়নাল হে। আমাগরে জয়নাল। সেই নিরীহ। শান্ত, খাটোয়া ছেলেডা। সে নাই।

খবর যে হুতাশন হয়। সব খবর তো হয় না। কিছু কিছু খবর হুতাশন ছড়িয়ে যায়। জয়নালের লাশের খবর হুতাশন হয়ে পৌঁছে যায় তিনপাড়ার মানুষের ঘরে ঘরে।

দেওয়ারে তুমি অঝোরে অঝোরে নামো…।

কি হবি-দেওয়ায় ? বাঁচে না মানুষ। মানুষ যদি না বাঁচে তো দেওয়ায় কি হবি কার ?

কণে ? লাশ কণে ?

ছাতিম গাছের তলায়। কাজী আছে, ঈশ্বর আছে। মজনুরা আছে। জয়দেব মিস্ত্রিরা আছে। চলো, চলো হে। বিষ্টি অ্যাখোন থামিছে। না থামুক। নামুক। কি হবি তাতে?

আমাগরে জয়নাল নাই। মোহরমের দিন সেই শান্ত ছেইলডা লাঠি হাতে আর ইয়া আলী আলী ডাক ছাডবিনে। আশমানতক লাফায়া উঠ্‌পিনে। হাঁ-রে রে রে রে ··· । আহারে. কী তার ডাকাবুকা রে। কেডা দাঁড়ায় তার লাফের স্যামনে। কেডা খাড়ায় তার লাঠির স্যামনে। য্যানি-ইয়াজিদের কালান্তক যম। ফোরাত নদীর পানি—ইয়াজিদের অবরোধমুক্ত কৈরবে। এ য্যানি সেই কারবালার জয়নাল। যে হাড়ে কাঁপানি তুলি ছিলো ইয়াজিদের সেনাগরে· , মোয়াবিয়ারে। হ্‌াঁ রে রে রে রে রে।

আলী···ই-ই···ই আলী ··ই···ই ই।

আশমান সমান লাফ।

বিদ্যুতের মতো লাঠির চমক্। চোখে পড়ে না। এমন তার গতি। তার শাঁই শাঁই আওয়াজ। সেই জাদু দেখতে দেখতে—নানা বাড়িতে বেড়াতে আসা কিশোরী রাজিয়ার চোখে বিস্ময়! অন্তরে গুনগুনানি। ঠোঁটে সলাজ হাসির নেকাব। তার মনে হয়েছিলো—সেই মরুভূমির দেশে, ফোরাত নদীর কূলে, কারবালায় সেদিন বুঝি ইমাম হোসেন এমনি ক'রেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো······

একটা ক'রে লাফ দেয় আলী আলী ডাক।

তিন-চার চক্কর লাঠির ঘুরপাক চলে—আর হোসেন হোসেন গর্জন— ।

সেই ডাক ছড়িয়ে যায়। সংক্রামিত হয়।

জিকির ওঠে দর্শকের কণ্ঠে। শিশুরাও তাতে শরিক।

ইয়া হোসেন। ইয়া হোসেন।

ইয়া হোসেন। ইয়া হোসেন।

কাজীর চোখ এখন মানুষড্‌বির বিলে। চারদিকে জনস্রোত ছুটে আসে। কান্না। আর অন্তহীন বেদনার কোরাশ। বুড়োরা গালে হাত দিয়ে ঠোঁটের

কাঁপনে অস্থির। রাজিয়াকে ঘিরে অন্তঃপুরে মর্মযাতনার মাতৃস্নেহ বহে যায়। যায়। কী এক পরিস্রুত শুদ্ধতায়।

কাজীর চোখে জল নেই। ঠোঁটে কাঁপন নেই। জবাফুলের মতো লাল তার চোখ। ডাঙা থেকে সে সময় কল্ কল্ শব্দে জনস্রোত নেমে যাচ্ছে মানুষডুবির মরুচরে। পাচ-ছয় ঘণ্টার অবিশ্রান্ত ধারায় বিলের বুক কানায় কানায় ভরা। থই থই জল। জলের বুকে ফুটন্ত ভাড়ের টগ্‌বগানি। ছট্‌-ফটানি।

একসময় যখন বৃষ্টিতে টান ধরে, বাতাসে শীতের কাঁপন খেলা করে, তখন ছাতিম তলায় নিয়ে আসা হয়েছিল জয়নালের লাশ। ছাতিমের ডাল বেয়ে, পাতা চুঁয়ে, ফোঁটা ফোঁটা জল-টুপ টুপ ক'রে খসে পড়তে থাকে—কাজীর মাথায়। বুকে-পিঠে। অথচ কাজীর ছু'চোখে উত্তপ্ত খরা। জলহীন মরুভূমি।

ঈশ্বর একসময় কাজীর কাঁধে হাত রেখে ডাকে—কাজীদা।

কাজী চোখ ফেরালেন। ভাবলেশহীন মুখ। কোনো বিকার নেই। যন্ত্রনা নেই। যে পারে, সে পারে তার হৃদয়ের ছবিকে-হৃদয়রুদ্ধ ক'রে রাখতে। বাইরে সেসব অপ্রকাশিত। তা কারো জানার বাইরে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তথাকথিত ট্যালিপ্যাথি বলো, আর কম্প্যুটারাইজেশনই বলো, হৃদয়বদ্ধ সেই ক্যানভাসে—কোন্ ছবি ফুটে আছে, তার খোঁজ কেউ-কোনোদিন জানবেও না। সম্ভবও না।

কাজী দেখলেন অবয়বের সমষ্টি। দেখতে দেখতে চোখ বুজে বোধহয় আত্মস্থ করলেন সমস্ত পার্শ্বপ্রক্রিয়া। তারপর সহজ, স্বাভাবিক, যেরকম অকম্প্র কণ্ঠে তিনি কথা বলেন, তেমনি ক'রে বললেন—ঠিক কথা। দুঃখ অনেক। মানুষ-ডুবির এই ভরা বুকটার মতো। অতল আর কঠিন। তা বইলে তো মুখ-বুইজে, চোক্ষু বন্ধ কৈরে বৈসে থাকলি চলে না। চলতিউ পারে না। জেবন হাতিছে গতিময়। গতি না থাকলি অচল। আইজ একদিক বর্ষণের গতি। সেইসময় জয়নালের গাত চিরদিনের মত অচল হয়া গ্যালো। ভুকা প্যাটে নতুন ফসলের স্বপ্ন তবু তো দেখতি পাতিছি আমরা। এ এক আশ্চর্য ঠেলা। মৃত্যুর দুয়্যারে দাঁড়ায়াও মানুষ তো এই স্বপ্ন নিয়্যাই বাঁচে। আমাগরেও বাঁচতি হবি।

কে যেন ভিড়ের মধ্যে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কাজী থম্‌কে যান কিছুক্ষণের

জন্তে। তারপর কান্নার গুম্‌রে ওঠা অন্তরঙ্গ রেশে তিনি তার কথায় ফিরে আসেন—ঠিক, যে আত্মজন হারায়া কাঁদে না, সে বড পাষাণ। য্যামন আমি। কই, কাঁদি নাই তো ? সেই ন্যাংটো কাল থিকে জয়নাল আমার কাছে। ঘুরায়ে-পিরায়ে, ভাঙচুর কৈরে জয়নালরে দেখিছি। কুনোখানে তার থাঁইদ নাই। খাঁটি জিনিস। তো কি জন্যি তার এইরম মৃত্যু হৈলো, জানিনে। সে নিজি গলায় দড়ি দিছে, নাকি অতিবড় নিষ্ঠুর খুনী তারে খুন কৈরে ফাঁসে ঝুলায়ে দিছে। তাও আজানা। তবু আমার কথা, জয়নাল খুনই হয়ছে। সেই খুনীর বিরুদ্ধে চিরকাল লড়াই কৈরে আমাগরে বাঁচতি হবি। ঈশ্বরদা কয়, শোককে শক্তিতে পরিণত করতি হবি। ক্যামন কৈরে ? জয়নালের লাশ দাফন-কাফনের পরে আমাগরে নামি যাতি হবি বিষ্টি ভেজা মাঠে। হাতে লাঙল, জোয়াল বাঁধা বলদ। ভেজা মাটিকে ফালাফালা করি ছিঁড়ি ফেলতি হবি সবাই মিলে। কান্না হতিছে শোক। সবাই একজোট হয়া নতুন ধানের, ফসলের স্বত্ব নিয্যা মাঠে নামা হতিছে—শক্তির প্রকাশ।

এই সময় পাগলিনীর মতো বুক ফাটা আর্তনাদে অন্দর থেকে বেরিযে আসে রাজিয়া। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে তাব বিদ্যুৎময়তা। রুপ-অরুপের বেসাতি তো না। এতো বাবুদের বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুরের সর্বাধুনিকাদের স্বামী হারা শোকের সেণ্টেড রুমালে লোক দেখানো ফোঁস ফোঁস শব্দে নাক মোছা না। লিপিষ্টিক মুছে যাবার ভয়ে, মেপে মেপে ঠোঁট বাঁচিয়ে রুমালের খেলা প্রদর্শণ না। হাওয়া গাড়ি চেপে সাজ-গোজ ক'রে স্বামীর শবানুগমন না। কিংবা ক্যাটারার দিয়ে স্বামীর মৃত্যু আপ্যায়ণ করা না।

এ কান্নার উৎস ধান-মাটির কাব্য থেকে। অন্তর উজাড করা উৎসমূল থেকে প্রক্ষেপিত। তাই এই শোক এক নিস্পাপতার অনাবিল আকর। ধুলো-মাটি-জলকাদায় নরম-কোমল-বৃষ্টি ধোয়া পবিত্র করোতোয়ার ফল্‌গুধারা।

রাজিয়াকে সামলানো কঠিন হয়ে পডে। শোক বিহ্বলা নসিরণ তাকে কিছুতেই আটকাতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত শোকাতুরা রাজিয়া ক্রোধোন্মাদিনী হয়ে ফালা-ফালা ক'রে-দাঁত দিয়ে আঁচল ছেঁড়ে। চিৎকার করে

—আল্লারে আল্লাহ। কেডা খুন কৈরছে, কেডা খুন কৈরছে, আমার নসিব আমার সোহাগরে—আল্লাহ···! বলে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জয়নালের বুকের ওপর।

তাকে সামাল দিতে হিমশিম খান নসিরণ। শেষে মজনু এগিয়ে আসে। রাজিয়াকে ধরতে বলেন তিনি—জাপটে ধেরে নিয়্যা যা ঘরে। পাগল হয়া গিছে ও।

প্রায় বেআব্রু রাজিয়াকে কোল পাঁজা ক'রে তুলে নেয় মজনু—ও ভাবী, ভাবী গো, তুমার পায় ধরিগো এরম কৈরো না।

: ছাড়। ছাড় তুই আমারে। মরিয়া হয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে রাজিয়া।

মজনু তাকে জাপটে ধরে অন্দরে ছুটে চলে যায়।

ছাতিম গাছে ঠেস্ দিয়ে দ'াড়িয়ে ছি'লন কাজী। নিশ্চুপ। পাথর।

আর তখুনি সেই চমৎকার গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ন্যায়দণ্ড হাতে, দিল্লীশ্বরীর মহিমায়-মহিমান্বিত মেজো দারোগা, জনা কুপি সশস্ত্র সি, আর, পি নিয়ে সোজা এসে থম্‌কে দ'াড়ায় ছাতিম গাছের অদূরে। সঙ্গে ইমাম সাহেব।

কাজী যেন জানতেন। এই ভবিতব্যের কথা।

তিনি একটুও অবাক হলেন না শুধু দু'চোখ থেকে এক ঝলোক ঘৃণা নিক্ষেপ ক'রে চুপ ক'রে দ'াড়িয়ে রইলেন যেমন ছিলেন।

ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য। সেই চাঞ্চল্য হটিয়ে পথ ক'রে—চার-পাঁচ জন সি. আর, পি নিয়ে ঢুকে পড়েন মেজো দারোগা।

ঈশ্বর বাউল সামনে। মুখোমুখি। সেই প্রথম কথা বলে কি মেজোবাবু ইমাম সাহেবের সাথে সাথেই ছুটে আয়ছেন দেখি। যাইক, খবর দেওয়ার মানুষ তালি আছে একজন।

মেজো দারোগাই একটা অঘটনের সূত্রপাত ঘটায়। তার দুই পাশে সশস্ত্র সি, আর, পি। ভিড়ের পেছনে সি, আর, পি। তাদের চোখে মুখে শিকার সন্ধানী ক্রুরতা।

ঠাস ঠাস ক'রে মেজো দারোগা ঈশ্বর বাউলের ডান কাঁধের ওপর তার চামরা

বাঁধানো রুল দিয়ে আঘাত করে—শালা ভিখিরির বাচ্চা ভিখিরি। উগ্রপন্থীদের স্পাই। সব সময় আগে আগে · ।

আচম্‌কা এই ঘটনায় চম্‌কে ওঠে শোকাহত জনতা।

চম্‌কে ওঠে এই অভাবিত ঘটনায়। তারপর তারা দেখে, মোহররমের দিন লাঠি হাতে জয়নাল যেমন ক'রে লাফ দিয়ে হাঁক দিয়ে উঠতো, কাজী আচম্‌কা যেন জয়নাল হয়ে গেলেন। প্রথমে হুঙ্কার। তারপরেই লাফ দিয়ে জয়নালের লাশের ওপর দিয়ে মেজো দারোগার সামনে।

দুম্ দুম্। কাজী সোজা ঘুষি চালালেন মেজো দারোগার মুখে।

ছিটকে, টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হ'য়ে পড়ে যায় মেজো দারোগা।

সি. আর. পি-দের মধ্যে চাঞ্চল্য। উত্তেজনা।

একজন ছুটে এসে মেজো দারোগাকে টেনে তোলে। তার নাক দিয়ে রক্ত। সামনে ও পরের পাটির দু'টি দাঁত নড়ে গেছে। গল্ গল্ ক'রে রক্ত ছুটছে।

রক্ত কাজীর ডান হাতের মুঠোয়। তাকে ঘিরে ফেলেছে সি. আর. পি. বাহিনী। মেজো দারোগা থু থু করে রক্ত ফেলতে ফেলতে—রুমাল চেপে ধরেন।

কাজী চিৎকার করতে থাকেন—ঈশ্বরদারে মারলি ক্যান্? সে চোর—না বাটপার তুমাগরে মতো? কথা নাই, বার্তা নাই, মামুদার হুকুম পায়া সারা দ্যাশে রক্তের হোলি খেলাতিছো?

মেজো দারোগাও চিৎকার ক'রে হুকুম দেয় —শুয়ার কি বাচ্চাকো পাকাড়ো। হ্যাণ্ডক্যাপ লাগাও। আউর ইসকো ঘর-দোর সব ভাঙ দো। মিট্টিকা সাথ লাগাদো। ইন্ লোগ নকশাল হ্যায়।

এক ঝাঁক সি. আর. পি মেজো দারোগার অঙ্গুলি নির্দেশে ছুটে চলে যায় কাজীর অন্দরের দিকে। আর ভিড় হটাতে ফাঁকা আওয়াজ করে বন্দুকের। ঈশ্বরের মাথায় লাঠির ঘা পড়ে।

ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় শোক-বিহ্বল জনতা। দূরে, বহুদূরে সরে যায় তারা। ছাতিম তলায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে ঈশ্বর বাউল। তার মাথা চুঁয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। ঠিক জয়নালের পাশেই।

অন্তঃপুরে ততক্ষণে দক্ষযজ্ঞ।

ভয়ার্ত নসিরণ ও রাজিয়া সহ, যারা এসেছিলো, তারা চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো।

কাজীর হাতে হ্যাণ্ডক্যাপ। কোমরে মোটা দড়ি। দুইপাশে দানবের মতো দুই সি. আর. পি. তাকে শক্ত ক'রে ধরে আছে। তবু তিনি গর্জন করছিলেন—ইয়ের ফল খুব ভয়ানক হবি। ইতিহাসের পাতায় ইয়ের জবাব ল্যাখা আছে। খবরদার। ঘরে হাত দিও না। জেনানাগরে সম্ভ্রম নষ্ট কৈরবে না। তালি কারবালা হয়া যাবে। কারবালা হয়া যাবে।

মেজো দারোগা সেই মুহূর্তে কাজীর পেটে বাঁ হাতে ঘুষি চালায়—শালা নেড়ের বাচ্চা। এটা তোর বাপের তালুক পাকিস্তান? কারবালা কে বানায় ছাখ্ এবার। এইখানে তোর ভিটেয় মদের ফ্যাক্টরি হবে। জেলে বসে সেই মদ খাবি তুই। হারামির বাচ্চা! শালা পাকিস্তানের এজেণ্ট!

খুব জোর ঘুঁষি খেয়ে কাজী থম্‌কে গেলেন। কিন্তু নিজের পেটে হাত ছোঁয়াবারও কোনো অবকাশ তিনি পেলেন না। অনেকক্ষণ তিনি মাটির দিকে ঝুঁকে থাকলেন। সি. আর পি-দের হাতে শেকল পরা হাত ঝুলিয়ে রেখে। তার মনে হলো, তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন। মূর্ছা যাবেন। অথবা রক্তবমি করবেন।

দেখতেও পেলেন না কোথায় ছিট্‌কে চলে গেলো নসিরণ। রাজিয়া, বা আর যারা এসেছিলো। শুধু অন্তঃপুর থেকে ভেসে আসতে লাগলো বাড়ি-ঘর-ভেঙে-চুরে ধসিয়ে দেবার ভয়ানক তাণ্ডবলীলার শব্দ।

ভেঙে যাচ্ছে বাপ-দাদার স্মৃতিধন্য বসতবাড়ি।

তছনছ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি ভালবাসার টুকরো টুকরো জিনিষপত্র। মানুষের ছদ্মবেশে অহিংসার পুরোহিত দানবদের হাতে গৃহহারা হচ্ছে রসধারা। হাতে এদের 'মহাত্মা গান্ধীর' মহান বন্দুক। সেই সময় আরও একটা ঘুষি এসে লাগে তার পেটে।

ওহ্!

কাজী শেষবারের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন—খালি একবার, খালি একবার আমার হাত থিকে শেকলডা খুইলে গ্যাও। আমি শ্যাষবারের মতো—

কাজী মূর্ছা গেলেন সি. আর. পি-দের শেকলে ঝুলন্ত অবস্থায়।

পিঙ্গল আকাশের নিচে সোনালী রোদ্দুর ভরা বিকেল।

নব অবতার হারু মণ্ডলের গৃহে—মন্দিরে, প্রাঙ্গণে, রাস্তায় উন্মাদ ভক্তকুলের তাণ্ডব আর খিচুরি ভক্ষণে, হিন্দি গানে, চিৎকার-চেঁচামেচিতে লঙ্কাকাণ্ড।

অবশেষে ভক্তদের তাণ্ডব দাবির কাছে নতি স্বীকার ক'রে বড় ঠাকুরকে অন্তঃপুর থেকে এনে মন্দিরের ভেলভেট মোড়া আসনে বসাতে বাধ্য হয়েছে রঙ্গলাল দাগারা। দুপুরের পর থেকেই তাই দীর্ঘ লাইন পড়ে গেছে। সে লাইন ক্রমেই বাড়ছে। সোজা যেতে যেতে বেঁকেছে ডানদিকে, বাঁদিকে, তারপর দু'বার ডানে, আবার দু'বার বাঁয়ে···তারপর সোজা। প্রায় সাপের লেজের আকৃতি। পুলিস আর ভোমার বাহিনী সেই লাইন সামলাচ্ছে।

টাকা আর খুচরোর ঝন্ ঝন্ ঝনাৎকার।

এই আকালের দেশে কোথায় ছিলো এত টাকা ! এত খুচরো ?

স্বয়ং অবতার-মাঝে মাঝে ঘাড নাড়তে নাডতে-জয়শ্যামা, জয়শ্যামা বলতে বলতে, বাঁ চোখ সামান্য ফাঁক ক'রে বাইরের দৃশ্য দেখে নিচ্ছিলো। এই-ভাবে দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ধাক্কা খায় সে। তার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে সে। তাই আবারও সে তার বাঁ চোখ ফাঁক ক'রে দেখালো। আবারও শিহরণ। দশ-বারোজন দর্শনার্থীর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে টিয়া। হাতে বিশাল এক জবাফুলের মালা। না। স্বপ্ন না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টিয়াকে। মুখটা বড় দুখি। বিষণ্ণ

কোনো চাঞ্চল্য নেই। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করলো সে। না। না। এভাবে চুরি ক'রে দেখা ঠিক না। ধরা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। একবার জানাজানি হয়ে গেলে, বা কেউ টের পেলে, সব আয়োজন, অভিনয় ভেস্তে যাবে। তখন তার চরণে মাথা না ঠুকে, বিপুল দর্শনার্থীর চরণ এসে পড়বে তারই মাথায়।

আর একবারও সে ওইভাবে তাকাবে না। কে জানে পার্বতী ডাক্তারের ওই মেয়ে কোন্ দুষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে ওইভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্জনের তো ছলের অভাব নেই। তা ছাড়া তার আজন্ম শত্রু, নাস্তিক জাফর কাজীর ও ভালবাসার মানুষ।

হারুমণ্ডল হঠাৎ দুলতে দুলতে 'জয়শ্যামা' জয়শ্যামা' বলে ফের আবৃত্তি করতে থাকে উচ্চস্বরে। সমস্ত পার্থিবতার উর্ধ্বে চলে যায় তার অপ্রকৃতিস্থ স্বরক্ষেপণ। সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থিনী নারীকুলের সমবেত শিহরণ জাগানো উলুধ্বনিতে মুখর হতে থাকে মন্দির প্রাঙ্গণ।

একবার, দু'বার, তিনবার। বারবার উলুজোকার উত্থিত হতে থাকে।

পুরুষকণ্ঠে উচ্চারিত হয় হ...নাম, প্রভুনাম সঙ্গীত।

মাইকে মণ্ডাপ ভোমার ঘোষণা শোনা যায় অনুগ্রহ ক'রে শুনুন, আজ রাত আটটা পর্যন্ত মন্দিরে বাবা-ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যাবে। আমরা দুঃখিত যে, অগনিত ভক্ত মা-বোন-ও ভাইদের আজ ঠাকুর দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আমাদের কিছু করার নেই। কাল আবার সকাল ন'টা থেকে মন্দির খুলে দেওয়া হবে। দুপুরে একটা থেকে চারটে পর্যন্ত বিরতি। তারপর আবার খুলে দেওয়া হবে। আপাতত আমরা সাতদিন এইভাবে দর্শনের ব্যবস্থা রাখছি। রোজই আপনাদের জন্যে প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে।

সেই সময় হঠাৎ চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জন জেগে ওঠে।

কি ? কি হয়েছে ?

কি ?

কেডা ?

একজন পুলিশ লাইনের ধার থেকে রাস্তার দিকে ছুটে যেতে যেতে বলে শুয়ারের বাচ্চা কাজীকে অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে সি আর. পি।

টিয়া শুনতে পায় সে কথা। কিন্তু লাইনের কাউকে টের পেতে দেয় না টিয়া নামের এক অগ্নিহোত্রি। সে তখন সাতজনের পেছনে। পাশেই পুরুষের লাইন। দু'জন পুরুষ দর্শন ক'রে চলে গেলে, 'একজন মহিলাকে ছাড়া হচ্ছে। অর্থাৎ এখনো খানিকটা সময় হাতে আছে তার। সে খুব সন্তর্পণে, মনের ভেতরের অসম্ভব চাঞ্চল্যকে বাইরে প্রকাশ না ক'রে, সে পেছনের অপরিচিতা মাঝবয়েসি সধবা মহিলাটির কাছে বিনম্র অনুরোধ করে—দিদি গো, আমার পয়সা আনতি মনে নাই বোইরে আমার ভাই আছে। গিয়া চট্ কৈরে পয়সাডা নিয়্যা আসতিছি। জাগাটা রইলো।

মহিলাটি রাজি—আচ্ছা আচ্ছা। আপনের জাগা আপনেরই থাকপেনে।

টিয়া দ্রুত বেরিয়ে যায় লাইন থেকে। বেরুতে বেরুতে আঁচলটা টেনে কোমরটাকে ভাল ক'রে ঢেকে দেয়। যেন কোমরের বেঢপ উঁচু জায়গাটা কারো নজরে না আসে।

হন্ হন্ ক'রে এগুতে এগুতে একবার পেছনে ফিরে দেখে। না। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। কাজী পাড়ার দিক থেকে বিশাল সি. আর. পি বাহিনীর একেবারে সামনে—হ্যাণ্ডকাপ পরা কাজীদার কোমরে দড়ি, সেই দড়ি ধরে আছে একজন সি. আর. পি। তার বেশ খানিকটা দূরত্বে হাজার খানেকেরও বেশি মানুষ···হেঁটে আসছে। হেঁটে আসে। নিথর নিস্তব্ধতায়।

মেজো দারোগার খাকি জামায় রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। কাজী দা হাঁটছেন মাথা উঁচু ক'রে তার সারাটা মুখ তামাটে। একটু যেন ক্লান্ত। হাওয়ায় উড়ছে তার কাশফুলের যৌবন রঞ্জিত চুল।

খুব কাছে।

যে আছে প্রাণের কাছাকাছি। এখন সামনা সামনি। টিয়ার হাতে তখনো বিশাল সেই জবাফুলের মালা। তার বুক ঠেলে, হৃদয় মথিত হয়ে হু হু ক'রে কান্না আসে। কে যায়। কে যায় ধীর? মাথাটা আকাশের মতো উঁচু ক'রে?

কাজী দাঁড়িয়ে পড়েন। তার ঠোঁটে অবিশ্রান্ত কাঁপন।

টিয়া ছুটে যায়। ছুটতে ছুটতে সেই জবাফুলের মালাটা দুই হাতে পরিয়ে দেয় কাজীর গলায়। পরিয়েই পা ছোঁয়। প্রণাম করে। ফিসফিসিয়ে বলে তুমি যাও। আমরা রইলেম।

তারপর হু হু ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে পিছিয়ে আসে। পিছিয়ে আসে। কোমরে তার হাত আঁচল দিয়ে ঢাকা বিশেষ উঁচু জায়গাটা আকড়ে ধরতে ধরতে পিছিরে আসে।

কাজী হাসলেন।

শেকলে টান পড়ে তখন।

টিয়া ছুটতে ছুটতে চলে যায় লাইনের নির্দিষ্ট জায়গাটা ধরতে। আজই পঞ্চম দিন। ঈশ্বরদাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার বিশ্বকর্মার নির্মাণ যন্ত্রটা।

আর নদীর ঘাটে, নৌকায় পা রেখে সহস্র ভালবাসার মুখের দিকে তাকিয়ে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ উচ্চারণ করেন কাজী—মনে রাইখো, জমিন উর্বর না হলি ফসল ফলে না।

আর প্রতিহিংসায়, বিশ্বের জমাট ক্রোধ নিয়ে টিয়া তখন একা হারু মণ্ডলের সামনে। ডান পা-টান করে, বাঁ পা ভাঁজ ক'রে, কোমরে হাত দিয়ে টেনে বের ক'রে নিয়ে আসে বিসুবিয়াসের অগ্নুৎপাত।

— :: —